অচ্ছুৎ

মুল্‌ক্‌ রাজ্‌ আনন্দ-এর অন্যান্য উপন্যাস
বাংলা ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে
অনুবাদক : নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

কুলি
দুটী পাতা একটি কুঁড়ি

প্রথম ইংরাজী সংস্করণ ১৯৩৩
প্রথম বাংলা সংস্করণ ১৯৪৯

দাম: তিন টাকা

প্রকাশক: বিমল মিত্র, ৬ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।
মুদ্রাকর: নিখিল পোদ্দার, ওরিয়েণ্ট্যাল আর্ট প্রেস, কলিকাতা।

অচ্ছুত পল্লী!...

শহর আর ক্যান্টনমেণ্টের ছায়ায় অথচ তাদের ধরা ছোঁয়ার বাইরে দু'সার মাটীর কোঠা-ঘর—একে অপরের গায়ে হুমড়ি খেয়ে দাঁড়িয়ে আছে গাদাগাদি ভাবে। পৃথক হয়েই এখানে গড়ে উঠেছে পল্লীটি। বাসিন্দারা কেউ ধাঙড়, কেউ মুচি, কেউ নাপিত, ধোপা, ভিস্তিওয়ালা, কেউ বা ঘেস্বড়ে...নীচের তলার সব লোক—হিন্দুসমাজ যাদের ঠেলে দিয়েছে দূরে...ক'রে রেখেছে যাদের অস্পৃশ্য অশুচি অপাংক্তেয়...সেই সব অচ্ছুতরা!...

পল্লীটির পাশ ঘেঁষে বয়ে গেছে ছোট একটি নদী। স্বচ্ছ পরিষ্কার জল ছিল বুঝি তার এক কালে। এখন কিন্তু অনেকটা মজে গেছে আশ-পাশের সরকারী টাট্টিখানার নোংরাতে। প্যাচ প্যাচ করছে পাঁকে। নদীটার দুই পাড়ে রোদে শুকোতে দেওয়া হয়েছে এক গাদা কাঁচা চামড়া...এখানে ওখানে পড়ে আছে মড়া কুকুর-বেড়াল...রাজ্যের যত গোবর—গরু, ঘোড়া, মোষ, ভেড়া, গাধার নাদি...গাদা ক'রে কুড়িয়ে রাখা হয়েছে ঘুঁটের জন্য। সব কিছু মিলে একটা পচা, ভ্যাপসা তীব্র গন্ধে ভারী হয়ে উঠেছে বাতাস। দম আসে আটকে...নর্দমার কোন বালাই নেই। বর্ষার জল এক জায়গায় জমা হয়ে সৃষ্টি করেছে এঁদো এক ডোবার। সেখান থেকেও ভেসে আসছে একটা বিশ্রী পচা দুর্গন্ধ।...এখানে-ওখানে ছড়ান বিষ্ঠা আর গরু-ছাগলের নাদ...সর্বত্র নোংরামি আর কদর্যতার ছাপ...অপরিষ্কার আর অপরিচ্ছন্ন

…দুঃখ আর দারিদ্রের চিহ্ন।…সব কিছু নিয়েই গড়ে উঠেছে অচ্ছুতদের ঘিঞ্জি ছোট্ট পল্লীটা। বাসের পক্ষে অনুপযোগী আর অস্বাস্থ্যকর।…

বখাও তাই ভাবে।

শহর আর ক্যান্টনমেন্টের সব ধাঙড়দের সর্দার জমাদারের বেটা বখা। আঠারো বছরের সমর্থ মরদ—শক্ত, গাঁট্টা গোট্টা শরীর। নদীর পাড়ে একেবারে শেষ মাথার তিন সার সরকারী টাট্টিখানা সাফ-সুফ তদারকের ভার ওদের। বছর কয়েক থেকে বখা কিন্তু কাজ করছে বৃটিশ ফৌজদের ব্যারাকে দূর সম্পর্কের ওর এক খুড়োর সঙ্গে। গোরা আদ্‌মিদের জীবন ধারার জৌলুষ আর চাকচিক্য ওকে কিন্তু আচ্ছন্ন ক'রে ফেললে। চোখ দুটো দিলে ধাঁধিয়ে। বখার আর পাঁচ জন অচ্ছুত সঙ্গী কিন্তু নিজেদের বরাত নিয়েই রয়ে গেল সন্তুষ্ট। বখা কিন্তু থাকতে পারলে না। সে নিজেকে ওদের চাইতে শ্রেষ্ঠ, বলিষ্ঠ, আলাদা বলে ভাবতে শিখলে। কেবল মুচীদের বাড়িব ছেলে ছোটা আর ধুপীদেব রামচরণ একটু যা দেখা গেল ব্যতিক্রম। ছোটা তো মাথায় চুকচুকে তেল মেখে সাহেবদের মত একধারে লম্বা টেরী কেটে ঘুরে বেড়ায় টো টো ক'রে। হকি খেলবার সময় পরে সে হাফ্‌প্যান্ট। দিব্যি সিগারেট ফোঁকে গোরা আদমীদের মতই। আব রামচরণ করে বখা আর ছোটাবই হুবহু নকল।

শরতের ভোরবেলা। ভিজে স্যাঁৎস্যাঁতে মেজেব উপর রঙচটা নীল গালিচার উপর একখানা তেল চটচটে পুরোন কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়েছিল বখা আর তন্দ্রার ঘোরে ভাবছিল তাদের ঘরের অস্বাস্থ্যকর আবহাওয়ার কথা। পাশেব এক চারপায়ায় ঘুমিয়ে ওর ছোট বোনটি…কিছু তফাতে ঘুড়ির এক ভাঙ্গা খাটিয়াতে ওর বাপ আর ছোট ভাইটা ছেঁড়া, তালিলাগানো খয়েরী রঙের লেপের নীচে নাক ডাকাচ্ছে।

ঠাণ্ডা রাত। দিনে প্রচণ্ড গরম আর রাত্রে বেজায় ঠাণ্ডা। বুলাশা শহরে চিরকালই এমনটা। কি শীত কি গ্রীষ্ম—বখা সব সময় মিলিটারী

পোষাক পরেই থাকত। ওভারকোট, ব্রীচেজ, পট্টি, বুট কোনটাই ধার দিত না। রাত্রেও ঘুমোত তাই পরে। কিন্তু শেষ রাত্রের দিকে নদীটার ওপার থেকে যখন ঠাণ্ডা কন্‌কনে হাওয়া দিতে শুরু করত, বখার পাতলা কম্বল আর জামা-কাপড়ে আর শীত মানত না। কনকনে হাওয়াটা ওর গায়ে এসে লাগত তীক্ষ্ণ ধারাল চাবুকের মত।

হি হি ক'রে কাঁপতে কাঁপতে বখা শুলে পাশ ফিরে। কাঁপুক; দাঁতে দাঁতকপাটী লেগে যাক। সে কিন্তু তার 'ফ্যাসন' ছাড়ছে না। বৃটিশ বা ভারতীয় সৈন্যদের মত পান্টলুন, ব্রীচেজ, কোট, পট্টি আর বুট পরে বাহার ক'রে ঘুরে বেড়ানটাই তো 'ফ্যাসন'। এর জন্যে অনেক কিছু সে ছাড়তে রাজী।

শ'কার ব'কার ক'রে ওর বাপ একবার মুখ ঝামটা দিয়ে উঠেছিল: 'ভালো চাস্‌ তো গোরাদের ঐ পাতলা ফুরফুরে কম্বলটা দূরে ছুঁড়ে ফেলে দে। একখানা লেপ নিয়ে খাটিয়াটার উপর শো বিছানা ক'রে, নইলে ঠাণ্ডায় মরবি নাকি জমে?'

বাপের কথা বখা কিন্তু তখন কানে তোলেনি। নয়া ভারতের সে নওযোয়ান। বিলেতী পোষাকের চটকদার বাহার ওর মনে এমন ভাবে গেঁথে বসেছিল, ভারতীয় বেশ-ভূষার সাদাসিদে ধরন সে আর বরদাস্ত করতেই পারলে না।...

খুড়োর সঙ্গে বৃটিশ ফৌজদের ব্যারাকে নক্‌রি করতে এসে প্রথম প্রথম সে টমিগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকত হাঁ করে। অবাক বিস্ময় ছাপিয়ে উঠত তার চোখদুটিতে। ওদের দৈনন্দিন জীবন ধারার খুঁটিনাটি সব কিছুই লক্ষ্য করত সে। দেখত: কেমন যেন অদ্ভূত ক্যান্‌ভাসের নীচু নীচু খাটে ওরা সব ঘুমোয় কম্বল মুড়ি দিয়ে...ডিম খায়...টিনের মগে ক'রে চা আর মদ গেলে ঢক্‌ঢক ক'রে...করে কুচকাওয়াজ...রূপালী ডাটওয়ালা ছড়ি ঘোরাতে ঘোরাতে বাজারে যায় সিগারেট টানতে টানতে। বখা সবই দেখত;

ওদের মত ক'রে চলা-ফেরা করতে ওর ভয়ানক ইচ্ছে হোত। সে শুনেছিল, সাহেব-সুবোরা সব সেরা আদমী—উপর তলার লোক। সাহেবদের মত জামা কাপড় না পরলে চলে নাকি? তাই সে ওদের সব কিছুই অনুকরণ করতে চেষ্টা করতো। চেষ্টা করতো হিন্দুস্থানের বেঢক্ সৃষ্টিছাড়া পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে যতখানি পারা যায় ওদের অনুকরণ করতে। এক জোড়া পেণ্টলুন সে একদিন চেয়ে নিলে এক টমির কাছ থেকে। একজন হিন্দু সেপাইও—বুঝি আত্মার নেহাৎ সৎগতির জন্য—পুরোন একজোড়া বুট ও পট্টি দান করেছিল ওকে। বাদ বাকি জিনিষ কটা সংগ্রহ করতে বখাকে অবশ্য ছুটতে হয়েছিল শহরের পুরানো টুটা-ফুটা কাপড়-চোপড বিক্রির দোকানে: কাঠের তাকের উপর যেখানে সাজিয়ে রাখা হয় টমিগুলোদের কাছ-থেকে নিলামে-কেনা বা পরিত্যক্ত খাকি পোষাক, লাল টক্‌টকে কামিজ, টুপি, ছুরি, কাঁটা, বোতাম, পুবোন বই···ফিরিঙ্গি জীবনের খুঁটি-নাটি এটা-সেটা পাঁচটা সামগ্রী। একটু বড হয়েই বখা দোকানগুলোর সামনে অকারণ ঘোরা-ফেরা করত। ভেতরে ঢুকে এটা-সেটা নাড়া-চাড়া ক'রে দেখতে তার ইচ্ছে হোত। কিন্তু সাহসে কুলিয়ে উঠত না কিছুতেই। কেন না, দোকানে ঢুকে কোন একটা জিনিষের দর শুধালেই দোকানী এমন একটা চড়া দাম হাঁকবে যা মেটানো ওর পক্ষে অসাধ্য। তা ছাড়া সে যে ধাঙড়দের ছেলে, লোকটা দু'টো কথা বলেই টের পেয়ে যাবে। তাই এতদিন সে দোকানটার সামনে ঘোরা-ফেবা করত অকারণ। ভেতরকার চোখ-ধাঁধানো হরেক রকমের পণ্যগুলির দিকে তাকিয়ে থাকত হাঁ ক'বে। আর ভাবত: সাহেবদের মত সেও তো চলা-ফেরা করে। ওদের মত দেখায়ও তাকে অনেকটা। কিন্তু ওদেব মত কিছু কিনবার পয়সা থাকে ওর কই?

বখার মনে প্রশ্ন জাগে। রঙিন স্বপ্নটা বুঝি ওর ভেঙ্গে পড়ে খানখান হয়ে। ভয়ানক সে দমে যায়। মনমরা হয়ে পা বাড়ায় ঘরের দিকে।

তারপরেই একদিন বথার কপালটা ফিরে গেল। বৃটিশ ব্যারাকের কাজটা সে গেল পেয়ে। তলবের পুরো অঙ্কটা অবশ্য বাপের হাতেই ওকে তুলে দিতে হত। কিন্তু টমিগুলোর কাছ থেকে বকশিস হিসেবে সে যা পেত, তাও—নেহাৎ কম নয়—প্রায় দশ টাকার মত। পুরানো কাপড় চোপড়ের সেই দোকান থেকে মাত্র ওই কটা টাকাতে আপন খুশীমত সব জিনিষ তার অবশ্য কেনা হোত না। তবু একটা জ্যাকেট, একটা ওভারকোট আর রাত্রে সে যে কম্বলখানা গায়ে দেয় সেটা কিনে নিয়েছিল। এ ছাড়াও এক প্যাকেট 'লাল-লণ্ঠন' সিগারেট কিনবার মত আনা কয়েক পয়সা ওর হাতে উদ্বৃত্ত থাকত প্রতি মাসে। ওর বাপ কিন্তু যেত রেগে। বলত, অপব্যয়—দু'হাতে খালি পয়সা ওড়ান। অচ্ছুত পল্লীর অপর ছেলে-ছোকরারাও ওকে টিটকারী দিত। হাসা-হাসি করত ওর নতুন সাজ-সজ্জা নিয়ে। এমন কি ছোটা আব রামচরণও ওকে ছাড়ত না। ডাকত: 'নকলী পিল্‌পলি সাহেব' বলে। পরনের একমাত্র সাহেবী পোষাক-আসাক ছাড়া এক বর্ণ সাহেবী গুণ যে ওর মধ্যে নেই, একথা বথাও জানত। তবু কিন্তু হাল ছাড়ল না সে। দিন-বাত সব সময়ই সে তার নতুন পোষাক-পরিচ্ছদে থাকত সেজে-গুজে। শীতে হু হু ক'রে কাঁপলেও বাত্রে কোনদিন দেশী লেপ গায়ে দিত না। থাকত ভাবতীয়ানাব সব বকমের ছায়া-ছোঁয়া বাঁচিয়ে।

শির শির ক'বে একটা ঠাণ্ডা হিমেল শিহরণ খেলে যায় বথাব উষ্ণ স্থূল দেহ বেয়ে। সর্বাঙ্গ তার কাঁটা দিয়ে ওঠে। পাশ ফিবে শোয়। ঝাপসা অন্ধকারে প্রত্যাশা করতে থাকে কিসেব যেন। বাতগুলো কি ঠাণ্ডা। সত্যি দুঃসহ! দিনের বেলাটাই ভালো লাগে বথার। চারদিকে কেমন ঝকঝকে রোদ। হাতের কাজকর্মগুলো সেরে নিয়ে পোষাক-আসাক ঝেড়ে-মুছে সে তখন বেরিয়ে পড়তে পারে রাস্তায়। ওকে দেখে ওর সঙ্গীদের চোখ ওঠে টাটিয়ে। কেনই বা উঠবে না? অচ্ছুত পল্লীর সে হোল এক পাণ্ডা। কিন্তু সারা রাতটা

কি করে কাটায়! 'না, আর একখানা কম্বল না নিলে চলছে না,' বধা বিড় বিড় ক'রে উঠলে আপন মনে।' —বাপের কাছ থেকে তা হোলে লেপের জন্তে মুখ ঝামটাও শুনতে হয় না বারবার। চব্বিশ ঘণ্টা খাপ্পি মুখে গাল-মন্দ লেগেই আছে। সব কাজটাই সে ওঁর ক'রে দেয়, পুরো তলবটা কিন্তু মেরে দেয় বাপ ব্যাটা। সেপাইদের কি ভয়টাই না করে বুড়োটা! ওদের কাছ থেকে ওকে গাল-মন্দ কটু কথা শুনতে হয় সব সময়। চোট্‌টা কিন্তু এসে পড়ে আমার ওপর। আমাকেই মিছি মিছি খেতে হয় গালাগাল তাঁর কাছ থেকে। সেপাইরা একবার জমাদার বলে ডাকলে কি খুশীটাই না হোন বাবা। গলা বাজিয়ে বড়াই করতে থাকেন নিজের ইজ্জতের! শুধু কি তাই?—' বধা আরও ভেবে চলে: '—বস্তির সবার কাছ থেকে সেলাম কুড়িয়ে বেড়ানটাও চাই। ···একটা মুহূর্ত যদি হাত পা গুটিয়ে একটু জিরোতে পারতাম? তবু কিন্তু কপালে গালি-গালাজ হয়রানির অন্ত নেই। পাড়ার ছোকরাদের সঙ্গে একটু খেলতে গেছি, অমনি ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকি শুরু ক'রে দিলে খেলার মাঝখানে। খেলা ফেলে ছোট এবার টাট্টিখানা সাফ করতে! বুড়ো হয়ে গেল চুল পেকে। তবু এখনও যদি জানত সাহেব-সুবোদের হাল-চাল একটুখানি! বাইরে আজ অমন ঠাণ্ডা। কোন্ আক্কেলে আমায় এখন বিছানা ছেড়ে উঠতে বলছে শুনি? আমি এখন ছুটি কিনা টাট্টি পরিষ্কার করতে আর উনি দিব্যি আরামে থাকুন লেপের তলায়!' বধা আর সোহিনীও ঘুমুচ্ছে দিব্যি নাক ডাকিয়ে।···

বধার কালো, চ্যাপ্টা, চওড়া মুখে ফুটে ওঠে বিরক্তির খাঁজ। তবু সে থাকে কান খাড়া ক'রে। এখুনিই হয়ত হাঁক-ডাক তর্জন-গর্জন শুরু ক'রে দেবে ওর বাপ। বিছানা ছেড়ে উঠবার জন্য পীড়াপীড়ি করবে। আসবে বাপের রূঢ় অমোঘ আদেশ।

নাক ডাকার শব্দ থেমে যায় সহসা।

'ও বখিয়া, ওঠ না, শুয়ার কা বাচ্চা,' বাপের বাজখাই গলা ছিটকে আসে গুলীর মত। '—ওরে ওঠ, টাট্টিগুলো সাফ ক'রে আয়। সেপাই লোক নইলে যে গোসা হবে।'

প্রত্যেক দিন ঠিক এ সময়টায় ঘুম ভেঙ্গে যাবে বুড়োটার। তাকে ধরে ডাকাডাকি করবে। তারপর যথারীতি ছেঁড়া তালি-লাগান তেল চটচটে লেপের তলা থেকে নাসিকা গর্জন শোনা যাবে।

বাপের ডাক শুনে বখা একবার তাকালে আড় চোখে। মাথা তুলবার চেষ্টা করলে একবার। কিন্তু সকাল বেলায়ই মিছি মিছি খানিকটা গাল খেয়ে ওর মেজাজটা তিবিক্কি হয়ে উঠল। চটে গেল সে হাড়ে হাড়ে। ক্রুদ্ধ আক্রোশে মুখখানা হয়ে গেল থমথমে, বিবর্ণ।··

অনেকদিন আগেকার কথা তার মনে পড়ল। মনে পড়ল, মা যে-বার মারা গেল সেদিন সকাল বেলাকার কথা। সেদিনও বখা এমনি চোখ বুঁজে আরাম ক'রে শুয়েছিল। বাবা ভাবলে বুঝি সে জেগে নেই। তাই ওকে জাগাবার জন্য সেদিনও এমনি ক'রে হাঁকা-হাঁকি ডাকা-ডাকি দিয়েছিল শুরু ক'রে। ভোর বেলায় বাবার এ হাঁকা-হাঁকির প্রথম সূত্রপাত হয় সেদিন থেকেই। প্রথম প্রথম সে অবশ্য শুনেও-শুনছে-না-গোছের হয়ে পড়ে থাকত। কানেই তুলত না বাপের কথা একেবারে। সকাল সকাল সে যে বিছানার মায়া কাটিয়ে উঠতে পারে না এমন নয়। সকালে উঠা অভ্যেসটা তার অনেক দিনের। মা-ই ক'রে দিয়ে গেছে।

ওদের শোবার ঘরের এক কোণে দু'খান ইঁট পেতে উনান তৈয়েরী ক'রে রোজই গরম জলে চায়ের পাতা সেদ্ধ করা হোত। ঘুম থেকে উঠলেই মা অমনি এসে সস্‌পেন থেকে খানিকটা চা ঢেলে পেতলের একটা গ্লাশে করে দিত। টাটকা গরম চায়ের স্বাদটা কি চমৎকার আর উপাদেয়! কথাটা ভাবতেই ঘুমোবার আগে জিভে জল এসে পড়ত বখার। চা-টা খেয়ে নিয়ে জামা-কাপড় পরে সে বেরিয়ে পড়ত টাট্টি-সাফার

কাজে। বথার তখন ফূর্তি দেখে কে?···মা হঠাৎ মারা গেল। সংসারের সব ঝক্কি এসে পড়ল ওর ঘাড়ে। সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠে গামলা-ভর্তি চা-ই বা আজকাল আব কে যোগায়? তাই চা ছাড়াই এখন সে চালিয়ে দেয়। আগেকার দিনের কথা মনে পড়লে ব্যথায় ওর মনটা ওঠে টন্ টন্ ক'রে। গরম চায়ের সঙ্গে জলখাবারেব কথাই নয় খালি, অনেক কিছুই তার তখন মনে পড়ে। সত্যি, তখন কি তোফাই না ছিল সে। কোন ভাবনা ছিল না। আরামেই কাটছিল দিনগুলো। মা কেমন চমৎকার জামা-কাপড় কিনে দিত ওকে। প্রায়ই নিয়ে যেত শহরে। হেসে-খেলে পরম নিশ্চিন্তে সে তখন কাটাত তার দিনগুলো।

মাব কথা তার প্রায়ই মনে পড়ে।···কালো বেঁটে খাটো গড়ন। পরনে মাত্র সাদা-সিদে একটা ব্লাউস, একজোড়া ঢিলে পায়জামা, এক খানা মাত্র ওড়না। ও পরেই মা রান্না-বান্না, মাজা-ঘষা, ঘরের কাজ-কর্ম সব ক'রে বেড়াত ফুর ফুর ক'রে। খাঁটি ভারতীয় রক্ত-ধাবা ছিল মার ধমনীতে। পুরোপুরি ভাবতীয় ধাঁচেই গড়া—অনেকটা বুঝি সেকেলে মান্ধাতা আমলের মানুষ। মা তাই ওর সাহেবী বেশ-ভূষা বরদাস্ত কবতে পারত না একেবারে। কিন্তু মুখ ফুটে কিছু বলত না। কি উদার! মার কাছে হাত পেতে কোনদিন তাকে বিমুখ হতে হয় নি। ঠিক যেন মূর্তিমতী করুণা!

আজ মা আব নেই। তবু কি জানি কেন বথার কোন দুঃখ হয় না মার জন্য। মাব অভাব সে বুঝি অনুভব কবে না। সত্যি, সাহেবী হাল-চাল পোষাক-পরিচ্ছদ আর 'লাল-লণ্ঠন' সিগারেট প্রভৃতি নিয়ে যে জগতে তার বিচবণ আব আনাগোনা, তার সঙ্গে মায়েব ছিল না নাড়ীর কোন যোগ—শুধু ছিল বুঝি অতলান্তিক ব্যবধান আর সীমাহীন দুস্তর দূরত্ব।···

'বেজন্মা! আরে, তুই উঠলি?' আবার খেঁকিয়ে উঠল ওর বাপ। হাঁপানী রুগী। কাশির প্রবল তোরে ফেটে পড়ল হাঁক ছেড়েই।

বথা কোন সাড়া দেয় না। পাশ ফিরে শোয়। বিড় বিড় ক'রে সে গাল পাড়ে বাপের উদ্দেশে। শরীরটাও ওর মোচড় দিয়ে ওঠে এক সময়। বোধ হয় জ্বর জ্বর যেন। মনে হয় হাড্ডিগুলো যেন তালগোল পাকিয়ে গেল। হিম হয়ে গেল দেহটা। চোখের কোণ বেয়ে ওর জল গড়িয়ে পড়ে। একটা নাক বুঝি আসে ঢিবে হয়ে। জোরে জোরে সে নিশ্বাস ফেলতে থাকে। গলাটাও রুদ্ধ হয়ে আসে কফে। গুর্ গুর্ করতে থাকে ভেতরটা। খুক্ খুক্ ক'রে বার কয়েক কেশে বথা গলাটা পরিষ্কার ক'রে নিল। থু ক'রে কফটা ফেলল ঘরের এক কোণে। তারপর কনুইয়ের উপর ভর ক'রে উঠে বসে নাকটাও ঝাড়ল বিছানার গালিচাখানায়। শীত শীত করছিল। কম্বলখানা গায়ের উপর টেনে দিয়ে সে আবার শুয়ে পড়ল।

'ও বথিয়া! ও বথিয়া! ওরে, নচ্ছার ধাঙড় বাচ্চা কোথাকার, শুনছিস? আমায় একটা টাট্টি সাফ ক'রে দে না?'

কে যেন হাঁক ছাড়ল বাইরে থেকে।

বথা কম্বলখানা এবার দূরে ছুঁড়ে দিল। হাত-পাগুলো টান-টান ক'রে অড ভাঙল। কচলাল চোখদুটো। হাই তুলল। তারপর তড়াক ক'রে বসলে উঠে। ঐ টুকুন ঘর। সংসারের কাজ-কর্ম সব সমাধা করতে হয় ওরই মধ্যে। কম্বল আর গালিচাখানা গুটিয়ে না রাখলে নয়। বিছানাটা তুলে রাখতে বথা তাই নীচু হলো। কিন্তু পরক্ষণে বাইবে দাঁড়ায়ে কে যেন হাঁকা হাঁকি করছে মনে পড়তেই সে অমনি ছুটল দরজার দিকে।

বাইরে দাঁড়িয়েছিল পাতলা বেঁটে খাটো গোছের একটা লোক। পেতলের একটা ছোট লোটা ওর বাঁ হাতে। মাথায শাদা কাপড়ের টুপি। পায়ে খড়ম। কোমরে এককালি কাপড় না থাকলে উলঙ্গই বুঝি বলা যেত। নাকে গোঁজা কাপড়ের খুঁটটা। ও হোল হাবিলদর চারৎ সিং। ৩৮ নং ডোগরা রেজিমেন্টের নাম করা হকি খেলোয়াড়। যেমন ওস্তাদ

রসিকতায় তেমনি আবার তার স্বভাবে আছে সহ-জাত ভারতীয় সরলতা। নিজের পুরনো অর্শরোগের কথা নিজেই জাহির ক'রে বেড়ায় সকলের কাছে।

'টাট্টিখানা সাফ করিস নি কেন রে, হারামজাদা নচ্ছার! কার বাপের সাধ্যি ও পাশ ঘেঁষে? সব কটা দিক আমি পঁই পঁই ক'রে ঘুরে এলাম! জানিস হারামজাদা, জানিস তুই, আমার এ-অর্শরোগের জন্য একমাত্র তোরাই দায়ী! নোংরা এক পায়খানাতে বসেই না আমার এমন দশাটি হোয়েছে।'

ঝাড়ু আর বুরুশটা গোঁজা ছিল বাইরের দেয়ালের এক জায়গায়। বথা সেগুলো বার ক'রে নিতে নিতে বলল :

'বেশ তো হাবিলদারজি, আমি এক্ষুণি সাফ ক'রে দিচ্ছি।' ঘাড় গুঁজে বখা আপন মনে কাজ ক'রে চলল। খোলা দরজা এক একটা পায়খানা থেকে অপর পায়খানায় ছুটে ঝাড়ু দিয়ে মেঝে ঘষে, ফিনাইল ঢেলে সে পরিষ্কার করে চলল ক্ষীপ্র ঝটপট হাত চালিয়ে। শরীরের প্রত্যেকটা পেশী ওর ফুলে উঠতে লাগল রোঁয়া রোঁয়া শক্ত হয়ে। 'ভাবী পাকা ওস্তাদ তো জমাদারটা।' বথাকে কাজ করতে দেখে বলে উঠবে হয়ত যে কেউ। —পায়খানার ঝাট-পোছ নোংরা কাজ-কর্ম চব্বিশ ঘণ্টা করেও ও নিজে করে না নোংরামি।' অপরিষ্কার অপরিচ্ছন্ন হয়ে থাকে না।

'কেন যে করতে যায়? ও সব নোংরা কাজ-কর্ম কি ওর জন্যে?' নিজেদের মধ্যে অনেকে করতে থাকে বলাবলি। বলে : 'ধাঙড় বেটারা হোল ছোট লোক—নোংরা জাত। পাশ ঘেঁষে কার বাপের সাধ্যি। কিন্তু বথাটা অমন নয়। ভাবী চালাক চতুর।...'

হাবিলদার চারৎ সিং পবিত্র হিন্দু ধর্মের জারক রসে জারিত। সকল ছোঁয়া ছুঁয়ির উর্ধ্বে। পায়খানায় একবার ঢুকলে ওর পাক্কা আধ ঘণ্টাকালের আগে বেরুবার জো নেই। দীর্ঘ সময়টা পায়খানার মধ্যে জ্বালা-যন্ত্রণায় কাটিয়ে

চারৎ সিং বেরিয়ে এসে রীতিমত তাজ্জব বনে গেল বখাকে দেখে। ছোট জাত; তবু দেখ কেমন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন! চারৎ সিং কেমন যেন আত্ম-সচেতন হয়ে উঠল। কুলীন বামুনদের সংস্কারের মোহ কাটিয়ে উঠতে সে এখনো পারেনি। তবু বখাকে দেখে ও প্রশান্ত একটু হাসলে। বললে:

'ওরে বখিয়া! তুই যে দেখছি রীতিমত ভদ্দোরলোক বনে যাচ্ছিস! অমন পোষাক পেলি কোথায় রে?'

লজ্জায় বখার মাথটা নুয়ে এল। সত্যি, ছোট জাত হয়ে বড়ো লোকদের মত অমন বাবুগিরি করার তার কিই বা অধিকার আছে? সে কয়েকটা ঢোক গিলল। একান্ত বিনীত ভাবে বলল:

'হুজুর, এ যে সব আপনাদেরই মেহেরবানি।'

দু'হাজার বছরের ঘুনে-ধরা শ্রেণী ও বর্ণ বৈষম্যের মোহপাশ তখনও কাটিয়ে উঠতে না পারলেও চারৎ সিং-এর মনটা আর্দ্র হয়ে উঠল। ও জানত ছোকরাটা ভালো খেলতে পারে। তাই বলল:

'বখা, আজ বিকেলে আসিস, তোকে একখানা হকি স্টিক দেব।'

বখা সিধে হয়ে উঠে দাঁড়াল। অবাক বনে গেল সে। চারৎ সিং বলে কি? রেজিমেণ্টের সেরা হকি খেলোয়াড় চারৎ সিং। আপনা থেকেই ও উপহার দিতে চাচ্ছে তাকে একখানা হকি স্টিক! 'হকি স্টিক। সত্যি নাকি, আনকোরা নতুন নয়তো?' বিড় বিড় ক'রে উঠলে বখা আপন মনে। কৃতজ্ঞতায় মনটা তার গলে গেল। বাপ-ঠাকুরদার কাছ থেকে বখা উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়ে এসেছে নতশির হীন দাসত্বের রক্তধারা। পেয়েছে নিপীড়িত নির্যাতিত উপেক্ষিত মানব-আত্মার অক্ষম দুর্বলতা; পেয়েছে হঠাৎ-এতটুকু-স্নেহ-করুণার-স্পর্শে বিগলিত নিঃস্ব কাঙাল মানবের একান্ত অসহায়তা—দীর্ঘ প্রতীক্ষিত কোন এক গোপন ইচ্ছা পূরণের অপ্রত্যাশিত প্রতিশ্রুতিতে লেজ-নাড়া রাস্তার কুকুরের মত নিতান্ত নিষ্ক্রিয় আত্ম-তুষ্টি। চারৎ সিংএর উদার অকুণ্ঠ প্রতিশ্রুতি

বখার সেই রক্ত-ধারার অণু-পরমাণুগুলোকে করল অনুরণিত—করল পুনরুজ্জীবিত।

কপালে দু'হাত ঠেকিয়ে সে তার পরম হিতাকাঙ্খীকে সেলাম জানালে। ঘাড় গুঁজে তারপর আবার মন দিল আপন কাজে।

ফিকে এক ফালি হাসির রেখা দেখা দিল ওর ঠোঁটের কোণে। প্রভুর কাছ থেকে দুটো মিঠে কথা শুনে আহ্লাদে আটখানা হয়ে ক্রীতদাস যেমন হাসে গর্বের হাসি, ঠিক যেন তাই। বখা গান গেয়ে উঠল গুণ গুণ ক'রে। একটার পর একটা পায়খানা ছুটে ছুটে পরিষ্কার করে চলল সে। এক সময়ে গলাটা ওর শুনা গেল বেশ দূর থেকেও। তবু সে কিন্তু কাজে ক্ষান্ত দিল না এক মুহূর্তের জন্যে। সমানে চলল কাজ ক'রে। মাথার পাগড়ীটা খালি একবার আল্‌গা হয়ে খুলে পড়েছিল আর ওর ওভারকোটের একটা পুরানো বোতাম খুলে গিয়েছিল ঘর থেকে মাত্র। ঢিলে পোষাকটা কোন রকমে সামলে নিয়ে সে কাজ করে চলল আপন মনে।

বিরাম নেই; একজনের পর একজন আসতে লাগল টাট্টিখানায়। অধিকাংশই হিন্দু। পরনে খালি একখানা গামছা। হাতে পিতলের একটা লোটা আর বাঁ কানে পৈতেটি গোঁজা। মাঝে মাঝে দু' একজন মুসলমানও আসতে লাগল। গায়ে সুতোর সাদা লম্বা চোগা। পরনে ঢিলে পায়জামা আর হাতে মস্ত একটা তামার বদ্‌না।

বখা একটু দম নিল থেমে। কপাল বেয়ে টস্ টস্ ক'রে ওর ঘাম পড়ছিল। জামার আস্তিনটা দিয়ে মুছে নিল ঘামের ফোঁটাগুলো। একটা উষ্ণ শিহরণ খেলে গেল বখার। তৃপ্তির আরামের একটা ছোট নিশ্বাস ঝরে পড়ল তার বুক থেকে। নতুন উদ্যমে সে আবার মন দিল কাজে। টাট্টিখানার শেষ প্রান্তে এসে আপন মনে ভাবে: 'এই তো শেষ করে এলাম প্রায়, কাজকে কখনো সে ভয় করে না। সত্যি, চুপচাপ হাত পা গুটিয়ে সে কেন বসে থাকতে পারে না। কাজের

পুরস্কার হোল অঢেল ঘুম, প্রচুর স্বাস্থ্য—সত্যি, কাজ ক'রে চলার কি আরাম! কি অপূর্ব মাদকতা। একটানা তাই সে কাজ ক'রে চলত চব্বিশ ঘণ্টা। হাত পাগুলো ওর কন্ কন্ ক'রে উঠত। হাঁপিয়ে উঠত সে অনেক সময়। তবু কিন্তু কাজে ক্ষান্ত হোত না। বোধ করত না ক্লান্তি।

দু'বার হোল সাফ করা এ নিয়ে সকাল থেকে। তৃতীয়বার টাট্টিখখানার শেষ মাথার কাছাকাছি এসে পৌঁছতেই বথার মাজাটা বুঝি ধরে গেল। পিঠটা কন কন ক'রে উঠল। শির দাঁড়াটা টান ক'রে সে উঠে দাঁড়াল পুবের শহরের দিকে মুখ ক'রে। ঝাপসা ধোঁয়াটে ঘন কুয়াশা ছেয়ে আছে চার দিকে। সে আবছা আবরণ ভেদ ক'রে দৃষ্টি চালাল। দেখল অর্ধ-উলঙ্গ হিন্দুরা উর্ধ্বশ্বাসে ছুটছে টাট্টিখানার দিকে। যাদের কাজ সারা হয়ে গেছে তারা এখন নদীর ধারে বসে নিজ নিজ লোটা মাজছে কাদা দিয়ে। কুঁকড়ে জড়সড় হয়ে কেউ কেউ বা নেমে পড়েছে জলে আর টেনে টেনে গাইতে শুরু ক'রেছে 'রাম রাম'। নদী থেকে নরম মাটী তুলে হাতে বগড়াচ্ছে। কেউ বা হাত মুখ ধুচ্ছে; কেউ বা দাঁতন করছে। সশব্দে কুলকুচি করছে কেউ বা। কেউ বা প্রচণ্ড শব্দে নাক ঝাড়ছে। বৃটিশ ব্যাবাকে কাজ করতে যাবার পর থেকে বখা ভারতীয়দের স্নান, হাত পা ধোয়া, কুলকুচি করা ইত্যাদির ধরণ দেখে লজ্জা পেত খুব। কেন না সে জানত টমিরা ওসব কোনটাই পছন্দ করে না। ওর বেশ মনে পড়ে দেশী লোক দেখলেই অমনি ওরা বলে ওঠে: 'কালা আদমী জমিন পর হাগনে-ওয়ালা'। কিন্তু নিজেরা যখন সম্পূর্ণ উলঙ্গ হয়ে টবে স্নান করতে যায়? হোক না সাহেব! তাই বলে ছেড়ে-ছুড়ে কথা কইতে হবে নাকি? সত্যি, কি ঘেন্নার কথা!—বখা বলে উঠে আপন মনে। লজ্জায় তার মাথাটা পর্যন্ত হেঁট হয়ে আসে। ওরা যা করবে সবটাই 'ফ্যাস্থন' আর এদেশের লোকেরা কিছু একটা করলেই অমনি ওরা হোল 'নাটুস্—ন্যাটিভস্'!

হিন্দুরা জলে নেমে নাভির কাপড়খানা একটু ঢিলে ক'রে প্রথমেই খানিকটা জল ঢেলে সুরু করে ভজন গাইতে; তারপর আপাদমস্তকে ঢালতে থাকে জল। বথা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখে আর মজা পায়। আর মুসলমানরা মসজিদে ঢোকার আগে মুখ-হাত ধুয়ে নিজেদের ওজু ক'রে যখন আলখালার মধ্যে দু'হাত বিশ্রীভাবে ঢুকিয়ে ছোটে ওর কেমন যেন লাগে। আচ্ছা নমাজ করতে গিয়ে ওরা অতবার উঠ-বোস করেই বা কেন? যেন রীতিমত ব্যায়াম করছে আখড়ায়—বথা শুধায় নিজেকে। মনে পড়ে, আলিকে একবার সে জিজ্ঞেস করেছিল কথাটা। আলির বাপ রেজিমেণ্টে ব্যাণ্ড বাজায়। আলি কিন্তু কোন জবাব দেয়নি, চটেও গিয়েছিল। বলেছিল, বথা ওদের ধর্ম-তুলে কথা বলছে। নিন্দা করছে ধর্মের।

বথার আরও মনে পড়ল, সকাল হতে না হতেই শহরের বাইরে খোলা মাঠে স্ত্রী-পুরুষ নির্বিচারে সবাই বসে যায় দলে দলে কাপড় খুলে। 'কি বেহায়া সব! সত্যি, ওদের কি একটুও লজ্জা করেনা?' বথা শুধায় নিজেকে। '—রাজ্য-শুদ্ধ লোক যে দেখছে ওদের, একটুও কি খেয়াল নেই? এজন্যই তো গোরাগুলো বলে, 'কালা আদমী জমিন্ পর হাগ্‌নেওয়ালা!' লোকগুলো তো এখানেও আসতে পারে?' না-না। বথা পরমুহূর্তেই আবার শুধরে নেয়। ওরা যদি সবাই এখানকার টাট্টিগুলোতে হানা দিতে থাকে, ওর কাজ যাবে তা হ'লে বেড়ে। রাস্তা ঝাড়ু দেওয়ার কাজটাই ঢের ভালো কিন্তু—ভারী সোজা। ফাওড়াখানা আর ঝাটা নিয়ে রাস্তা থেকে খালি গরু আর ঘোড়ার নাদাগুলো তুলে নেওয়া আর রাস্তার ধুলোগুলো একবার ঝাট্ দিলেই হোল। ভারী সহজ কাজ। ওর বাপই করে। ওরও করতে ইচ্ছে হয়।

'একটা পায়খানাও যদি পরিষ্কার থাকত। ওরে, তোরা কি সব মাগনা কাজ করিস? মাইনে পাস না?'

বখা চমকে উঠে মুখ ফিরাল। দেখল কটমট ক'রে তাকিয়ে আছে রামানন্দ মহাজন আর গাল পাড়ছে ওর উদ্দেশে দক্ষিণ দেশী নিজেরই ভাষায়। বুড়োটা যেমন কালো কুচকুচে তেমনি আবার খিটখিটে। কানে ওর এক জোড়া মুক্তা বসানো সোনার কুণ্ডল। পরনে সাদা ফিনফিনে একখানা মিহি ধুতি আর গায়ের সার্টটা বিপুল ভুঁড়ীটাকে ঢেকে রেখেছে। ঢেপ্‌প এক প্যাচান পাগড়ী মাথায়।

'মহারাজ!' দু'হাত জড়ো ক'রে বখা পেন্নাম করল রামানন্দকে। তারপর ছুটল টাট্টিখানার দিকে।...

একবার কাজ করতে লেগে গেলে বখার কোনদিকেই আর হুশ থাকে না। সব কিছুই সে ভুলে যায়। এবার নিয়ে চারবার হ'লো। তবু মিনিট-পনরোর মধ্যে টাট্টিগুলো তাকে আবার পরিষ্কার করতে হবে, কথাটা তা'র মনে ছিল না। কপাল বেয়ে টস্ টস্ ক'রে ঘাম পড়ছিল। কপালের ঘামটা মুছবার সে একবার ফুরসৎও পর্যন্ত পেলো না। কটা বাজলো তাও বা কে জানে?

বাড়ীর কাছে চিম্‌নিটা ধোঁয়া ছাড়ছিল। বখার চোখ পড়ল একসময় তার ওপর। ধোঁয়াটা দেখেই তা'র পরবর্তী কাজের কথা মনে পড়ল। অনেকটা অনিচ্ছাসত্ত্বে ওদিকে সে পা বাড়াল। ফেওড়া খানা তুলে নিতে একবার থামল। নোংরা পোড়ানোর জন্যে পিরামিড্ ধরনের শান্‌বাঁধনো চুল্লীটার ছোট মুখে সে খড় ভর্তি করতে লাগল।

ময়লাশুদ্ধু খড়ের গুঁড়ো উড়তে লাগল বাতাসে। বখার কাপড় জামার উপর এসে পড়েছে কিছু কিছু। আর অপেক্ষাকৃত যেগুলো ভারী ছিট্‌কে পড়ছে মাটিতে। ঝাড়ু দিয়ে সেগুলো আবার কুড়িয়ে নিয়ে বখা চিম্‌নির মুখে ঠেসে দিতে লাগল। দিক্-বিদিক জ্ঞান হারিয়ে বখা কাজ করে চলল আপন মনে। এমনিধারা তা'র চলে আসছে অনেকদিন থেকে। এ-ছাড়া আর উপায়ও নেই। যে নোংরা পরিবেশে নোংরা কাজ তাকে

হামেশা করতে হয় তার জন্য 'আপনভোলা-মাতোয়ারা না হ'য়ে তা'র উপায় কি? ওই তার একমাত্র শিরস্ত্রাণ। চুল্লীটা, ময়লা নোংরা খড়-কুটোয় ভর্তি হ'য়ে উঠেছিল আ-কাট্ হ'য়ে। তবু ফেওড়াখানা দিয়ে বথা চুল্লীটার মুখে খড় ঠেসে দিতে লাগল। লম্বা একটা কাঠী জ্বেলে সে খড়টায় আগুন ধরিয়ে দিল। আগুনটা সহসা জ্বলে উঠল দপ্ ক'রে। তার লক্‌লকে লেলিহান জিভ্‌খানা বাড়িয়ে খড়ের গাদাটার এখানে-ওখানে যেন চাট্‌তে লাগল।

আগুনটার রক্তিম সোণালী শিখায় চারদিক উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠলো।

বথা চুল্লীটার মুখের কাছে দাঁড়িয়েছিল। আগুনের আঁচ এসে তা'র গায়ে লাগছিল।

গোলগাল তা'র কালো মুখখানি হ'য়ে উঠল উজ্জ্বল।

সারাদিন হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খেটে খেটে তা'র দেহটা হ'য়ে উঠেছিল বেশ শক্ত মজবুত্, সুশ্রী সুডোল। দেখলেই চোখদুটি জুড়িয়ে যায়। বলে উঠতে ইচ্ছে করে: 'হ্যাঁ, শরীরখানা বটে!' আজন্ম গু-মুত-ঘাটা নোংরা কাজ ক'রে এলেও কদরটা যেন বেড়ে ওঠে।

বেশ খানিকটা সময় লাগবে। ময়লাটা পুড়ে নিঃশেষ হ'তে মিনিট বিশেক দরকার। তবু তা'র ক্লান্তি বোধ হয় না। আগেকার কাজের তুলনায় এটা কিছুই নয়।…

ময়লাশুদ্ধ সবটা খড়্ নিঃশেষ হ'তে বথা চুল্লীর মুখটা বন্ধ ক'রে দিল। কাজ-কর্ম সেরে সে এবার ফিরে চলল। জায়গাটা চিমনীর চাপ চাপ ধোঁয়ায় ভরে গেল। ভয়ানক তা'র তেষ্টা পেয়েছিল। ঠোঁট দুটো শুকিয়ে কাঠ হ'য়ে গেল। হাতে ফেওড়া, ঝাড়ু-ঝুড়ি আর বুরুশটা সে ওদের নিজ নিজ জায়গায় দিল রেখে। পরণের কাপড়-চোপড়টা ঝেড়ে মুছে সে তারপর নিজেদের কুঁড়েখানার দিকে পা বাড়াল। তেষ্টায় তা'র ছাতিটা বুঝি ফেটে যাবে। ঘরটার এককোণে বাসনপত্রগুলো রাখা ছিল গাদা ক'রে।

তা'র ওপর চোখ পড়তেই তা'র চা খেতে ভয়ানক ইচ্ছে হোল। আবছা অন্ধকারে ঘরটার সর্বাঙ্গে সে একবার চোখদুটি বুলিয়ে নিল। দেখল ছেড়া বিবর্ণ লেপখানা আপাদমস্তক মুড়ি দিয়ে তখনও নাক ডাকাচ্ছে। আর ভাইটি কখন বেরিয়ে গেছে ঘর থেকে। সে জানে এই সময়টা কোথায় কাটিয়ে দেয় ও। রাস্তার পাশে ময়দানে নিশ্চয় খেলছে। রথা আরও দেখল ঘরের এক কোণে দু'খানা ইটের এক উনানে তা'র বোনটি আঁচ দেবার চেষ্টা করছে। ভিজে মাটির মেঝের ওপর উপুর হ'য়ে বসে পাছাটা কিছুটা তুলে নীচু হ'য়ে সে উনানটায় অবিরাম ফুঁ দিয়ে চলেছে। তা'র মাথাটা মাটির সঙ্গে প্রায় মিশে গেছে। সে খালি ফুঁ দিয়েই চলেছে। ভিজে কাঠে আগুণ ধরবার নামই নেই। ছর ছর ক'রে খালি ধোঁয়া উঠতেই লাগল। একান্ত নিরুপায় হ'য়ে সে হাল ছেড়ে দিল। এমন সময় পেছনে শুনতে পেল দাদার পায়ের শব্দ। সে পেছন ফিরে তাকাল। চোখ দুটো তা'র জলে ছল্ ছল্ ক'রে উঠল। দাদাকে দেখে এবার গণ্ড বেয়ে অশ্রুর বান ডাকল।

'তুই ওঠ, আমি ফুঁ দিচ্ছি।' রথা বলল। ঘরের কোণে গিয়ে বসল সে হাঁটু গেড়ে। উনানটা একবার নাড়া দিল দু'হাতে। গাল ফুলিয়ে তারপর ফুঁ দিতে লাগল ঝুঁকে পড়ে। যেন একটা কামারের জাঁতা। ভিজে কাঠগুলো উনানটায় দপ্ ক'রে জলে উঠল এক সময়। রথা এবার হাঁড়িটা চাপিয়ে দিল উনানটার ওপর।

'হাঁড়িতে পানি নেই যে—' তার বোন বলে উঠল সহসা।

'দাঁড়া, কলসী থেকে আমি পানি ঢেলে আনছি।' রথা জবাব দিল।

'কলসীতেও পানি নেই।'

'উঃ।' ক্লান্ত অবসন্ন কণ্ঠ থেকে ঝরে পড়ল ছোট্ট একটা দীর্ঘ নিশ্বাস রথার। খালি কলসীটার উপর ঝুঁকে পড়ল সে।

'দাঁড়াও, আমি চট ক'রে গিয়ে পানি নিয়ে আসছি।' সোহিনী বলল ঘাড় হেঁট ক'রে।

'বেশ, যা।' বখা সায় দিল সহজ গলায়। তারপর ঘরের বাইরে গিয়ে বসল ভাঙা একখানা বেতের চেয়ারের উপর। একদা ইংরাজদের মত দৈনন্দিন জীবন যাপন করতে সাধ ছিল তার। বেতের এ চেয়ারখানা তাই সে সংগ্রহ করেছিল। ঘরের খাস বিলাতী ধরনের আসবাবপত্রের মধ্যে ওই চেয়ারখানাই একমাত্র যা নিদর্শন। সোহিনী জলের খালি কলসীটা মাথায় তুলে নিল। যাতে পড়ে না যায় এমনি ভাবে ঠিক ক'রে বসিয়ে নিয়ে হন হন ক'রে সে বেরিয়ে গেল দাদাব পাশ কেটে।

গোলাকার কারো মাথার উপর গোলাকার কোন পাত্র আপনা থেকে খাড়া রাখা যায় কিনা তা নিয়ে মাথা ঘামিয়ে মরুকৃগে ইউক্লিড আর আর্কিমেডিসের মত বড বড় পণ্ডিতেরা। সোহিনী অত শত ভাবে না। মাথার ওপর জলেব কলসীটা দিব্যি বসিয়ে নিয়ে সে বেরিয়ে পড়ে ঘর থেকে। কেল্লা ইঁদারার উঁচু উঁচু ধাপগুলো বেয়ে উঠে বসে থাকে এক ফোঁটা জলেব জন্য তীর্থেব কাকের মত। বসে থাকে সহৃদয কোন জাত-হিন্দুব আসার পথ চেয়ে। ওপাশ দিয়ে যাবার সময় দয়া ক'বেও যদি খানিকটা জল তুলে ঢেলে দেয তাদের কলসীতে।

একহাবা ছিমছাম গড়ন সোহিনীর। খুব রোগাও নয় আবার তেমন মোটাও নয়। ভাবী আঁট-সাঁট গোলাকার পাছাটা। কোমরটা সরু। পবনের পাযজামাটা ভাঁজে ভাঁজে নেতিয়ে পড়েছে কোমর থেকে। গায়ে বডিস নেই। মুঠি-ভরা পরিপুর্ণ গোলাকার স্তন জোড়াটি গায়ের ফিনফিনে মসলিনের জামাটি ফুটো ক'রে যেন বেরিয়ে পড়তে চাইছে। সোহিনীব চলাব ঠমকে ঠমকে যেন হেসে ওঠে বিজুলী! বখার চোখ দুটি পড়ে থাকে সেদিকে। সত্যি, বোনটি তার দেখতে কি সুন্দর! গর্বে ভরে ওঠে বুকখানা।...

ইঁদারার চারদিকে ঘেরা উঁচু পারে ঘেঁষার অধিকার ছিল না অচ্ছুৎদের। জল তুলবার জন্য ইঁদারার পাড়ে গেলেই সর্বনাশ! উচ্চ বর্ণের হিন্দুরা অমনি চিৎকার ক'রে উঠবে: আরে গেল—গেল—জলটা নষ্ট হয়ে গেল। এমন কি পাশের নদীটা থেকেও ওরা জল নিতে পারে না। তাতেও নাকি অপবিত্র হয়ে যায় নদীর জলটা। বুলাশরের মত অমন একটা পাহাড়ী শহরে এক একটা ইঁদারা খুঁড়তে খরচা পড়ে কমসে কম হাজার খানেক টাকা। আর নিজেদের জন্য ইঁদারা করবার অত টাকাই বা তাদের মত গরীবদের কোথায়? তাদের কোন ইঁদারাই ছিল না। বাধ্য হয়েই তাই অনেক সময় জাত-হিন্দুদের কুয়োর কাছে এসে ধর্ণা দিতে হত। তীর্থের কাকের মত হাঁ ক'রে বসে থাকতে হয় কেউ যদি এসে দয়া ক'রে তাদের কলসীতে একটু জল ঢেলে দেয়! প্রত্যেক দিন সকালে এভাবেই তাদের ভর্তি করতে হয় রান্না-বান্না আর স্নানের জল জালায় ক'রে। অবশ্য জালা কিনবার মত পয়সা তাদের সবারই আছে। আর যারা জালা কিনতে পারে না কিংবা যারা খোলা-মেলা জায়গায় স্নান করতে ভালোবাসে তারা তখন আসে নাইতে কুয়োর পারে। কুয়োর ধারের শান বাঁধান উঁচু বেদীটার ওপর ওরা এসে জটলা পাকাতে থাকে সকাল, দুপুর, আর রাত্রি! ওপাশ দিয়ে কাউকে যেতে দেখলে দু'হাত জোড় ক'রে এক ফোঁটা জলের জন্য অনুনয়-বিনয় করতে থাকে। ওদের আকুতি না শুনে পথিক যদি পাশ কেটে চলে যায় ওরা নিজেদের ভাগ্যকে ধিক্কার দিতে থাকে আর যদি কোন উদার পথচারী ওদের কাতর নিবেদনে সাড়া দেয়, ওরা তখন মুখর হয়ে ওঠে পথিকের মঙ্গলাকাঙ্খায়। দু'হাত তুলে ভগবানের কাছে মঙ্গল কামনা করে।

সোহিনী কুয়োর ধারে এসে দেখল, ওদের বস্তীর জনা দশেক লোক ইতিমধ্যেই এসে বসে আছে ধর্ণা দিয়ে। কিন্তু জল তুলে দেবার লোকের

কোন পাত্তাই নেই। সারাটা পথ ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে এসেছিল সোহিনী। মনে মনে তার এ আশংকাটাই ছিল। যা ভীড়, কে জানে, কতক্ষণ হয়ত তাকে ঠাঁই বসে থাকতে হবে। একটু দমে গেলেও সে আশাটা সব ছাড়ল না। হোলই বা একটু ভীড়, দশ জনেব পব তারই তো পালা আসবে। হাজাব হোক, সে ত' মেয়ের জাত। সে কি বুঝতে পারছে না, এক ফোঁটা জলের জন্য তার দাদাটি কি ছটফটটাই না করছে! তেষ্টায় নিশ্চয় ছাতিটা ফেটে যাচ্ছে। কাজ ক'রে ক'রে বেশ হাঁপিয়েও উঠেছে। মাতৃত্বের মমতায় ওর মনটা যেন গলে গেল। জলের জন্য ধর্ণা-দিয়ে-বসে-থাকা অনেকের সাথে এক সারিতে বসল সোহিনী। সহসা ছাঁক্ ক'রে উঠল যেন তার বুকটা। মাগো, একটু জল তুলে দেবার কেউ যে এলো না এখনও! চিরকালই চাপা, শান্ত-শিষ্ট স্বভাবেব মেয়ে সে। উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেও ধৈর্য হারাল না সোহিনী।

গুলাব সোহিনীকে আসতে দেখেছিল। ও হোল ধুপীদের বাড়ীর গিন্নী। দাদার বন্ধু বামচরণের মা। মাঝ-বয়সী, গায়ের রঙ বেশ ফরসাই। একদা যৌবনে পরমা সুন্দরী বলে খ্যাতি ছিল তার। ভাঁটাব মুখে আঁট-সাঁট তার দেহ-সৌষ্ঠবের দিকে তাকালে আজিও তার জের বেশ উপলব্ধি করা যায়। এখন মুখে অবশ্য দীর্ঘ খাঁজ পড়েছে। আর তা ঢাকবাব চেষ্টারও অন্ত নেই। সেজে-গুঁজে সব সময় সে বসে থেকে আপন সৌন্দর্যের ঢাক পিটিয়ে। শুধু তাই নয়। ধারী ছেনালি-পনাতেও সে বড় কম যায় না। আর দেমাকের চোটে মাটীতে পা পড়াও তার ভার। অবশ্য কারণও তাব আছে। নীচু জাতের লোকদের মধ্যে ধুপীরা হোল জাতে বড। কলকে তাদেরই সর্বাগ্রে। অবার শহরের নাম-করা অনেক হিন্দু ভদ্রলোক একদা যুবতী গুলাবের পায়ে মন-প্রাণ সর্বস্ব দিয়েছিলেন সঁপে। এখনও তিনি তাঁব যৌবনের লীলাসঙ্গিনীকে ভুলতে পারেন নি। ভুলতে পারেন নি তাঁর প্রৌঢ়া প্রেয়সীকে।

সোহিনীরা ছোট জাত, অচ্ছুৎদের মধ্যেও আবার জাতে ছোট। একেবারে নীচের ধাপের লোক। গুলাব তাদের তুচ্ছ অবজ্ঞার চোখে দেখবে আশ্চর্যের কি! কিন্তু ধাঙড়দের নিরীহ শান্ত শিষ্ট মেয়েটা দিন দিন যেন শশিকলার মত বেড়ে উঠছে রূপ-লাবণ্যে! ওর সুকুমার মুখখানি দেখলেই গুলাবের সর্বাঙ্গ যেন জ্বলে ওঠে রী-রী ক'রে। যেন ঘৃতাহুতি হয় আগুনে। ঈর্ষায় পুড়তে থাকে সে। ধাঙড়দের মেয়েটা বুঝি তার ভাবী প্রতিদ্বন্দ্বী! ঈর্ষায় বুক তার ভরে উঠতে থাকে। গুলাব অনেক সময় নিজেও ভেবে উঠতে পারে না কারণটা। তবু তার অবচেতন মনের আনাচে-কানাচে নিরীহ মেয়েটার প্রতি চটুল উপহাস আর লঘু বাক্য-বাণের কালো মেঘ পুঞ্জীভূত হতে থাকে স্তরে স্তরে।

'যা-যা, বাড়ী যা,' গুলাব বিদ্রূপে ফেটে পড়লো: 'আমরা সেই কখন থেকে এসে বসে আছি, আমরা এক ফোঁটা জল পাই না। আর উনি এসেছেন জল নিতে! যা, তোকে কেউ জল তুলে দেবে না।'

সোহিনী মুচকি একটু হাসল। হেসেই গড়িয়ে দিল বুঝি গুলাবের বিদ্রূপ-বাণ গায়ের উপর দিয়ে।

ভীড়ের মধ্যে থুবথুবে এক বুড়ো ছাড়া অপর কোন পুরুষ মানুষ ছিল না। তাই কাউকে দেখতে না পেয়ে সে তার মুখের ঘোমটা ঈষৎ টেনে দিল চোখ বরাবর। কলসীটাকে আগলে তারপর চুপচাপ সে বসে রইল।

'অমন আদিখ্যেপনা তোরা দেখেছিস না?' তাঁতীবৌ ওয়াজিরো বসেছিল গুলাবের পাশে। গুলাব তার গায়ে পড়ে চিৎকার ক'রে উঠল সবিস্ময়ে: '—ওমা, ধাঙড়দের ওই নচ্ছাড় মেয়েটা মাথায় কাপড় না দিয়েই শহর আর ক্যান্টনমেন্টময় ঘুরে বেড়ায়গো পঁই পঁই করে।'

ওয়াজিরো গুলাবের ধারাল জিভের কথা জানত। সোহিনীর বিরুদ্ধে তার কোন আক্রোশই ছিল না। তবু গুলাবের কথায় সাড়া দিল। আকাশ থেকে পড়ার ভাণ ক'রে যেন বলে উঠল:

'হ্যাঁ গা, তাই নাকি?' তারপর সোহিনীর দিকে চোখ ঠেরে বলল: 'তোর লজ্জা করে না একটু?'

ওয়াজিরোর ভাবখানা দেখে সোহিনীর বেজায় হাসি পেল। আত্ম-সংবরণ করতে না পেরে ফিক ক'রে সে হেসে ফেলল।

'দেখলি তো, দেখলি তো তোরা! পথের কুকুর! ছেনাল ছুঁড়ি! মাকে খেয়েছিস এখনো তো দু'দিন কাটেনি। আমি না তোর মা-র বয়েসী। আমার মুখের ওপর অমন দাঁত বার ক'রে হাসতে তোর লজ্জা করে না লা? পথের কুকুর! বেবুশ্যে কোথাকার!' ধুপী গিন্নী ফেটে পড়ল আগুন হয়ে।

সোহিনী গুলাবের খাপ-ছাড়া গালি গালাজের ধরণ দেখে খিল খিল ক'রে হেসে উঠল।

'আরে, পথের কুকুব! আমাকে কি তুই সঙ্ পেয়েছিস? অত হাসছিস কেনো রে ছুঁড়ি?' গুলাব আশ-পাশে একবার তাকাল। তারপর দলের সেই থুর থুরে বুড়োটা আর ছেলে-পিলেদের দিকে আড় চোখে একবার তাকিয়ে চিৎকার ক'রে উঠল: 'অতোগুলো বেটাছেলের সামনে দাঁত বার ক'রে হাসতে তোর লজ্জা করে না, বেবুশ্যে কোথাকার?'

ধুপী গিন্নী যে হাড়ে হাড়ে চটে গিয়েছে, সোহিনীর এবাব খেয়াল হোল। কিন্তু ধুপী গিন্নীর কি অপরাধটি সে করল ভেবে পেল না। ওই তো অকাবণ একটা খুঁত ধরে মুখে যা আসে তাই বলে ওকে গালাগাল করতে সুরু ক'রে দিলে। সে কি আর গায়ে পড়ে কোন্দল করতে গিয়েছিল? সোহিনী বিড় বিড় ক'রে উঠল আপন মনে।

'বেবুশ্যে, পথের কুকুর! য়্যাঁ, কথা ক'স না যে তুই! মুখে এখন রা নেই কেনো?'

'দেখো, খামকা আমায় গাল দিও না। আমি তোমায় কি বলেছি?' সোহিনী এবার মুখ খুলল।

'না, বলে নি! তবে চুপ ক'রে আছিস কেনো লা, বেজন্মা কোথাকার!' গুলাব খেঁকিয়ে উঠল: '—ধাঙড়দের ঘরে জন্মেছিস, সারাদিন গু-মুত নিয়ে পিণ্ডি চট্‌কাস, তবু তোর আক্কেল হয় না? তোর মার বয়েসী আমাকে অপমান করার মজাটা আজ টের পাইয়ে দিচ্ছি।'

গুলাব হাত তুলে সোহিনীর দিকে তেড়ে গেল মারতে।

ওয়াজিরো ছুটে এসে গুলাবকে ধবে ফেলল।

'আঃ, করো কি, করো কি! না, মেরো না ওকে।' ওয়াজিরো গুলাবকে তার স্বস্থানে বসিয়ে দিল আবার।

সহসা ভিড়ের মধ্যে একটা হৈ হৈ বৈ রৈ পড়ে গেল। তীর্থের-কাক ক্ষুদ্র দলটা মুখর হয়ে উঠল এবার হাঁক-ডাক সরব চিৎকারে। পরস্পর ওরা মুখ চাওয়া চাউয়ি করতে লাগল। ঘৃণা ক্রোধ আব বিরক্তিব ঝাঁজ ফুটে উঠল ওদেব মুখে। সোহিনী গোড়াব দিকটায় একটু ভয় পেয়ে গিয়েছিল। মুখখানা শুকিয়ে ওর শাদা ফ্যাকাশে হয়ে গেল। তবু চুপ ক'রে সে বসে রইল। সব ঝড ঝাপ্টাকে গড়িয়ে দিতে চেষ্টা করল নিস্পৃহ নির্লিপ্ত উদাসীনতার মুখোস এঁটে। মুখ ফিবিয়ে এক সময় সে তাকাল আকাশের দিকে। মুখের হাসিটুকু তার মিলিয়ে গেল। সহসা কেমন এক নিবানন্দ ঘোব-ঘোর ভাবে ছেয়ে গেল তার মনটা। টনটন ক'বে উঠলো ব্যাথায়। ছোট একটা দীর্ঘশ্বাস বুক থেকে বুঝি ঝরে পড়ল এক সময়। অনুতাপে বুকটা তার ভরে উঠল কানায় কানায়। মাথার উপরে সূর্যদেব সমানে বর্ষণ ক'বে চলেছে কড়া রৌদ্রের বাণ। যতই বয়ে চলেছে বেলা, গুলাবের গায়ে-পড়া ঝগড়া-ঝাঁটির রেশটুকু মন থেকে তার নিঃশেষে মুছে যেতে লাগল। তাব জায়গায় দাদাব ঘর্মাক্ত সকরুণ মুখখানি উঠল ভেসে। সাবাটা সকাল হাড়-ভাঙ্গা খাটুনির পব একটু চা খেতে বাড়ি ফিরেছিল বুঝি বেচারী! তেষ্টায় বুকের ছাতিটা নিশ্চয় ফেটে যাচ্ছে। তবু যদি আশ-পাশে কোন জাত-হিন্দুর টিকিটির সন্ধান পাওয়া যেত।...

চারদিক চুপ চাপ। ধীর নিঃশব্দ পদক্ষেপে বয়ে চলেছে মহাকাল। গুলাবের নাকের ফোঁস-ফোসানিই কেবল নিথর নিস্তব্ধতাকে ভেঙে দিচ্ছে খান খান ক'রে।

'আজ আমার ছোট মেয়েটার সাদি। অমন শুভ দিনটাকে কিনা খাণ্ডড়দের অলক্ষুনে মেয়েটা- দিলে পণ্ড ক'রে!' গুলাব একটানা আফ-শোষ ক'রে চলল। দলের কেউ কিন্তু কান দিল না ওর কথায়। এমন সময় দূরে জাত-হিন্দু এক সেপাইকে দেখা গেল আসতে। দেরী করেই ও বুঝি যাচ্ছিল পায়খানায়।

সেপাইটা নৃশংস না পামর? কি জানি, হয়ত পায়খানার দারুণ পীড়া পেয়ে বসেছে ওর। কুয়োর পাড়ের সমবেত অতগুলো লোকের কাতর আবেদন-নিবেদনে কর্ণপাত না ক'রে হন্ হন ক'রে সে চলে গেল।

সে দিন অচ্ছুৎদের বরাৎটা ভালই বলতে হবে। সেপাইটার পিছু পিছু আব একজন জাত-হিন্দুকে ওদিক পানে আসতে দেখা গেল। ইনি আবার কেউ-কেটা যে-সে লোক নন। স্বয়ং পণ্ডিত কালীনাথ। শহরের মন্দিরের ভারপ্রাপ্ত সেবায়েৎ। পণ্ডিত কালীনাথকে দেখতে পেয়ে অচ্ছুৎরা বিপুল উৎসাহে ফেটে পড়ল।

পণ্ডিত ঠাকুর থমকে দাঁড়ালেন। খাঁজ-কাটা হাড়-বহুল ফোকলা গাল। ভুরু কুঁচকে তিনি তাকালেন অচ্ছুৎদের দিকে চোখ তুলে। অস্থি-চর্মসার শরীর। তবু ওঁর শুকনো হাড়কটা বুঝি ওদের কাতর আহ্বানে সাড়া না দিয়ে থাকতে পাবল না। একে খিটখিটে বদ্ মেজাজী বুড়ো, তার ওপর একটানা কোষ্ঠকাঠিন্য রোগে ভুগে ভুগে মেজাজটা তাঁর ভয়ানক তিরিক্ষি হয়ে গিয়েছিল। একটু জল তুলে দেবার জন্য অচ্ছুত্‌দের সকরুণ কাকুতিতে তিনি হয়ত বড় একটা কাণই দিতেন না যদি না তাঁর মনে হতো ইঁদারা থেকে জল তুললে ভালই হবে তাঁর পক্ষে।

কুয়োর উঁচু শান বাঁধান মঞ্চের দিকে ধীরে ধীরে তিনি পা বাড়ালেন। ওঁর মন্থর সতর্ক পদক্ষেপ আর কুঞ্চিত মুখমণ্ডলের দিকে তাকালে কারো

বুঝতে এতটুকু দেরী হবে না যে পেটের মধ্যে তাঁর কি ভয়ানক তোল-পাড়টাই না হচ্ছে। আপন মনে তিনি ভেবে চললেন: গতকালের নিমন্ত্রণটাই হয়েছে কাল আমার। খেয়েই পেটটা কেমন টিম টিমে ঢোল হয়ে উঠলো। খাবারের দোকানে দুধ আব যে জিলিপীগুলো খেলাম তাতেই বা এ-দশা হোল কিনা কে জানে। না! লালা বানারসী দাসেব বাড়ীর ব্রাহ্মণ ভোজটাই ঠিক সব নষ্টের গোড়া। নেমন্তন্নটা খাবার পর থেকেই যত অনাসৃষ্টির শুরু। ধর্মভীরু বড লোকেদের বাড়ীতে চব্য-চোষ্য-লেহ্য-পেয় ভুড়ীভোজনেব স্মৃতিগুলি বোমন্থন করতে লাগলেন সেব্যায়েৎ ঠাকুর।

আহা পায়সান্নটা কি চমৎকারই না হয়েছিল। মুখে যেন লেগে আছে স্বাদটা আর 'কাবা-প্রের্সাদ্'—সেই সে সুজির পিঠে—ঘিয়েব গন্ধ মৌ মৌ কবছে··গবম গরম মুখে দিলে অমনি মিলিয়ে যায় সঙ্গে সঙ্গে। পেটে ফেলে তা যতই খাওনা কেন বসে হুঁকোটায় নিশ্চিন্তে দুটো টান দিতে পাবলে সব বেমালুম হজম হয়ে যাবে নির্ঘাত। কিন্তু আজ সকালে হোল কি? ঝাড়া ঘন্টা খানেক ধবেই না আমি হুঁকো টেনে গেলাম? আশ্চর্য, এখনো কোন বেগই নেই পায়খানাব। পণ্ডিত কালীনাথ এসব ভাবতে ভাবতে হাতের পিতলের লোটাটা কূয়োর পাড়ের কাঠের ছোট্ট টোকরের মধ্যে রেখে দিলেন।

তীর্থের কাক অচ্ছুৎরা এদিকে ভাবল জল তুলে দেবাব নাম শুনেই বামুন পণ্ডিতটা বুঝি চটে গেছে। মুখে তাই অমন বিরক্তিব ছাপ। ওবা কিন্তু ঘুণাক্ষবেও একবাব জানতে পারল না যে কোষ্ঠকাঠিণ্য আর হাডগোড়-বার-করা ওঁব কৃশ দেহে উৎসাহরসেব একান্ত অভাবই সব অনিষ্টেব গোড়া। ওদের অবশ্য তা বুঝে উঠতে বেগ পেতে হোল না। কেননা একটু ইতঃস্তত কবেই পণ্ডিত কালীনাথ লোহাব বালটিটা তুলে নিলেন হাত বাড়িয়ে। তাবপর সেটা কপিকলের সঙ্গে একগাছা শণের দড়ি দিয়ে পেঁচিয়ে কূয়োব মধ্যে নামিয়ে দিলেন ধীরে ধীরে। ভারী বালটি, হাত থেকে ফস্‌কে গিয়ে দড়ীসমেত ঘুরতে

ঘুরতে সশব্দে পড়ে গেল জলের উপর। কপিকলের আকস্মিক হেঁচ্‌কা টানে পণ্ডিত কালীনাথ প্রথমটায় একটু কেমন যেন ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গিয়েছিলেন। কিছুটা টাল সাম্‌লে উঠে পুর্ণোদ্যমে তিনি জল তোলাব কাজে মন দিলেন। জলভরা ভারী বাল্‌তিটা টেনে তুলতে হলে খানিকটা বুঝি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কসরৎ দরকার। কিন্তু বামুন পণ্ডিত সারাজীবনভব ক'রে এসেছেন একটানা পুজা-আর্চা, মন্ত্রপাঠ তুক্‌তাক্‌ কিংবা খাগড়াব কলমটা দিয়ে ঠিকুজি পত্র লেখায়। তাই একটুকুতেই তিনি আবার হাঁপিয়ে উঠলেন। তবু সর্বশক্তি দিয়ে কপিকলের হাতল ঘুরাতে লাগলেন। মুখখানা তাঁব কুঁচ্‌কে উঠল। আনন্দেব খাঁজও বুঝি পড়ল! অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সঞ্চালিত ক'রে কুয়ো থেকে জল তোলার ফলে অনেকটা যেন কমে গেল তাঁব পেটের ফাঁপা ভাবটা। বহুদিন এমন সৌভাগ্য তাঁব হয়ে ওঠেনি। এদিকে জল-প্রত্যাশী অচ্ছুৎবা নিজেদের কলসী নিয়ে ব্যস্ত হয়ে উঠল। তাদের মধ্যে রীতিমতো কাড়াকাড়ি হুড়োহুড়ি পড়ে গেল কে আগে কলসী রাখবে—আগে কে এগিয়ে যাবে সহৃদয় মহান্‌ ব্যক্তিটিব কাছে।...

শান বাঁধানো কুয়োর পাড়ে পণ্ডিত কালীনাথ বালটিটা অবশেষে টেনেই তুললেন। কিন্তু পেটের মধ্যে তাঁর মহা আলোড়ন যেন শুরু হয়ে গেছে। তিনি কেমন যেন একটু বিমনা হয়ে পড়লেন। সহসা কেমন এক উষ্ণ তবঙ্গ স্রোত তাঁব কুক্ষিদেশ থেকে তলপেটেব অধঃস্থল পর্যন্ত ধীবে ধীরে যেন খেলে গেল। নাভিব উপরটায় কেমন যেন মুচড়ে উঠল। বহুদিনই বুঝি হয়নি এমনটা। সহসা তাঁব কোমরেব ডান্‌পাশটায় ধারাল একটা বর্শা ফলক কে যেন সজোবে দিল বিঁধিয়ে। এর পর যা হয়, প্রকৃতিব অমোঘ আহ্বানে নিজেকে খোলসা কববাব জন্য তিনি মহা ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠলেন।...

'আমি পেথম, পণ্ডিতজী, আমিই পেথম!' ধুপী-গিন্নি গুলাব সহসা চিৎকার ক'রে উঠল ধৈর্যের সীমা ছাড়িয়ে। পণ্ডিত কালীনাথ আপনাকে

নিয়েই বিব্রত ছিলেন। গুলাবের চিৎকারে বিরক্তই হোলেন। কটমট ক'রে তাকালেন ওব দিকে। ধার কবা তার কাতর চাহনি মনে তাঁর কোন দাগই কাটলে না বুঝি।

'না-না আমিই এসেছি পয়লা'—ভিড়েব মধ্য থেকে চেঁচিয়ে উঠল ছোট্ট একটা ছেলে।

'ওর আগেই যে আমি এসেছি হেথায়।' অপব এক জন চিৎকার করে উঠল।

বাঁধ ভাঙা জলেব মত সবাই সহসা ছুটল ইঁদাবার দিকে। অন্য দিন হলে ঠাকুরমশাই বেগেমেগে গায়ের উপব জল ঢেলে একটা কাণ্ড ক'রে বসতেন। কিন্তু অচ্ছুৎদেব কাতব কাকুতিতে যেমন তিনি সাড়া দিয়ে থাকেন, তেমনি চাঁদ-পনা মুখেব অমোঘ আর্কষণে পণ্ডিত কালীনাথ ধরা দেন না বললে ভুল বলা হবে। দলেব সবাই কয়ো ঘিবে ভিড কবে দাঁড়িয়েছিল। সোহিনী কিন্তু ভিড বাঁচিযে কিছু তফাতে গিয়ে বসেছিল চুপচাপ। পণ্ডিত কালীনাথের চোখ এক সময় গিয়ে পড়ল তার উপব। তিনি দেখেই ওকে চিনে ফেললেন! ধাঙডদেব স্থন্দবী এই মেয়েটাকে তিনি অনেকবাব দেখেছেন শহরেব অলি-গলিতে টাট্টিখানা পরিষ্কাব করতে। ডবকা ছুঁড়ী, আঁট-সাট গড়ন। পীনোন্নত পরিপূর্ণ মুঠিভরা স্তনেব কালো বোঁটা দুটি গায়েব মসলিন বডিসেব পাতলা বাঁধ ভেঙে যেন বেরিয়ে পড়ছে ফেটে। পণ্ডিত কালীনাথেব শরীবটা আজন্ম ভুগে ভুগে রোগে ঝাঁজবা হয়ে গিয়েছিল। মনটা গিয়েছিল চুপসে। ভক্ত আব শিষ্যবৃন্দের উপর একটানা খবরদাবি ক'রে ক'বে হয়ে পড়েছিলেন তিনি একান্ত নির্লজ্জ। সোহিনীর সবল নিষ্পাপ চোখ দুটি বুকে তাঁব প্রচণ্ড ঝড় তুলল। দুহাতে যেন নাড়া দিয়ে গেল অন্তরেব তাঁর স্থকোমল শিরাগুলোকে। সোহিনীব প্রতি অসীম করুণায় তিনি গলে পড়লেন।

'ওঃ, তুই লখার বেটী বুঝি? আয়-আয় এদিকে আয়।' পণ্ডিত কালীনাথ মুখর হয়ে উঠলেন সহসা। বললেন: 'তুই তো বেশ চুপ চাপ ছিলি এতক্ষণ, শাস্ত্রে কি বলে জানিস? ধৈর্য ধরে থাকতে পারে যে সেরা পুরস্কার লাভ করে সে।...আরে ভাগ, ভাগ, পথের কুকুর সব! কি গোলমালটাই না সুরু ক'রে দিয়েছে রে! দূর হ'—দূর হ' এখান থেকে!'

'কিন্তু পণ্ডিতজী,—' সোহিনী থতিয়ে উঠল। বামুন ঠাকুরের সপ্রশংস দরাজ দাক্ষিণ্যের উপেক্ষায় নয়, ওর আগে যারা এসেছিল তাদের ভয়েই!

'আরে, আয় না!' পণ্ডিত কালীনাথের পায়খানার বেগ পেয়ে বসল বুঝি। পেটের মধ্যে মোচর দিয়ে উঠতেই বলে উঠলেন। সুন্দরী এক মেয়ের একটা কাজ ক'রে দিচ্ছে ভাবতেই তাঁর মনটা হয়ে উঠল চাঙা।

সোহিনী ঘাড় গুঁজে এগিয়ে এল। কলসীটা শান বাঁধান মঞ্চের নীচে রাখলে। ঠাকুর মশাই দু'হাতে জলের বালতিটা তুলে ধরলেন। দম বুঝি প্রায় আটকে আসছিল। কিন্তু সোহিনী পাশে দাঁড়িয়ে আছে কথাটা ভাবতেই কোথা থেকে তাঁর দেহে এল উৎসাহের নতুন জোয়ার। কিন্তু সে শুধু ক্ষণিকের। পরমুহূর্তেই ঘুণেধরা দুর্বলতাই পেয়ে বসল তাঁকে। হেচকা এক টানে জলের পাত্রটা ঢালতেই খানিকটা জল ছিটকে পড়ল ছলাৎ ক'রে। অচ্ছুৎরা চারদিক থেকে ছুটে আসছিল, অনেকে ভিজে একেবারে চুপসে গেল।

'ভাগ—ভাগ সব!' সোহিনীর কলসীতে জল ঢালতে ঢালতে পণ্ডিত কালীনাথ খেঁকিয়ে উঠলেন। গাল-মন্দের বেড়া-জালে নিজের পঙ্গুতাকে চেষ্টা করলেন বুঝি ঢাকবার। সোহিনীর কলসীটা কানায় কানায় প্রায় ভরে এল।

'হ্যাঁরে এবার হোল?' জলের খালি বালটিটা হাতে ক'রে পণ্ডিত কালীনাথ শুধালেন সোহিনীকে। তাঁর থোবড়ান গালে হাসির রেখা উঠল ফুটে।

সোহিনী কলসীটা মাথায় তুলবার জন্ত বাইরের দিকটা মুছে নিচ্ছিল ঘাড় নেড়ে চাপা গলায় জবাব দিল :

'হ্যাঁ, পণ্ডিতজী।'

'মন্দিরে আমাদের বাড়ির উঠানটা তুই ঝাড়ু দিয়ে যাস না কেনোরে?' সোহিনী চলে যাচ্ছিল। পণ্ডিত ওকে ডেকে শুধালেন। 'তোর বাপকে বলিস আজ থেকে যেন তোকে পাঠিয়ে দেয়।'

সুঠাম সুগোল লোভনীয় পাছা। সোহিনীর দিকে তিনি কামাতুর চোখ তুলে তাকালেন। চোখ দুটি তাঁর ওর পিছনে পড়েই রইল। সরিয়ে নিতে পারলেন না কিছুতেই। কেমন যেন অপ্রতিভ হয়ে গেলেন। রক্তে রক্তে শুরু হয়ে গেল যেন কামনার উত্তুঙ্গ তাণ্ডব নৃত্য। শিরায় শিরায় বয়ে চলল বুঝি উদগ্র লালসার গলিত লাভা স্রোত। সমাজ সংসার মিছে সব! পণ্ডিত কালীনাথের গণ্য-মান্য পদকৌলিন্য, শালিনতার চড়া বাঁধ ভেঙে পড়ল যেন খান খান হয়ে!

'আসিস রে, আজই আসিস্।' পাছে সোহিনীর মনে কোন সন্দেহ দেখা দেয় তাই আশংকা ক'রে তিনি জানিয়ে দিলেন হাঁক ছেড়ে।

সোহিনী তাঁর বিশেষ অনুগ্রহের কথা ভুলতে পারে নি। মাথাটা তার নুয়ে এল। সলজ্জ মাথা নেড়ে সে বাড়ির পথ ধরল। বাঁ হাত-খানা তার কোমরে আর ডান হাত দিয়ে ধরা মাথার কলসীটা। আর চলতি পায়ের চটুল ভঙ্গিতে ছন্দিত হয়ে উঠছে বুঝি সঙ্গীতের রিমঝিম্।

ধুপী গিন্নী কটমট ক'রে একবার তাকাল ওর দিকে। চোখদুটিতে খেলে গেল যেন আগুনের হল্কা। দলের সঙ্গে নিজেও সে কখন কুয়োর ধারে এসে পড়েছিল একসময়। অপর আর এক জন জাত-হিন্দুকে দেখতে পেয়ে কুয়োর পাড়ে ওরা সবাই তখন একটু জল তুলে দেবার জন্ত ওকে কাকুতি করতে লাগল।

নতুন আগন্তুকের নাম লছমন। হিন্দু ভেস্তিওয়ালা। জাতিতে বামুন হয়েও জাত হিন্দুদের বাড়ি বাড়ি ওকে রান্না করা, জল-তোলা, বাসন ধোয়া, ঘরের এটা-ওটা আরও পাঁচ কর্ম, ছোট কাজ সব করতে হয়। বছর ছাব্বিশেক বয়স। যোয়ান মদ্দ পুরুষ। বুদ্ধিমানও। তবে সর্বদা মাজা-ঘষার নোংরা কাজ ক'রে ক'রে হাত-পাগুলো কেমন যেন রুক্ষ হয়ে গেছে। কাঁধে ওর একখানা বাঁশের বাঁক।

কুয়োর পাড়ে এসে লছমন কাঁধের বাঁকটা মাটীতে নামিয়ে রাখল। তারপর দু'হাত জোড় ক'রে প্রণাম করল পণ্ডিতজীকে: 'জয়দেব!' লছমন তার হাত থেকে বালটিটা একরূপ কেড়ে নিল। বলল, 'দিন আমায় দিন, আমিই আপনাকে জল তুলে দিচ্ছি।'

ভারী বালটিটা সে কুয়োর মধ্যে অবলীলাক্রমে ছুঁড়ে দিলে। তারপর সেটা টেনে তুলতে তুলতে অপস্রিয়মান সোহিনীর দিকে একবার তাকাল আড়চোখে। সোহিনীর দিকে তার যে ইতিপূর্বে চোখ পড়েনি এমন নয়। ওকে দেখলেই সর্বাঙ্গ তার জ্বলে যায় কামনার দাউ দাউ অগ্নিশিখায়। তড়িৎ প্রবাহের মত খেলে যায় অপূর্ব এক শিহরণ। ভীরু দ্বিধা সংকোচ বক্ষে সুদূর কোন প্রেয়সীর প্রতি যেন ধেয়ে যেতে ইচ্ছে করে দু'হাত বাড়িয়ে। পরক্ষণেই সে আবার গুমরে উঠে আপনার পঙ্গুতার কথা স্মরণ ক'রে।

সোহিনী জল নিতে এলে ওর সঙ্গে দেখা হলেই লছমন মাঝে মাঝে ওকে ঠাট্টা-মস্‌করা না ক'রে ছাড়ত না। ওকে অকারণ ক্ষেপিয়ে তুলত। সোহিনীও কোনদিন হয়ত সলজ্জ একটু হাসত ওর দিকে চেয়ে। চটুল একটা চাহনি হয়ত ছুঁড়ে মারত ওকে কোনদিন। আর তাতেই লছমন আর পাঁচটি ভারতীয় প্রেমিকের মত বলে বেড়াত সবাইর কাছে: সোহিনী নাকি তাকে জানে-প্রাণে খতম ক'রে দিয়ে গেছে একেবারে।

সোহিনীর দিকে আড়-চোখে তাকাতে গিয়ে সে পণ্ডিতের কাছে ধরা পড়ে গেল। মহা অপরাধীর মত সে অমনি নিজের সলজ্জ চোখদুটি

মারিয়ে নিল। ঘাড়গুঁজে মন দিল হাতের কাজে। হেঁচকা এক টানে জল-ভরতি ভাবী বালটিটা সে তুলল কূয়োর পাঁড়ে। প্রথমেই সে পণ্ডিত ঠাকুরের ছোট্ট পিতলের লোটাটায় দিল জল ঢেলে তারপর দিল গোলাবের কলসীটায়। অবশেষে কিছু কিছু দিল বাকি সকলের পাত্রে।

সোহিনীর মুখচ্ছবিটা এক সময় কখন হারিয়ে গেল তার মনের মুকুরে।…

রান্নাঘরটার দোরগোড়ায় সোহিনী এসে দাঁড়াল। ওর বাপ তখন ছেঁড়া বিবর্ণ লেপটা মুড়ি-সুড়ি দিয়ে বিছানার উপর বসে ফুরৎ ফুরৎ ক'রে গড়গড়ায় তামাক টানছিল আর মেয়ের উদ্দেশে অকথ্য গালি পাড়ছিল।

'শুয়ার কা বাচ্চি, মরিস নি তাহোলে? আমি ভাবলাম বুঝি মরে গেছিস্!' লখা মেয়েকে দেখতে পেয়ে খেঁকিয়ে উঠল: '—একটু চা নেই, এক টুকরো রোটি নেই, খিদের ইদিকে আমার জান বেরিয়ে গেল! চায়ের জল চাপিয়ে দে…আর শুয়োরের সে বাচ্চা দুটো গেল কোথায়? রখা আর রখা…ডেকে দে!'

লখা পঙ্গু অথর্ব এমন এক বদ তিরিক্ষী মেজাজী লোকের মত কট-মট ক'রে তাকাল যেন তার শরীরে দয়া মায়ার লেশ থাকলেও নিজের ছেলে-পিলেদের সে হামেসা গাল-মন্দ করতে একটুও কসুর করে না। কেন না, কি জানি, পাছে ওকে বৃদ্ধ অথর্ব ভেবে নিজের ছেলেরাও যদি ওকে অনাদর উপেক্ষা করতে থাকে—কর্তৃত্ব যদি ওর দেয় বাতিল ক'রে…

সোহিনী বাপের কথায় তৎক্ষণাৎ সাড়া দিল। হাড়িটা উনানে চাপিয়ে দিয়ে সে ভাইদের উদ্দেশে হাঁক ছাড়ল:

'ভাই রখিয়া—ও রে রখিয়া! বাপ তুদের ডাকছে রে!'

রথা সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠেই কখন কেটে পড়েছিল খেলতে। বোনের ডাক শুনে কথাই খালি ঘরের মধ্যে এসে ঢুকল।

মুখ আর ঘাড় বেয়ে টস্ টস্ ক'রে ঘাম ঝরছিল তার। নিশ্বাসও পড়ছিল জোরে জোরে। কেন না, বেচারাকে নতুন আর এক দফা পরিষ্কার করে আসতে হয়েছে সরকারী টাট্টিগুলো। কালো চোখদু'টো দিয়ে যেন আগুনের হল্কা ছুটছে তার। চ্যাপ্টা প্রকাণ্ড মুখখানা ক্লান্তি ও অবসাদে শুকিয়ে এতটুকু হয়ে গেছে। গলাটাও গেছে কাঠ হয়ে।

'আমার পাঁজরটা ভয়ানক কনকন করছে বুঝলি?' ছেলেকে দোর-গোড়ায় দেখতে পেয়ে বুড়ো গোঁঙিয়ে উঠল। '—তুই যা, নাট মন্দিরটা আর সদর রাস্তাটা ঝাড়ু দিয়ে আয়গে, আর রথাটাকে যেখানেই পাস ডেকে দে। শুয়োরটা এসে এখানকার টাট্টিগুলো যেন সাফ ক'রে দেয়।

'বাপজান্, মন্দিরের পণ্ডিত ঠাকুর আজ বল্লে কি জান বাবা? বললে: ওঁদের বাড়ীর উঠানটা আমি যেন ঝাড়ু দিই।' সোহিনী সহসা বলে উঠল।

'যা বাপু যা, যা খুশি তা কর্‌গে, আমার মুণ্ডুটা আর খাস্‌নি! লখা খেঁকিয়ে উঠল।

'তোমার পাঁজরটা আজকে ভয়ানক ব্যাথা করছে বুঝি?' বাপের বদ্‌মেজাজের সুযোগ নিয়ে বখা টিপ্পনী কাটলে,—'পাঁজরটায় একটু তেল মালিশ ক'রে দেব নাকি?'

'না, না',—বুড়ো মারমুখো হ'য়ে চীৎকার ক'রে উঠল। ছেলের টিপ্পনীতে বুঝি একটু লজ্জাও পেল। আসলে ওর পাঁজর কিংবা দেহের কোথাও কন্‌কন্ করছিল না। বুড়ো বয়সে কাজের হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য ছোট ছেলের মত মিথ্যা একটা খুঁত খুঁজে অসুখের ভাণ করছিল মাত্র সে।

'না,—না, তুই যা', সে আবার খেঁকিয়ে উঠল : 'তুই যা, নিজের কাজ করগে। আমি ভাল হ'য়ে উঠব—' মুখ ফিরিয়ে সে একটু চাপা হাসলে।

চা হ'য়ে গেল। সোহিনী মাটির দু'টো ভাঁড়ে চা ঢালল। বখা এসে একটি ভাঁড় তুলে দিল বাপের হাতে আর অপরটি তুলে নিয়ে তাতে অমনি একটা চুমুক দিল বসিয়ে—অপূর্ব এক পুলক সর্বাঙ্গে তার খেলে গেল। গরম টাট্‌কা চায়েব সুমিষ্ট স্বাদ্ সহসা তা'কে চাঙা ক'রে তুলল। গরম চা, জিভটা ছেঁকা লেগে বুঝি গেল পুড়েই। বাপের মত গাল ফুলিয়ে চায়ে একটু ফুঁ দিলেই পারত সে। কিন্তু সে অমনটা করতে পারে না কিছুতেই। ব্রিটিশ সৈন্যদের ব্যারাকে টমিগুলোর কাছ থেকে সে এসব জিনিস কখনও শেখেনি। তাকে খুড়ো কতদিন না বলেছে, গোরাগুলো চায়ের সুমিষ্ট ঘ্রাণটা যদি কোনদিন উপভোগ করতে জানত। ওরা কি আর জানে ফুঁ দিয়ে চা ঠাণ্ডা করতে? খানিকটা থুতু ছিটিয়ে চা জুড়ানোর গেঁয়ো রীতি···খুড়ো বা তার বাপের যা স্বভাব···কোনদিন সে বরদাস্ত করতে পারে না। সাহেবগুলো যে অমন করে না সে অবশ্য তার বাপকে অনেকদিন বলতে গিয়েছিল। কিন্তু খুড়োকে সে করে মান্য-গণ্য। সে নিজে ইংরেজ টমিগুলোর চালচলন হাব-ভাব সব মেনে নিতে পারে, অনুকরণও করতে পারে। তাই বলে গুরুজনদের ওসব করবার জন্য জোর জবরদস্তি করে সে কোন আক্কেলে? নিজের চা'টা ঢক্‌ঢক্ ক'রে গিলে নিয়ে আর একখানা রুটি খেয়ে বখা বেরিয়ে গেল। প্রকাণ্ড ঝাড়ুগাছটা আর বাপের রাস্তার ময়লা ফেলবার চাঙারীটা কুড়িয়ে নিয়ে সে পা বাড়াল শহরের দিকে।···

অচ্ছুৎদের সড়কের দিকে যে গলিটা গেছে বখা তা ফেলে এল পিছনে। দেখতে না দেখতেই আজ গলিটা কখন গেল ফুরিয়ে। গলিটার শেষপ্রান্ত থেকে শুরু অচ্ছুৎদের বস্তির পিছন দিককার

ফাঁকা মাঠটা। চারিদিকে মাঠ-ভরা রোদ্। সূর্যদেব যেন মেতে গেছেন বহ্নি-উৎসবে! বুকভরে সে টাটকা বিশুদ্ধ বাতাসে দম্ নিলে। বিশ্রী ধোঁয়াটে পুতিগন্ধময় তাদের ঘিঞ্জী বস্তির কথা তার মনে পড়ে। আর এখানকার খোলা মাঠ—চারিদিকে ঝলমল্ করছে সোনালি রোদ। অতলান্তিক কি তফাৎই না এই দুই পৃথিবীর! রোদ পোহাতে তা'র ভয়ানক ইচ্ছে হয়। ইচ্ছে হয় শুকনো খড়িওঠা তা'র হাজা আঙুলগুলো রোদে মেলে ধরতে—নীল শিরা-উপশিরায় উষ্ণ রক্তের বান ডাকাতে। সত্যিই সে রোদের দিকে তার হাত দুটো তুলে ধরল। মুখ তুলে তাকাল সূর্যের দিকে। চোখের পাতা দুটো বুজে এল আধাআধি। চন্‌চন্ ক'রে তার অসাড় দেহের রন্ধ্রে রন্ধ্রে যেন খেলে গেল উষ্ণ প্রস্রবণের ফোয়ারা! সর্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল···সে ভারি আরাম বোধ করল চারদিকের এই বিপুল স্বাস্থ্যকর পরিবেশে। নিজেকে সে অনেকটা সুস্থ সবল বোধ করল। আরও যাতে রোদ এসে লাগতে পারে তাই দুহাতে সে মুখখানা একবার মুছে নিল। তারপর ঝুড়ি আর ঝাড়ুগাছটা বগলদাবা ক'রে দুহাতের তালু দুটো মুখখানার উপর নিল বুলিয়ে। দুএকবার রগড়াতেই চিবুকদুটো কড়া হয়ে উঠল রক্তে।

ছেলেবেলাকার কথা তার মনে পড়ে। শীতের রবিবারগুলোতে সে একরূপ সম্পূর্ণ উলঙ্গ হ'য়ে রৌদ্রে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সরষের তেল মাখত সর্বাঙ্গে। ছেলেবেলাকার কথাটি মনে পড়তেই সে মুখ তুলে তাকাল সূর্যের দিকে। কড়া ঝাঁঝালো রোদ, চোখদু'টো ধাঁধিয়ে গেল। চারদিকে সে অন্ধকার দেখল ক্ষণিকের জন্য। যেন হারিয়ে ফেলল নিজেকে, খালি সূর্য! আশে পাশে তা'র চারদিকে মনে হো'ল যেন অসংখ্য সূর্য কিল-বিল ক'রে ঘুরে বেড়াচ্ছে! সে উপভোগ করল এক অনাস্বাদিত পুলক।···

অপূর্ব জ্যোতির্ময় আলোকোজ্জ্বল পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়ে সে সামনে

পা বাড়াতেই সহসা হুমড়ি খেয়ে পড়ল এক চাক্‌লা পাথরের উপর। হোঁচট খেয়ে। বিড়্ বিড়্ ক'রে কি যেন গালি পাড়্‌ল পাথরটার উদ্দেশে। চারদিকে তাকাল চোখ তুলে। দেখে নিল, তাকে কেউ দেখে ফেলল কি না। হ্যাঁ, ওই যে রামচরণ, ছোটা আর রথা! ওরা তাকে ঠিক দেখে ফেলেছে। রামচরণ হোল ধুপিদের ছেলে; ছোটা মুচিদের, আর রথা তো তার আপন ভাই-ই। ওদের সামনে আপন মনে বিড়্-বিড়্ ক'রে ওঠায় তার ভয়ানক লজ্জা হল। ওরা যে তাকে সব সময় জ্বালিয়ে খায়। তার মোটাসোটা দেহের, ফিটফাট তার বেশভূষার, অনেকটা হাতীর মত পা ফেলে থপ্ থপ্ ক'রে চলাফেরা করার জন্য ওরা তো তাকে হামেসা ঠাট্টা মস্কারি করেই থাকে। অকারণ তাকে দুহাতে মুখ রগড়াতে কিংবা আপন মনে কথা বলতে দেখে ওরা কি এখন টিপ্পনী না কেটে ছাড়বে? বিশেষ ক'রে সে যে একটা কায়দা-দুরস্ত হাল ফ্যাসানে আদ্‌মি, একথা কে না জানে? এ দুর্বলতার জন্য তাকে কত-দিন ঠাট্টা উপহাস হজম করতে হয়েছে ওদের। রথাও অবশ্য একহাত নিতে ছেড়েছে অমন নয়। প্রতিশোধ সেও নিয়েছে। ভুরুপোড়া ধুপীদের ছেলেটাকে দেখিয়ে সে ভেঙিয়ে ওঠে। বলে:

'সবসময় সাবান ঘষে ঘষে গায়ের চামড়াটা শাদা করতে চাস্ কিনা, তাই তো তোর অমন দশাটি।' শুধু তাই নয়, রামচরণকে ক্ষেপানোর জন্য খুঁৎ-খুঁতো বড় একটা খুঁজতে হয় না। সে যে গুলাবের ছেলে আর তার যে সুন্দরী ফুটফুটে এক বোন্ আছে এবং প্রগলভ বেটে-খাটো হাড়গোড় বার করা তার দেহ, এক চোখ কানা গাধার পিঠে চেপে সে যে নদীর ধারে ঘুরে বেড়ায়—এসব নিয়ে ওকে সহজেই ক্ষেপিয়ে তোলা যায়। সে কিন্তু ছোটার পিছু নেয় না। সুশ্রী সুঠাম গড়ন। তাদের বস্তির মধ্যে অমন চালাক চতুর ছোক্‌রা ক'টা আছে? তেল কুচ্‌কুচে এক মাথা সুবিন্যস্ত চুল। পরনে খাকী প্যাণ্ট, পায়ে শাদা

টেনিস হয়। রীতিমত যাকে বলে আদর্শ ভদ্র লোক। ওকে দেখে বখার তাই মনে হয়। অমন লোকের প্রশংসায় সে ছিল পঞ্চমুখ। অনুকরণ করতে তার ইচ্ছে হয়। ছোটার সঙ্গে তাই তার একটা মধুর বোঝাপড়া হয়ে গিয়েছিল। ওরা পরস্পর ঠাট্টা তামাসা করলেও সবসময় সেটা হেসে-খেলে গড়িয়ে দিত গায়ের ওপর দিয়ে।

'আয় না ও জামাই ভাই!' রামচরণ তার ভুরুহীন চোখ দু'টো কুঁচকে ডেকে উঠল।

'আমি তো তোদের জামাই হতে চাইছি, কিন্তু তুই তো আমল দিস্ না', জবাব দিল বখা। সে যে রামচরণের বোনের প্রণয়াকাঙ্ক্ষী এটা আর কারো কাছে অজানা ছিল না। বখা তাই ধুপী-ছেলের টিপ্পনীটা অনেকটা হাল্‌কা ক'রে নিলে গায়ে মাখিয়ে।

'আরে, তার যে আজ শাদি! তুই বড় দেরী করে এলি রে!' রামচরণ জবাব দিল। ঠাট্টাটা বখা যে আর ফিরিয়ে দিতে পারবে না এই ভেবে সে খানিকটা আত্মপ্রসাদ লাভ করল।

'ও:, তাই বুঝি আজ তুই অমন বাহারে কাপড়-চোপড় সব পরেছিস্?' বখা টিপ্পনী কাটলে: 'তাই বল্! গায়ে তোর কি সুন্দর ওয়েস্টকোট্ রে!. মখমলের ওপর সোনালী কাজ করাটা একটু যা উঠে গেছে। ওটা ইস্ত্রি ক'রে নিস্‌নি কেন? ও:, ওটা ঘড়ির চেন বুঝি! ঘড়ির চেন আমিও খুব পছন্দ করি বুঝলি? হ্যাঁরে, চেনের সঙ্গে তোর ঘড়ি আছে তো? না, খালি লোক দেখানো ফ্যাসান ক'রে ঘড়ি ছাড়া চেন ঝুলিয়েছিস্?'

রামচরণ দমে গেল। চোখ দুটো আরক্ত হয়ে উঠল। ছোটা চুপ্-চাপ বসে বসে দুজনের কথাবার্তা শুনছিল আর চিবিয়ে চিবিয়ে হাসছিল। বখা তার গায়ের ছেঁড়া তালি লাগানো ওভার-কোটের লম্বা হাতায় হাত দুটো পুরে হি হি ক'রে শীতে কাঁপছিল। পুরানো

ওভার-কোটটা সে দাদার কাছ থেকে পেয়েছিল। অচ্ছুৎদের অনেকেই রোদে বসে বসে তখন তাদের পরনের জামা ও পায়জামার খাঁজ থেকে বেছে বেছে উকুন মারতে ব্যস্ত। ওদের দিকে কেউ অত নজর দিল না। রোদে কুৎসিৎ হাত পা ছড়িয়ে বসা বা দাঁড়ানো অচ্ছুৎদের চোখেমুখে ফুটে উঠেছে কেমন ক্লান্ত অসহায় এক বিষন্ন দৃষ্টি। দেখে মনে হয় ওরা যেন নিজেদের আত্মার পারিপার্শ্বিক অন্ধকার তুহীন শীতল বিশ্বলোক হতে ছুটে বেরিয়ে পড়তে চায়। বেরিয়ে পড়তে চায় প্রাণময় উদ্দীপ্ত আলোকোজ্জল বাহির পৃথিবীর নূতন সৃষ্টির মায়াস্পর্শে। তাদের ভিজে ঝিঙী স্যাঁৎসেতে অন্ধকারময় মাথা গুঞ্জবার ছোট ছোট পায়রার খোপগুলি দুহাতে যেন তাদের আঁকড়ে ধরতে চায় মুক্ত খোলা আকাশের নীচে ছুটে এলেই। বুকে মাথা গুঁজে ম্লান বিষন্ন মুখে ওরা তাই চুপ ক'রে থাকে। মুক্তির স্বাদ, স্বাধীনতার অনাবিল আনন্দ পেলেও বুঝি সইবে না। ওদের পরস্পরকে অচ্ছেদ্য বন্ধনডোরে বাঁধতে যেন ভুলে গেছেন সৃষ্টিকর্তা। তাই তারা ছন্নছাড়া—নিষ্প্রাণ, নির্লিপ্ত, আপন সত্তাহীন, ভবঘুরেব দল। ওরা নিজেরাই নিজেদের কাছে এক বিপুল বিরাট—পরম বিস্ময়!

বখাকে দেখে ওরা স্বাগত সম্ভাষণ জানায়। বখা প্রত্যাশাও করেছিল। বৃটিশ সৈন্যদের ব্যারাক থেকে নূতন ধরণের হালচাল শিখে এসে সে আশেপাশের প্রতিবেশীদের কোনো আমল দিত না এমন নয়। ওদের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে একসূত্রেই তো তার চিন্তা, অনুভূতি, জীবন-ধারা সব আছে গাঁথা। ওদের মাঝে গিয়ে দাঁড়ালে কয়েক মুহূর্তের জন্যে অঙ্গাঙ্গীভাবে ও মিশে যায় অজানা অচেনা খাপছাড়া ওই মূঢ় মূক জনতার সঙ্গে।

ওদের সঙ্গে মিশলে সকাল বেলাকার পুরো রূপটাই বখার চোখে ধরা দেয়।

'কে, বখা? আরে তুই চললি কোথায়?' ছোটা শুধাল। কালো চুকচুকে ওর মুখের উপর একফালি রোদ এসে পড়েছিল। চোখ দুটি তার নেচে উঠল খুসিতে।

'বাবার অসুখ', বধা জবাব দিলে : 'তাই ভাই সহরের রাস্তা-ঘাট আর হাট-মন্দিরটা ঝাড়ু দিতে হবে।' বধা এবার ভাইয়ের দিকে ফিরে তাকিয়ে বলল :

'ও রথিয়া, সকাল বেলা তুই অমন পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছিস্ কেন? বাবার অসুখ, আমিও বেরিয়ে পড়েছি। টাট্টিখানাব সব কাজ পড়ে আছে। যা তো ছুটে বাড়ি যা। সোহিনী তোর জন্যে চা নিয়ে বসে আছে।'

বধা বেঁটে খাটো ছোট্ট ছেলে। মুখখানা একটু লম্বা। কালো মতো দেখতে। একটু তোতলাও। মনে মনে দাদার কথায় চটে গেল। তবু খেলা ফেলে সে ঘরেব দিকে পা বাড়ালে মুখখানা বেজাব ক'রে।

'আরে, যাসনে, যাসনে তুই!' রামচরণ ওর পেছনে ডেকে উঠল কাজ্‌লোমো ক'রে।—'দাদা তোর "ভদ্দরলোক" হয়েছেন কি না, তাই খালি ঝাড়ু দেবেন রাস্তা-ঘাট। আর তোকে দিয়ে পায়খানা আর রাজ্যের যত সব নোংরা কাজ করিয়ে নিতে চাইছে।'

'যা, বক্ বক্ করিসনে, ও জামাই ভাই', বধা হেসেই বলে।—'ওকে এখন যেতে দে, কাজ করুক্ একটু।'

'আয়, চল খেলিগে' ছোটা বলল। ছোটা তার সার্টের পকেটে হাত গলিয়ে দিয়ে এক প্যাকেট্ "লাল লণ্ঠন" সিগারেট্ বার করল। সিগারেট্ ক'টা সে একবার গুণে বথার হাতে একটা দিয়ে বলে উঠল : 'আয় রে, আয় সবাই একসঙ্গে খেলিগে।'

ব্যাণ্ড বাজিয়ে ছোক্‌রা ক্যাটন আর ছুতোর মিস্ত্রীদের ছেলে গধু তখন মাঠের মাঝখানে এক গোলাকার গর্ত খুঁড়ে গুলি খেলছিল। সে ওদের দেখিয়ে দিলে।

'আয়রে', ছোটা আগ্রহে ফেটে পড়ল।—'চল আমরা কিছু টাকা লুটে আসি।'

'না, আমাকে কাজে যেতে হবে,' বথা জবাব দিল। ছোটার প্রস্তাবটাকে সে আমল দিল না।

'বাবা দেখতে পেলে ভয়ানক রাগ করবে ভাই।'

'ভুলে যা বুড়োকে, আয়, খেলবি আয়।' ছোটা গোঁ ধরল।

'আরে আয়না,' রামচরণ ডাকল।

ওরা সবাই চুরি ক'রে কেটে পড়েছিল বাড়ী থেকে। বাপ মা যে কোন সময় ওদের জন্যে হাঁকাহাঁকি সুরু ক'রে দেয়। শত গালমন্দ, মারধোর কিছুতেই ওদের শিক্ষা হয় না। প্রত্যেক দিন সকাল বেলা এমনি পালিয়ে আসা চাই রোদ পোয়াতে। কিন্তু বথার কথা আলাদা। নির্দিষ্ট নিয়ম মাফিক তাকে চলতে হয়। সবরকমের খেলা ধূলোয় তার জুড়ি মেলা ভার। 'খুটি' খেলাতেও সে ওদের সকলকে সহজে হারিয়ে দিতে পারে। কিন্তু খেলা ধূলোই ওর জীবনের সব নয়। কর্তব্য কর্মই হল সর্বাগ্রে। সে পা বাড়াল।

'একটু দাঁড়া না,' ছোটা বললে: 'বড়বাবুর ছেলেরা আসছে দেখছি। আজকের হকি ম্যাচের হ'ল কি? একত্রিশ নম্বর পাঞ্জাবী ছোঁড়াগুলো যে আমাদের রীতিমত চ্যালেঞ্জ ক'রে গেছে!'

'বাবা আসতে দিলে আমি আসব,' বথা বললে। মুখ তুলে সে এক সময় তাকাল। সাদা ধবধবে পোষাক পরা দুটো ছোট ছেলেকে আসতে দেখে সে হাত তুলে নমস্কার করে সসম্মানে বলল: 'সেলাম, বাবুজি।'

বড় ছেলেটার বয়স বছর দশেক হবে। রোগা হাড্ডিসার সাদাসিধে গোবেচারী গোছের দেখতে। নাকটা একটু খাঁদা। দুপাশের চোয়াল দুটো বেশ পুরু। বথার দিকে তাকিয়ে ও একটু হাসল। ছোট ছেলেটার বয়স হবে প্রায় বছর আষ্টেক। মুখখানি অনেকটা ডিমের মত। চওড়া কপাল; নীচের পুরু ঠোঁটটা ঝুলে পড়েছে। কালো চোখ দুটিতে

দুষ্টুমির ইঙ্গিত। আর ছোট্ট চিবুকটাতে জীবনের অটুট-দৃঢ় সঙ্কল্প। কথার উপর সে একবার চোখ দুটি বুলিয়ে নিল। তার চোখ দুটি নেচে উঠল।

'কি হে ছোক্‌রা—'

রামচরণ আর ছোটা বুক চিতিয়ে এগিয়ে এল। বললে: 'আজকে হকি ম্যাচের কি হবে? একত্রিশ নম্বর পাঞ্জাবী ছোঁড়াদের সঙ্গে যে আজ খেলতে হবে আমাদের!'

'সে খেলব'খন বিকাল বেলা!' ছোট্ট ছেলেটা দাদার আঙুল ধরে দাঁড়িয়েছিল। প্রকাণ্ড একটা লাফ মেরে ফেটে পড়ল এবার বিপুল আগ্রহে। ছেলেমানুষ, কতটুকুন বা বয়েস; ষ্টিকখানা পর্যন্ত এখনও ধরতে শেখেনি ভালো ক'রে, সে কিনা যাবে ম্যাচ্ খেল্‌তে! ওকে যে কেউ খেলতে ডাকে না তাতে যেন সে বড় একটা তোয়াক্কা করে না।··

'তা হোলে আপনাদের ষ্টিক ক'টা আমাদের একবার খেলতে দেবেন?' ছেলেটার উৎকট উৎসাহের সুযোগ নিয়ে শেয়ানা রামচরণ কথাটা পাড়লে। ওদের কাছ থেকে এই ফাঁকে যদি একটা প্রতিশ্রুতি আদায় ক'রে নেওয়া যায়, মন্দ কি। অবশ্য সে জানত, সে সম্ভাবনা কমই। তাকে হয়ত নিরাশ হতে হবে। ইতিপূর্বে অনেক বারই বিকেলে খেলার মাঠে এসে এমনিধারা তাকে নিরাশ হ'তে হয়েছে।

বাপের দৌলতে বাবুর ছেলেদের সঙ্গে স্থানীয় সৈন্যদলের হকি টিম ক্যাপ্‌টেনের খানিকটা দহরম মহরম ছিল। হকি ষ্টিকও ছিল বিস্তর। পাড়ার ছেলেরা বাবুদের ছেলেদের কাছ থেকে ষ্টিক্ চেয়ে নিয়ে প্রত্যেকদিন বিকেলে প্র্যাক্‌টিস্ ম্যাচ খেলত। ওসব ছেলেদের নিয়েই আটত্রিশ নম্বর 'জোগরা একাদশ বালক সঙ্ঘ' গড়ে উঠেছিল। সঙ্ঘের অধিকাংশ সভ্যই অচ্ছুৎদের গরীব ছেলেপিলেরা। বাবুদের বড় ছেলেটির কাছ থেকে ষ্টিক চেয়ে ওরা কোনদিনই নিরাশ হয়নি। ছোট লোকদের ছেলেদের সঙ্গে খেলাধূলো করত বলে মার গঞ্জনাও তাকে কম হজম করতে হয় নি।

সব সে নীরবে মাথা পেতে নিতো। কিন্তু ছোট ভাইটার কথা আলাদা। তোয়াজ না করলে ষ্টিক হাত ছাড়া করতে সে কিছুতেই রাজী হতো না।

'হ্যারে জানিস, হাবিলদার চারৎ সিংএর কাছ থেকে চক্‌চকে আনকোরা একখানা ষ্টিক্ আমি নিয়ে এসেছি?' সে বলে উঠলে ফস্ ক'রে। —'নতুন একটা বলও।' হঠাৎ সে চোখমুখ কুঁচকে ফিরে দাঁড়াল দাদার দিকে। ওকে একটা কনুই-এর খোঁচা দিয়ে চেঁচিয়ে উঠল :

'এস, ইস্কুলে যাবে না! দেরী হয়ে যাচ্ছে যে!' গলায় তার বিরক্তির ঝাঁজ।

ছোট মুখখানা ওর উদ্দীপ্ত হয়ে উঠল। বখা তা লক্ষ্য করল। ইস্কুলে যাবার কি একান্ত আগ্রহ ছেলেটার! সে ভাবল লেখাপড়া শিখতে পারলে কি মজা! খবরের কাগজগুলো পড়া যায়। সাহেবদের সঙ্গে সমান তালে পারা যায় কথা কইতে। একখানা চিঠি এলে সেটা পড়িয়ে নেবার জন্য ছুটতে হয় না পত্র-লিখিয়ের বাড়ী বাড়ী। ওকে আর দক্ষিণা দিতে হবে না চিঠি লিখিয়ে দেবার জন্য। কতদিন তার ইচ্ছে হয়েছে, ওয়ারিশ শা-র 'হীরা আর রঞ্জন' বইখানা পড়বার। সে যখন বৃটিশ সৈন্যদের ব্যারাকে ছিল কতদিন তার না ইচ্ছে হয়েছে টমিগুলোর মত টিশ-মিশ, টিশ-মিশ ক'রে কথা কইতে।

'সাহেব হতে হলে ইস্কুলে যাওয়া চাই।'

বৃটিশ ব্যারাকে থাকতে সে যখন খুড়োর কাছে প্রথম কথাটা পেড়েছিল তার খুড়ো তাকে দিয়েছিল শুনিয়ে। ইস্কুলে যাবার জন্য সে তখন শুরু করে দিয়েছিল ভয়ানক কান্নাকাটি। ওর বাপ তখন মুখ ঝাম্‌টা দিয়ে উঠেছিল : 'ইস্কুল-কলেজ কি আর ছোটলোক ধাঙড় মেথরদের জন্য? ওসব হলো বাবুলোকদের।' সে তখন অবশ্য অতসব বোঝেনি। বৃটিশ ব্যারাকে গিয়ে বুঝতে পেরেছিল বাপ তার কেন নারাজ হয়েছিল তাকে ইস্কুলে পাঠাতে। ধাঙড়ের ছেলে সে, বাবুলোক হতে পারে না কখনও। আরও

পরে সে জানতে পেরেছিল, এখানকার কোন ইস্কুলেই তাদের মত ছোটলোক-দের প্রবেশ অধিকার নেই। প্রবেশাধিকার নেই কেননা, ইস্কুলের অপর ছাত্র-দের বাপ-মারা তাদের ছেলেপিলেদের ছোটলোকের বেটার কলুষিত ছায়া মাড়াতে দিতে রাজী নয়। হুঁ, যত সব আজগুবি কথা ওদের! আচ্ছা, হকি খেলায় হিন্দুর ছোঁড়াগুলো তাকে কতবার ছুঁয়ে দেয় না গায়ে পড়ে? সে জানে ইস্কুলে একসঙ্গে পড়বার ওদের কারোও এতটুকু আপত্তি নেই। কিন্তু আপত্তি সব শিক্ষকদের। ওরা অস্পৃশ্য, অচ্ছুৎদের বিদ্যা দান করতে পরাঙ্মুখ। কি জানি কখন পড়াতে গিয়ে ছোটলোকগুলোর বই ফেলবে ছুঁয়ে। তাহলে সর্বনাশ! জাত গেল, কলুষিত হয়ে গেলো সর্বস্ব! মান্ধাতা আমলের ঐসব সেকেলে হিন্দু বুড়োগুলোই যতসব নষ্টের গোড়া। হ্যাঁ, সে ধাঙড়ই! কিন্তু সখ ক'রে সে কি আর ধাঙড় সেজেছে? ছ'বছরে পা দিতে না দিতেই টাট্টি সাফার কাজে মাথা গলাতে হয় একান্ত বাধ্য হয়ে। জাত পেশা। বাপ ঠাকুর্দার আমল থেকে সবাই ক'রে আসছে একাজ। সে তো ব্যাতিক্রম নয়। তাই সে জাত ব্যবসাটা নিয়েছিল মাথা পেতে। কিন্তু প্রতিদিন সে মনে মনে স্বপ্নসৌধ গড়ে তোলে সাহেব হবার। পড়াশুনা করতে কতদিন না তাব প্রবল ইচ্ছা হয়েছে। টমিদের ব্যারাকের দিনগুলি তার চোখে বুঝি পরিয়ে দিয়ে গেছে স্বপ্নের মায়াকাজল! কাজ কর্ম সেবে কতদিন সে তখন বসে বসে ভেবেছে পড়বে বলে। কয়েকদিন পরে সত্যি সত্যিই সে গিয়ে ইংরেজী এক প্রথম-পাঠ কিনে এনেছিল। কিন্তু একা নিজের চেষ্টায় আর কতদূর এগোনো যায়? ইংরেজী বর্ণমালার অ, আ, ক, খ, পাতায় এসে হুমড়ি খেয়ে তাকে পড়তে হয়েছিল। চারদিকের ঝল্‌মল্ করা রোদে বাবুদের ছোট্ট ছেলেটাকে পরম আগ্রহভরে দাদাকে হাত ধরে ইস্কুলের দিকে টেনে নিয়ে যেতে দেখে সহসা বুকটা মোচড় দিয়ে উঠল ব্যথায়। বাবুদের ছেলে তাকে একটু পড়াবে কিনা ইচ্ছে হল শুধাতে। বড ছেলেটিকে উদ্দেশ ক'রে জিজ্ঞেস করল:

'বাবুজী, আপনি এখন কোন ক্লাশে উঠলেন ?'

'পঞ্চম শ্রেণীতে,' ছেলেটি জবাব দিল।

'আপনি নিশ্চয় পড়াতে পারেন ?'

'হ্যাঁরে,' উত্তর দিল ছেলেটা।

'আচ্ছা, রোজ আমায় একটু ক'রে পড়াবেন ?'

ছেলেটা বুঝি একটু ইতস্ততঃ করল। বখা তাই দেখে বলল :

'পড়ানোর জন্য আমি কিন্তু কিছু দক্ষিণাও দেব আপনাকে।' বখার গলাটা শেষের দিকে ধরে এল আবেগ আগ্রহে।

বাবুদের ছেলেগুলো তেমন বিশেষ কিছু হাত খরচা পেত না। ওদের বাপ-মা খরচ-খরচাটা করত বেশ বুঝে-সুজে। ছোটলোকের ছেলেদের মত যখন তখন বাজার থেকে যা-তা কিনে খাওয়াটা পছন্দ করত না ছেলেদের। একটু কিপ্টেও ছিল। বড় ছেলেটা তাই দু-এক পয়সা কারো কাছ থেকে পেলে সেটা জমিয়ে রাখত।

'বেশ, আমি তোমাকে ঠিক পড়াব। কিন্তু—'

টাকা পয়সার প্রসঙ্গটাকে পাকা ক'রে নেবার জন্য ও বুঝি একটু ইতস্ততঃ করছে। ব্যাপারটা বুঝতে পেরে বখা বললে :

'প্রত্যেকদিন পড়ানোর জন্য আমি আপনাকে চার পয়সা ক'রে দেব, দাদাবাবু!'

বাবুদের ছেলে এবার একটু কপট হাসি হাসল। সম্মতি জানিয়ে বলে উঠল :

'আরে, সে হবে 'খন, একটুখানি পড়ানোর জন্য আবার পয়সা কেন!'

'আজ বিকেল থেকেই তাহলে পড়াচ্ছেন ?' বখা আবার কাকুতি করলে।

'হ্যাঁ।' ও মাথা নাড়ল। দাঁড়িয়ে আরও বুঝি খানিকক্ষণ গল্প করত বখার সঙ্গে। কিন্তু ছোট ভাইয়ের কাছ থেকে ও একটা প্রচণ্ড তাড়া খেল। ভাইটি দাঁতমুখ খিচিঁয়ে উঠে দাদার আস্তিন ধরে হেচঁকা একটা টান মেরে একরূপ চেঁচিয়ে উঠল :

'এস। দেখ ত সূর্যি কতদূর উঠে গেছে মাথার উপর! ইস্কুলে দেরী ক'রে গেলে মার খাবে না?'

বখা কিন্তু ওর অমন চটে ওঠার কারণটা ধরে ফেলল। ইস্কুলের দেরী হওয়াটাই সব নয়। পড়িয়ে দাদা দু'পয়সা লাভ করবে তা বুঝি ছোট ভাইটির সইলো না। ব্যাপারখানা বখা বুঝতে পেরে ওকে তোয়াজ করবার জন্যে বললে:

'ছোট দাদাবাবু, আপনিও আমায় একটু পড়ান না? রোজ আপনাকেও আমি এক পয়সা ক'রে দেব।'

বখা জানত এতেই ওর সব রাগ জল হয়ে যাবে। মাকে কিছু আর বলবে না। বখা জানতো মার কানে যদি কথাটা একবার ওঠে যে ছেলে খাণ্ডড়দের বেটাকে পড়াচ্ছে তাহলে তিনি রেগে আগুন হয়ে যাবেন। বেচারাকে হয়ত বাড়ি থেকে তাড়িয়েও দেবেন। তিনি যে ধর্মান্ধ হিন্দু মহিলা বখার তা অজানা ছিল না।

চঞ্চল শিশু! তোয়াজ বা ঘুষের কদর কতটুকু বোঝে? সে ইস্কুলে যাবার জন্যে সত্যি ব্যস্ত হয়ে উঠল। দাদার জামার প্রান্ত ধরে হিড়্‌হিড়্ ক'রে তাকে টেনে নিয়ে চলল।

বখা ওদের পেছনে তাকিয়ে রইল। আজ বিকেল থেকেই সে পড়বার সুযোগ পাবে তা' হলে। কথাটা ভাবতেই মুখখানা তার উদ্দীপ্ত হয়ে উঠল। বুকখানা কেঁপে উঠল নবীন আশায়। যাবার জন্যে সেও পা বাড়ালে একসময়।

'ও বাবু মশায়, দাঁড়ান! আপনি—থুড়ি তুমি যে এখন মস্ত নোক হতে চল্‌লে।' রামচবণ ব্যাঙ্গ ক'রে উঠল পেছন থেকে।—'আরে, তুমি যে দেখছি কথাই কও না আমাদের সঙ্গে।'

'তুই একটা পাগল!' বখা জবাব দিল একগাল হেসে। —'অনেক বেলা হয়ে গেছে, আমি এখন যাব ভাই। নাটমন্দির আর মন্দিরের সামনেটা ঝাড়ু দিতে হবে এক্ষুনি।'

'বেশ, পাগল কিনা আজকের হকি খেলায় দেখিয়ে দেব।'

'তাই দেখাস', বখা বল্‌লে। ঝুড়ি ও ঝাড়ুগাছটা বগলদাবা ক'রে সে শহরের দিকে পা বাড়াল। আপন মনে সে গুন গুন ক'রে উঠল। ইচ্ছে হয় চাতক পাখীর মত গান গেয়ে উঠতে উচ্চৈঃস্বরে।...

'তান্—নানা-নান্-তান্।'

আর পাঁচজন পথচারীর মত রাস্তার মাঝখান দিয়ে সে চলেছিল। পেছনে সহসা গরুর গাড়ীর ঘণ্টা বেজে উঠতেই একলাফে সে উঠে এল পথের একপাশে। একহাঁটু ধুলোর ভেতর থেকে পায়ের জুতো জোড়াটি পুনরুদ্ধার করতে করতে স্থানীয় মিউনিসিপ্যাল কর্তৃপক্ষের অব্যবস্থার তারিফ না ক'রে সে পারল না। খালি একরাশ ধুলো! বরাত তার ভালোই, আর কিছু নয়। রাস্তার দু'পাশের চাকার সুগভীর খাঁজ ধরে গরুর গাড়ীখানা এগিয়ে চলেছে একটানা আর্তনাদ করতে করতে। একরাশ ধুলো উড়ে এসে পড়ছে তার নাকে মুখে চোখে। অপূর্ব এক আনন্দে বুক ভরে ওঠে তার।

সে শহরের ফটকের কাছে এসে গেল। পাশেই কয়েকটা চেলাকাঠের দোকান। আর খানিকটা তফাতে শ্মশান ঘাট। শ্মশানে যা'রা মড়া পোড়াতে আসে তা'রা ঐ দোকানগুলো থেকে কাঠ কিনে নেয়। উন্মুক্ত এক খাটিয়ার ওপর একটা মড়া নিয়ে একদল শবযাত্রী এক দোকানের কাছে এসে থামল। রঙিন্ এক লাল কাপড়ে মড়াটার আপাদমস্তক ঢাকা। কাপড়খানার গায়ে অসংখ্য সোনালী তারার ছাপ। বখা মড়াটার দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে দেখল। সর্বাঙ্গ তা'র সহসা ছম্‌ছম্ ক'রে ওঠে ভয়ে। মৃত্যুর মহা বিভীষিকা তা'কে যেন পেয়ে বসে। সে যেন দু'পায়ে হঠাৎ মাড়িয়ে গেছে বিষাক্ত এক সরীসৃপকে। ভয়ে আঁত্‌কে ওঠে সে। একটু পরেই নিজের মনকে আবার আশ্বাস দেয়: পথে বেরিয়ে মড়া দেখাটা যে শুভলক্ষণের, দিনটা আজ ভাল যাবে। মা কতদিন বলেছে।

সে এগিয়ে চলল। মুসলমান ফলওয়ালারা তাদের ছোট ছোট দোকানের সামনে বসে আঁখ কেটে রাখছে স্তূপাকার ক'রে। পরনে তা'দের নোংরা জামা-কাপড়। নেড়া মাথা; মেহেদি রঙ্ করা দাড়ি। বথা তা'দের পাশ কেটে চলল। পিছনে ফেলে চলল হিন্দু খাবারওয়ালাদের দোকানগুলো।

থালায় থালায় নানারকম সুমিষ্ট খাবার সাজিয়ে রেখেছে ওরা। বথা একসময় এসে দাঁড়াল এক পানের দোকানের সামনে। দোকানটার তিন দিকে ঝুলছে তিনখানা প্রকাণ্ড আয়না আর হিন্দু দেবদেবী ও বিলেতী সুন্দরীদের লিথোগ্রাফ্ পট্। মাঝখানে নোংরা থাগড়ী বাঁধা একটা ছোক্‌রা বসে বসে পানে খয়ের আর চুণ মাখাচ্ছে। ডানদিকে তা'র থরে থরে 'লাল লণ্ঠন' আর 'সিজার' সিগারেটের বাক্স সাজানো আর বাঁ দিকে বিড়ির বাণ্ডিল।

আয়নাতে বথার মুখের প্রতিচ্ছায়া এসে পড়েছিল। সলজ্জ চোখ তুলে সে একবার সামনের দিকে তাকাল। সিগারেটের বাক্সগুলোর উপর তা'রও চোখ পড়ল। দোকানীর সামনে সে এগিয়ে এসে হাতদুটি জোড় ক'রে একান্ত বিনীত ভাবে জানতে চাইল এক প্যাকেট 'লাল লণ্ঠন' সিগারেট কিনতে হ'লে সে কোথায় রাখবে পয়সা। দোকানী পাশের কাঠের বাক্সের একটা জায়গা দেখিয়ে দেয়। বথা ওখানে আনিটা রাখে। পানওয়ালা তা'র লোটা থেকে খানিকটা জল ঢেলে নিকেলের আনিটাকে ধুয়ে পবিত্র ক'রে নিয়ে তুলে রাখল যত্ন ক'রে। তারপর বথার দিকে ছুঁড়ে দেয় এক প্যাকেট 'লাল লণ্ঠন' সিগারেট। যেন একটা হ্যাংলা কুকুর। কশাই-এর দোকানের চারপাশে মাটী শুঁকে শুঁকে ঘুর ঘুর করছে দেখে একটা হাড় ছুড়ে দিল কশাইটা একান্ত করুণা ক'রে।

বথা প্যাকেটটা কুড়িয়ে নিয়ে এগিয়ে চলে। প্যাকেটটা খুলে একটা সিগারেট বার ক'রে নেয়। তাই ত ম্যাচ্‌টা যে কেনা হয়নি। কিন্তু

পানের দোকানে আবার ফিরে যেতে তা'র ইচ্ছে হো'ল না। সে যে ধাঙডদেব বেটা তা' লোকের কাছে যত কম পারা যায় জাহিব করাই ভাল। ছোট লোক ধাঙড়দের ধূমপান কবা ভগবানের কাছে বুঝি এক মহা-অপবাধ। তা'বা গরীব, বডলোকদের মত ধূমপান করা তা'দের পক্ষে অশোভন, বেয়াদবিও বটে। তবু সে অভ্যাসটা ছাড়তে পারে না। কেউ না দেখলেই হ'ল।

রাস্তার তু'পাশে খোলা জায়গায় নাপিতরা নিজেদের সাজ-সরঞ্জাম নিয়ে রাস্তার উপর মাতুর পেতে বসে গেছে। বখা দেখল এক মুসলমান নাপিত মাতুবেব উপব বসে মস্ত একটা হুঁকোয় তামাক খাচ্ছে। ওর কাছে সে এগিয়ে গিয়ে মিনতি করে বলল :

'মিঞাজী, আপনাব কল্কি থেকে একটু আগুন দেবেন ?'

'তোমাব সিগাবেটটা ধরিয়ে নিতে চাইছ ? বেশত, আগুনের কাছে মুখখানা এনে ধবিয়ে নাও।'

বখা কেমন যেন ঘাবড়ে গেল। এটা যেন বাড়াবাড়ি। হিন্দুদের কাছে মুসলমানরাও অস্পৃশ্য—অচ্ছুৎ। এমন কি কোন মুসলমানের কাছেও সে কোনদিন অমন একটা সুযোগ—এতখানি স্বাধীনতার স্বাদ পায়নি জীবনে। তবু সে কলকেব উপব ঝুঁকে পড়ে সিগারেটটা ধরিয়ে নিয়ে লম্বা একটা টান দেয় সিগারেটটায়। নাক দিয়ে একরাশ ধোঁয়া ছেড়ে খানিকক্ষণ পায়চারি করে ওখানটায়। বুকটা তাব হাল্কা হয়ে যায়। তৃপ্তির একটা শ্বাস ঝরে পড়ে।...

শহরের প্রকাণ্ড তোবণদ্বাব ছাড়িয়ে সে প্রশস্ত রাজপথে এসে পড়ে। চোখ তুটো নেচে ওঠে তাব নানান বর্ণচ্ছটায়। প্রায় মাসখানেক হোতে চলেছে এদিক পানে একবাবো আসা হয়নি। পায়খানার একটানা কাজ সেরে একমুহূর্ত সে ফুবসৎ পায়না। চারিদিকের বিচিত্র মুখর জনতার ভীড়ে

সে গড়িয়ে দেয় নিজেকে। রাস্তার মোড়ে মোড়ে সারি সারি দোকান। নানান্ পণ্যদ্রব্যে বিপনী সাজিয়ে বসে আছে দোকানদারেরা। হরেক রকমের ক্রেতারা ভীড় ক'রে আছে চারিদিকে।...বাজারে এসে গেল সে। এখানে ওখানে তাজা আর বাসি শাক-সজী, তরিতরকারী, চাল-ডাল ইত্যাদি বিভিন্ন দ্রব্যের সমাবেশ। খোলা নর্দমা, নানান্ ধরণের লোকজন, সুবেশা মহিলাদের পরিচ্ছদের উৎকট আতর গন্ধ...সবকিছু মিলে কেমন যেন সৃষ্টি করেছে মধুর এক গন্ধের মূর্চ্ছনা।...পেশোয়ারী ফলওয়ালারা পাকা পাকা লাল, বেগুনি, হলদে ফলের ঝুড়ি নিয়ে বসে আছে চারিদিকে রঙের বাহার খেলিয়ে। মাথায় তাদের নীল সিল্কের পাগড়ী। গায়ে সোনালী কাজ করা মখমলের ওয়েষ্টকোট। পরনে লম্বা ঢিলে আলখাল্লা আর পায়জামা।...কসাইখানার মাংসের দোকানগুলোতে টকটকে লাল তাজা মাংসের চাঙড়া সব ঝুলছে। আর মিষ্টির দোকানগুলো থেকে যেন ছড়িয়ে পড়েছে রামধনু রঙের বিচিত্র বর্ণচ্ছটা।...

চারিদিকে ব্যস্ততা। মুখর জনতার মাঝে বখা নিজেকে যেন হারিয়ে ফেলে মুহূর্তের জন্য। হরেক রকমের বিচিত্র জনতার ওপর থেকে চোখ তুলে সে এবার তাকাল সুসজ্জিত দোকানগুলির দিকে। চোখে তার শিশুর মত উৎসুক অনুসন্ধিৎসা। কাঠুরেদের কাঠ চেরার দিকে অবাক হয়ে সে চেয়ে থাকে। পরক্ষণেই আবার খলিফাদের দোকানের সামনে গিয়ে হাঁ ক'রে চেয়ে থাকে কলের দিকে।

'আশ্চর্য! সত্যিই, কি আশ্চর্য!' সে বিড় বিড় ক'রে উঠে। বেনিয়া গণেশনাথের উপর তার চোখ গিয়ে পড়ে একসময়। ওটা একটা রীতিমতো ছোটোলোক। জিভের আল কি! ঘরে বস্তা বস্তা ময়দা, গুড়, শুকনো লঙ্কা, মটর আর গমের ছড়াছড়ি। তবু এক খামচা নুন আর একছিটে ঘি-এর জন্য এখানে বসে আছে হা পিত্যেশ হয়ে। বখা চোখ দুটো তৎক্ষনাৎ নামিয়ে নিল। কেননা সম্প্রতি তার বাপের সঙ্গে বেনিয়াটার

একটা ঝগড়া হয়ে গেছে। স্ত্রীর মৃত্যুর সময় লখা বৌ-এর কিছু অলঙ্কার বাঁধা রেখে গোটা কয়েক টাকা ধার নিয়েছিল গণেশের কাছ থেকে। ঝগড়াটা বেধেছিল সেই টাকার সুদের সুদ নিয়ে। সে এক বিশ্রী কাণ্ড। দৃশ্যটি মনে পড়তেই বখার মাথাটা গরম হয়ে ওঠে। কোন রকমে আত্মসংবরণ ক'রে সে তাকাল সামনের কাপড়ের দোকানটার দিকে। মস্ত ভুড়িওয়ালা এক লালা খয়রা-রঙের একটা খাতার ওপর ঝুঁকে পড়ে হিজিবিজি কিসব লিখে চলেছে আপন মনে। গায়ে তার শাদা ধব্ধবে মস্লিনের সার্ট, পরনে ফিন্-ফিনে ধুতি। গাঁ থেকে এক বুড়ো তার বুড়ীকে নিয়ে সওদা করতে এসেছিল দোকানে। গাঁটের পর গাঁট বিলেতি ম্যানচেস্টার কাপড় খুলে খুলে ওদের দেখাচ্ছে দোকানের কর্মচারীরা। বিলেতি কাপডের সরসতা প্রমাণ করিয়ে কাপড় কিনবার জন্যে প্রলুব্ধ ক'রে তুলছে গেঁয়ো লোকটাকে। দোকানের এক কোণে নানান কাপড় ঝুলিয়ে রাখা হয়েছিল। বখার চোখ ওদিকে পডে রইল। অমন পশমের কাপড় দিয়েই সাহেবরা স্যুট্ তৈরী করে, আর ওই চাষা ভুটোর সামনে ছডানো কাপড়টা দিয়ে বোধ হয় তৈবী করে অন্তর্বাস। পশমী কাপড়টার কি বাহারে রঙ। চড়া দামের হবে নিশ্চয়। পাত্লুন বা স্যুট কবাবার জন্য ওই কাপড়টা কিনবার কথা সে মনে স্থান দেয় নি কোনদিন। তবু পকেটে সে হাতখানা গলিয়ে দেয়। দেখে কাপড়টা কিনে কিস্তিতে দামটা দেবার মত টাকা আছে কিনা। ও হরি, পয়সা আছে মাত্র আনা আষ্টেক। আজ যে আবার ইংরেজী পড়ানোর জন্য বাবুর ছেলেকে পয়সা দিতে হবে!

রাস্তা পেরিয়ে সে চলে এল অপর ফুটপাতে। সামনেই এক বাঙ্গালীর মিষ্টির দোকান। নোংরা কাপড়-চোপড়-পরা মোটামত ময়রাটির সামনে রূপালি পাত বসানো এক থালা বরফি। তাই দেখে বখার জিভে জল এসে গেল। 'এখনও আমার পকেটে কড়কড়ে আট আনা পয়সা রয়েছে।' বখা বলে আপন মনে। —'কিছু মিষ্টি কিনব নাকি? বাবা জানতে

পারলে কিন্তু—' সে একটু ইতস্ততঃ করে। তারপর আপন মনে আবার বিড়বিড় ক'রে উঠে; 'জাহুক গে, ভারী তো একটা জীবন! ক'দিন বা বাঁচবো —কালকে যে পটল তুলবো না কে বলতে পারে? যতদিন বেঁচে আছ বাবা, আশা মিটিয়ে খেয়ে পরে নাও!' দূরে এক কোণে দাঁড়িয়ে সে দোকানটার দিকে তাকাল। যাচাই ক'রে নিল কিনবার মত সস্তা কোন খাবার আছে কিনা। রসগোল্লা, গোলাবজাম, লাড্ডু প্রভৃতি ভাল ভাল খাবারের উপর লুব্ধ, লোলুপ দৃষ্টি ফেলল সে। খাবারগুলো টুলবুল করছে রসের মধ্যে, দামও নিশ্চয় বেয়াড়া গোছের কিছু একটা হবে। ওসব কি আর তাদের জন্য? ময়রারাও ধাঙড় বা গরীব লোকদের দেখলেই চড়া দাম হেঁকে বসে। দোকান অপবিত্র করার খতিয়ানটা স্থদে আসলে আদায় ক'রে নিতে কসুর করে না। জিলিপির থালার উপর বধার চোখ গিয়ে পড়ল একসময়। সস্তা খাবার। এর আগেও সে কয়েকবার কিনেছে,— টাকা টাকা সের।

'চার আনার জিলিপি দাও তো দেখি,' বধা এগিয়ে এসে বলল চাপা গলায়। মাথাটা তাব ঝুলে পড়ল। মিষ্টি কিনতে এসেছে ভাবতেই কেমন যেন তার লজ্জা হল।

ময়রা ধাঙড়-বেটার পছন্দখানা দেখে একটু বুঝি মনে মনে হাসল। বাজে সস্তা খাবার হোল জিলিপি। বিশ্বপেটুক ছোটলোকগুলো ছাড়া চার আনার একগাদা জিলিপি আর কেউ কেনে না। কিন্তু সে হোল দোকানদার। ওনিয়ে মাথা ঘামিয়ে তার কাজ কি? দাঁড়ি পাল্লাটা হাতে তুলে নিল সে। তারপর একপো জিলিপি তাড়াতাড়ি মেপে পুরানো ছেঁড়া এক টুকরো ইংরেজী খবরের কাগজে মুড়ে ছুঁড়ে দিল বধার দিকে। ক্রিকেট বলের মত বধা দুহাতে ঠোঙাটা লুফে নিল। এক ঘটি জল দিয়ে জায়গাটা ধুয়ে দেবার জন্য ময়রার এক কর্মচারী ওখানটায় দাঁড়িয়ে ছিল। বধা তার পায়ের কাছে নিকেলের সিকিটি রেখে দিয়ে খুসি হ'য়ে বেরিয়ে এল।

জিভ দিয়ে তার জল ঝরছিল। কাগজের ঠোঙাটা খুলে গরম একখানা জিলিপি মুখে পুরে দিল। মনটা তার ভরে গেল পরম তৃপ্তিতে। পুরিয়াটা সে আবার খুলল। একগাল জিলিপি মুখে পোরার সত্যিই কি আনন্দ! পুরো আস্বাদটা বেশ উপভোগ করা যায়। একগাল জিলিপি চিবুতে চিবুতে তুমি হেঁটে চল চারিদিকে দেখতে দেখতে!

রাস্তার দুপাশে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সাইন্ বোর্ড। তাতে লেখা আছে বড় বড় হরফে ভারতীয় ব্যবসাদার, ডাক্তার, আইনজীবি প্রভৃতিদের নাম আর খেতাবের বহর। সাইন্ বোর্ডগুলো গড়গড় ক'রে পড়ে যেতে পারলেই বুঝি ভাল হত। থাক্‌গে—বখা নিজেকে আশ্বাস দেয়। আজ বিকেল থেকেই তো সে ইংরেজি পড়তে সুরু করবে। হঠাৎ তার চোখ গিয়ে পড়ল খোলা এক জানালার দিকে। মুক্ত বাতায়ন তলে বসেছিল একটি কুমারী মেয়ে। বখার চোখদুটি পড়ে রইল মেয়েটির উপর। সে হারিয়ে ফেলল নিজেকে।

'এই ছোটলোক, বেটা ঘাটের মরা! পথ চেয়ে হাঁটতে পারিসনে!' বখা চমকে উঠল। সহসা কে যেন খেঁকিয়ে উঠল তার কানের কাছে। —'এই পথ দিয়ে তুই যে আস্‌ছিস্ তা জানিয়ে আসতে পারিস নি, বেজন্মা শূয়োরের বাচ্চা কোথাকার! এই যে আমায় ছুঁয়ে দিলি, আমায় এখন নাইতে হবে না? আজ সকাল বেলার পাটের নতুন ধুতি আর সার্টটা পরলাম সবেমাত্র, সবটা এখন অশুচি হয়ে গেল!'

বখার গলাটা শুকিয়ে গেল। স্থানুর মত সে দাঁড়িয়ে রইল। মুখ দিয়ে কোন শব্দ বেরুল না। সর্বাঙ্গ যেন অসাড়, অবশ নিস্পন্দ হ'য়ে গেল। বুকটা খালি দুরু দুরু ক'রে কাঁপতে লাগল ভয়ে আর আতঙ্কে। ছোটোলোক, হীন দাসত্বের গ্লানিতে পঙ্কিল তার জীবন। জীবনে একটুকু মিষ্টি মোলায়েম কথা কোনদিন সে শোনেনি। একটানা রূঢ় ব্যবহারই পেয়ে এসেছে জীবন ভর। কিন্তু হঠাৎ এমন অপ্রস্তুত জীবনে সে হয়নি

কোনকালে। উঁচু জাতের কাউকে দেখলেই সবসময় মুখে তার এক বিনম্র শান্তের হাসি খেলে যায়। এক্ষেত্রেও তারব্য তিক্রম হোল না। বরং তা আরও ছাপিয়ে উঠল। সামনের লোকটার দিকে মুখ তুলে সে আড় চোখে একবার তাকাল। লোকটার চোখ দুটো দিয়ে যেন আগুনের ফুল্‌কি ছুটছে।

'ওরে পথের কুকুর, শূয়োরের বাচ্চা কোথাকার—তুই যে আসছিস চীৎকার ক'রে আগে থেকে আমায় হুঁশিয়ার ক'রে দিস্ নি কেন?' বধার মুখের দিকে তাকিয়ে সে রাগে ফেটে পড়ল।—'বেটা শালা, জানিস না, আমাকে তোর ছুঁতে নেই?'

বধা তাজ্জব বনে গেল। হাঁ ক'রে তাকিয়ে রইল সে। মুখে একটা কথাও জুটল না। ক্ষমা-ভিক্ষার উদ্দেশে হাত দুটো তার আপনা থেকেই কখন জড়ো হয়ে এল। হাত দুটো কপালে ঠেকিয়ে নত হ'য়ে সে বিড বিড় ক'রে কি যেন বলল কিন্তু লোকটা তা কানে তুলল না। ঘটনার আকস্মিকতায় সে ভয়ানক অভিভূত হয়ে পড়েছিল। সবটা গুছিয়ে নিয়ে উচ্চৈঃস্বরে পুনরাবৃত্তি করবার মত তার মনের অবস্থাও ছিল না। তার মিনতি ভরা নীরব বিনীত নিবেদনে লোকটা বুঝি তুষ্ট হোল না।

'শালা শূয়োর কোথাকাব, নোংরা কুত্তি কা বাচ্চি!' লোকটা ঘোঁৎ ঘোঁৎ ক'রে উঠল রাগে। মুখে কথাগুলো সব জড়িয়ে যেতে লাগল। —'আ-আ-মাকে···গি-গি-গিয়ে এক্ষুনি ···কা···কাপড় জামা সব···ধুয়ে দিতে হবে।·· কা-কাজে যাচ্ছিলাম···তুই শালা, আমার যত সব দেরী ক'রে দিলি।'

ব্যাপারখানা কি দেখবার জন্য একটা লোক পাশে এসে দাঁড়াল। পরনে তার শাদা ধব্‌ধবে কাপড় চোপড়। ধনী হিন্দু সওদাগর বলেই মনে হয়। ওকে দেখে ক্ষুব্ধ লোকটা সাপের মত ফোঁস ক'রে উঠল:

'দেখলেন—দেখলেন ত মশাই, বেটা শালা কেমন এসে পড়ল ঘাড়ের

শুয়ার! এসব স্ফূর্তির বাচ্চাগুলো যেন পথ চলে অন্ধের মত। নিজেদের আসার খবরটা যেন জানিয়ে দিতে পারে না শূয়োরগুলো!'

হাতদুটো জোড় ক'রে বধা স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। কপাল বেয়ে তার টস্‌টস্‌ ক'রে ঘাম পড়তে লাগল।

সঙ্‌ দেখবার জন্য জনকয়েক পথচারী এসে জড়ো হোল ওখানটায়। দেখতে দেখতে চারিদিকে ভিড় জমে গেল। নানা টীকা টিপ্পনী কেটে ওরা ক্ষুব্ধ বিচলিত লোকটাকে আরও উস্‌কাতে লাগল। ভারতবর্ষের রাস্তাঘাটে কনস্টবলদের লাল পাগ্‌ড়ির সাক্ষাৎ মেলে কালেভদ্রে। অসাধু ঘুষখোর বলে ওদের আবার বদনামও আছে। হবেই না বা কেন! রাজ্যের যতসব ঘাগী চোর জুয়াচোর পাঁড় বদমাসদের নিয়েই গড়ে তোলা হয় কনস্টবল বাহিনী। যেন ঠিক চোর দিয়ে চোর ধরার নীতি! সুতরাং লোকজনকে হঠিয়ে দেবার জন্য কোন কনস্টবলের টিকি দেখা গেল না। বেচারী বধা ইতিমধ্যেই আধমরা গোছের হয়ে পড়েছিল। চারিদিকে ভিড় দেখে ওর অবস্থা হয়ে উঠল আরও শোচনীয়। বুকের স্পন্দন বুঝি গেল থেমে। দুহাতে জনতার ভিড় ঠেলে অকুস্থান থেকে দূরে—বহুদূরে ছুটে পালিয়ে যেতে তার ইচ্ছে হোল। কিন্তু পরক্ষণেই সে বুঝতে পারল, তাকে ঘিরে ধরেছে সবাই। পালাবার পথ তার রুদ্ধ। ইচ্ছে করলে অবশ্য গায়ের জোরে সে পালিয়ে যেতে পারে। ঐ ত মোটা হোঁৎকা ভুঁড়িওয়ালা ব্যবসাদারটি—এক ধাক্কাতেই ওকে সে চিৎপটাং ক'রে ফেলতে পারে মাটিতে। কিন্তু তা করবার যে উপায় নেই। আছে নৈতিক বাধ্যবাধকতার নাগ পাশ। সে জানে ওদের গায়ে হাত দিলেই একাধিক লোককে করা হবে অপবিত্র-কলুষিত। ইতিমধ্যেই দুর্ভোগের চরম একশেষ। গালমন্দ তার কপালে কি কম জুটেছে?

'আর বলো না ভাই, দিন দিন দুনিয়ার হালচাল যা হচ্ছে! বেটা শুয়ারগুলোর যেন উইপোকার মত ডানা গজিয়েছে পাছায়!' ভিড়ের ভেতর

থেকে বেঁটে এক বুড়ো বলে উঠল মুখ বাড়িয়ে।—'ও বেটারই এক জাতভাই আমার বাড়ীর পায়খানাটা একবাব সাফ ক'রে দেয়। হারামজাদা এখন বলে কিনা, মাসে এক টাকায় তার পোষাচ্ছে না। দু'টাকা ক'রে দিতে হবে। শুধু কি তাই মশাই, রোজ রোজ বেটার খাবারও চাই!'

'শালা যেন লাটসাহেব—চলাফেরা করে যেন লাফ্‌টাণ্ট গর্ণর!' ক্ষুব্ধ লোকটা রাগে এবার ঘোঁৎঘোঁৎ করতে লাগল।—'দেখছেন তো মশাই, দিনকাল সব কি হচ্ছে!'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, তা আর দেখছিনে।' আর এক বুড়ো ফোড়ন দিয়ে ওঠে; —'কলি যুগ কলিযুগ মশাই, ঘোর কলি!'

ক্রুদ্ধ বিক্ষুব্ধ লোকটার গায়ের জ্বালা তখনও বুঝি মেটেনি। সে আবার চীৎকার ক'রে উঠলে;

'গোটা রাস্তাটা যেন ওরই, শালা কুত্তার বাচ্চা কোথাকার।'

ভিড় দেখে গোটাকয়েক ছোক্‌রা এসে জড়ো হয়েছিল। লোকের হাঁটু গলিয়ে এবার এগিয়ে এল ওরা সামনে। ছড়া কেটে চীৎকার ক'রে বলে উঠল: 'ওরে, কুত্তার বাচ্চা! তুই না সেদিন আমাদের ঠেঙিয়েছিলি? কেমন, সাজা হচ্ছে রে এখন?'

'শুনলেন, শুনলেন তো মশাই, আপনারা সবাই শুনলেন তো?' লোকটা আবার বলে উঠল।—'ও শালা দেখছি আচ্ছা বদ্‌মাস্! পাড়ার ছোট ছোট ছেলে-পিলেদের ধরে পর্যন্ত ঠ্যাঙায়।'

বখা ঘাড় গুঁজে এককোণে দাঁড়িয়ে ছিল। ছোক্‌রাগুলোর বানানো অভিযোগে নির্দোষ অন্তরাত্মাটি তার বিদ্রোহী হয়ে উঠল। একান্ত আত্মরক্ষায় কিন্তু মুখ তুলে সে ছোকরাগুলোকে শুধালে:

'আমি আপনাদের কখন মারলাম দাদাবাবু?'

'বেটার আস্পর্ধাটা দেখলেন তো আপনারা? স্বচক্ষে দেখলেন তো? ওদের মেরে এখন আবার মিথ্যে কথা বলা হচ্ছে!' লোকটা আবার চীৎকার ক'রে উঠল।

'না লালাজী, আমি ওঁদের কক্ষনো মারিনি—মারিনি কক্ষনো।' বথা মিনতি ভরা কণ্ঠে জানাল।—'সত্যি আমার ঘাট হয়েছে। হাঁক ছাড়তে ভুলে গিয়েছিলাম, লালাজী। আমার অপরাধ ক্ষমা করেন। মনে ছিল না লালাজী। আর অমনটি হবে না। আমায় ক্ষমা করেন। আর কখনোই এমন ধারা করবো না, বাবু মশায়!'

কিন্তু বথার কাকুতি মিনতি সমবেত জনতার বুকে এতটুকু করুণার রেখাপাত করলো না। লালাজীর হাতে ধাঙড়দের ছেলেটার একান্ত দুর্ভোগ ওরা পরম কৌতূহলের সঙ্গে উপভোগ করতে লাগল। আর যারা ভিড়ের মধ্যে চুপ ক'রে ছিল, তাদের মনটা বিষিয়ে উঠল যারা এতক্ষণ সমানে গলা বাজিয়ে হাঁকাহাঁকি করছিল তাদের বিরুদ্ধে। নিজেরাও কিছু বলবার জন্য আঁকুপাঁকু করতে লাগল।

বথার দুঃখ দুর্দশার মহা-অমানিশার রাত্রি যেন আর কিছুতেই কাটতে চায় না। তার সমস্ত অন্তরাত্মা পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে নম্র-নত দীনতায়। তার পা দুটো কাঁপতে থাকে থর থর ক'রে। হাঁটুর খিলানটা এক্ষুনি বুঝি ভেঙ্গে পড়বে। অনুতাপে তার বুকটা ছেয়ে গেল। সে তার উৎপীড়কদের সমঝিয়ে দেবার চেষ্টা করল। কিন্তু ওরা তাতে কান দিল না। সমানে চীৎকার ক'রে চলল:

'যত সব দায়িত্বহীন অসাবধান বেটা!'

'কাজকর্ম কিছু করবে না, কুঁড়ের বাদশা!'

'শালাদের মেরে একেবারে দুনিয়া থেকে লোপাট করা উচিত হে।'

বথার ভাগ্য ভালোই বলতে হবে। এক টোঙাওয়ালা তার ঝরঝরে খড়খড়ে টাঙা হাকিয়ে এসে পড়ল ঘটনাস্থলে। আর একটু হলে হয়তো একটা দুর্ঘটনাই ঘটে বসত। টোঙাওয়ালা তার হাড্ডিসার ঘোড়ার লাগামটা দুহাতে কষে ধরে চীৎকার ক'রে উঠলে;

'হট্ যাও, হট্ যাও!'

দেখতে না দেখতে ভিড় পাতলা হয়ে গেল। যে যেখানে পারে গিয়ে নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নিল। লালার রাগ তখনও জল হয়নি। সে তার চার ফুট দশ ইঞ্চি লম্বা শরীর খানা নিয়ে আগে যেখানটায় ছিল সেখানেই খাড়া দাঁড়িয়ে রইল। টোঙাওয়ালাকে জোরে হাঁকিয়ে আসতে দেখেও নড়ল না এক পা।

'ও লালাজী—লালাজী, হুঁশিয়ার!' টোঙাওয়ালা বাজখাঁই গলায় হেঁকে উঠল। লালা কট্‌মট্‌ ক'রে তাকাল ওর দিকে। হাত তুলে ওকে ইঙ্গিত করল টাঙা থামাতে।

'অমন ক'রে চোখ রাঙাবেন না, বাবু মশায়!' টোঙাওয়ালা যেন কথাটা ছুঁড়ে মারল। সে তার গাড়ীখানা হাঁকিয়ে দিচ্ছিল। হঠাৎ কি মনে ক'রে লাগামটা টেনে ধরল সজোরে।

'শালা, আমাকে যখন ছুঁয়ে দিয়েছিস্ নাইতেই যখন হবে, শালা তবে দাঁড়া'—টোঙাওয়ালা শুনতে পেল লালা বখাকে বক্‌ছে। 'অসাবধান হয়ে অন্ধের মত পথ চলার মজাটা দেখিয়ে দিচ্ছি শূয়োরের বাচ্চা কোথাকার!' ঠাস্ ক'রে প্রচণ্ড একটা চড়ের শব্দ ভেসে এল টোঙাওয়ালার কানে। বখার মাথার পাগ্‌ড়িটা মাটীতে লুটিয়ে পড়ল। কাগজের ঠোঙাশুদ্ধ জিলিপিগুলি হাত থেকে ছিট্‌কে প'ড়ে গড়াগড়ি খেতে লাগল ধূলোয়। ভয় বিহ্বল চোখ দুটি তুলে সে দাঁড়িয়ে রইল। পরক্ষণেই সর্বশরীর রাগে রি রি ক'রে উঠল। সে আর দাঁড়াল না হাতদুটো জোড় ক'রে। চোখ দুটো তার ঝাপসা হয়ে এল জলে। চিবুক বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ল টস্‌টস্ ক'রে। চোখ দুটি প্রতিশোধের আগুনে দপ্ ক'রে জলে উঠল। সমস্ত শরীরটা রাগ, ক্ষোভ, নিদারুণ অপমানে কেঁপে উঠল থর্‌থর ক'রে। মুহূর্তের মধ্যেই সব দীনতার বাঁধ ভেঙ্গে পড়ল যেন খান্ খান্ হয়ে। সে হয়ত আর আত্মসংবরণ করতে পারত না যদি না লোকটা একসময় সরে পড়ত। রাস্তায় লোকটার টিকিটিও আর দেখা গেল না।

'যেতে দে, যেতে দে, ভাই, কিছু মনে করিসনে। মাথার পাগড়িটা তুই বেঁধে নে।' টোঙ্গাওয়ালা বলে উঠল সান্ত্বনার স্বরে। মুসলমান সে, গোঁড়া হিন্দুদের কাছে সেও অস্পৃশ্য—অচ্ছুৎ। তাই বুঝি নিজেও কিছু পরিমাণে অচ্ছুৎদের ব্যথায় সমব্যথী।

বথা তার হাতের ঝুড়ি আর ঝাড়ুগাছটা পাশে নামিয়ে রেখে মাথার পাগড়িটা কোন রকমে নিল পেচিঁয়ে। তারপব চোখের জলটা মুছে ঝাড়ু আর ঝুড়িটা আবার কুডিয়ে নিয়ে হাঁটতে শুরু কবল।

'ঠিক সাজা এখনো তোর হয়নি দেখছি! তাই যদি হোত এবার থেকে চলবাব সময় হাঁক দিয়েই যাবি, বেজন্মা কোথাকাব।' পাশ থেকে এক দোকানদার বলে উঠল। বথা চম্‌কে ওঠে। সবাই বুঝি হাঁ ক'রে চেয়ে আছে তার দিকে। দোকানদারের ভৎর্সনাটা সে নীববে হজম ক'বে পা চালিয়ে চলে এল ওখান থেকে। কিছুদূবে এসেই চলাব গতিটা তার আপনা থেকেই মন্থর হয়ে এল। নিজেব অজ্ঞাতে সে কখন হেঁকে ওঠে;

'হৈ হৈ, হট্ যাও—হট্ যাও, ধাঙ্গড আসছে! হৈ হৈ, হট্ যাও—হট্ যাও, ধাঙ্গড আসছে! হৈ হৈ, ধাঙ্গড় আসছে।'

ব্যর্থ রাগ ও অপমানেব বিষানলে তার অন্তবটি বুঝি ধূমায়িত হয়ে উঠল। তুষের আগুনের মত তাব ভিতরটা জ্বলতে থাকে। রাস্তার চরম দুর্ভোগের কথাটা মনে পড়তেই আগুনটা দপ্ ক'বে আবাবজ্বলে ওঠে পঙ্গু অথর্ব আক্রোশে। অনুতাপে বুকটা তাব ছেয়ে যায়। আগাগোড়া সমস্ত ঘটনাটি তার মনের পর্দায় ভেসে ওঠে। কিলবিল ক'বে খেলে যায় ক্রুদ্ধ লালার অস্পষ্ট মুখের ছবিটা: চোখ দুটোতে যেন আগুন ঠিকবে পডছে। রোগা, বেঁটে-খাটো শরীর, ভাঙ্গা মুখ, শুক্‌নো পাতলা ঠোঁট। সকলের সামনে দাঁড়িয়ে সমানে হাত পা নেড়ে হকার বকার গালাগাল ক'রে চলেছে। পেছনে তার অস্পষ্ট লেপা মোছা অনেকগুলো মুখ ওকে ঘিবে ধরে গাল-মন্দ হাঁকা-হাঁকি ক'রে চলেছে। আর সে ঘাড় গুঁজে দাঁড়িয়ে আছে অবাক, নিস্পন্দ, প্রচণ্ড এক

আবেগ বন্যায় উদ্বেলিত হয়ে। 'কেন অত শত ঝামেলা—বিশ্রী যতসব ঝঞ্ঝাট? আমার অমন অবনত হয়ে থাকবারই বা কি দরকার ছিল?' বখা শুধায় নিজেকে; —'আমি ওকে এক ঘা বসিয়ে দিলাম না কেন? সকাল বেলা যদি শহরে আসতেই হলো, হাঁক ছেড়ে হুঁশিয়ার ক'রে দিলাম না কেন রাস্তার লোকজনকে। অমন খামখেয়ালী হয়ে পথ চলারই বা কি দরকার ছিল? সরকারী বড় রাস্তা ধরে না চললেই তো পারতাম। চলেছি—চলেছি তো যেন অন্ধের মত। জাত হিন্দুরা যে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে, যেন চোখ নেই—দেখতে পাই নি!' বখা নিজেকে প্রবোধ দিল আপন মনে। 'কিন্তু ঐ লোকটা, উঃ, কি চড়টাই না মারলে!' বখা আবার ভাবে। 'আহা, অমন জিলিপি কটা আর খাওয়াই হলো না। সবটা পড়ে গেল মাটীতে। আচ্ছা, মুখে আমার কি হয়েছিল? কোন প্রতিবাদই করা হোল না। হাতে পায়ে ধরে মাপটাও তো চেয়ে নিতে পারতাম?...উঃ, গালে কি চড়টাই না বসিয়ে দিলে! তারপরেই! কুকুরের মত ল্যাজ গুটিয়ে পালিয়ে গেল! ভীরু কোথাকার...আর সেই ছোক্‌রাটা কি মিথ্যে কথাটাই বললে। মিথ্যেবাদী কোথাকার!' বখা বিড়বিড় ক'রে উঠল—'কোনদিন দেখি না শালাকে। আমাকে সবাই বাগে পেল কিনা তাই। কত লোক মজা দেখতে ছুটে এল। কেউ একটি কথা পর্যন্ত বলল না আমার হয়ে। সবাই সমানে ক'রে গালাগালি গেল। নিষ্ঠুর সব!'...

তা, গালমন্দ তো হামেশা লেগেই আছে আমাদের কপালে। সাস্ত্রী ইন্‌সপেক্টর আর বড় সাহেব কি গালটাই না দিলে সেদিন বাবাকে। সব সময় ওরা গালমন্দ করে। আমরা ধাঙড, গু-মুত ওদের সাফ করি—ধাঙড় কিনা—তাই বুঝি! সারাদিন মাথার ঘাম পায়ে ফেলে বাবুদের নোংরা ময়লা পরিষ্কার করি কিনা, তাই বুঝি ওরা আমাদের ছোঁয় না। টাঙাওয়ালা-টার কিন্তু দয়া-মায়ার শরীর। ওর কথায় আমি তো প্রায় কেঁদে ফেলেছিলাম। কিন্তু ওরা তো মুসলমান। ওরা তবু আমাদের ছুঁতে ইতস্তত করে না।

সাহেবরাও না। খালি হিন্দুরা আর ধাঙড় ছাড়া বাদ বাকী আব সব ছোট লোকেরাই মনে করে আমাদের ছুঁয়ে মহাভারত বুঝি অশুদ্ধ হয়ে গেল। ওদের কাছে আমি হলাম শুধু একটা ধাঙড়—অচ্ছুৎ মেথর—অস্পৃশ্য অশুচি!'

অমানিশার বুক চিরে সহসা যেন এক ঝলক বিদ্যুতের আলোক-বান খেলে গেল। তার অন্তবেব গোপন কন্দরটি পর্যন্ত উদ্ভাসিত প্রবুদ্ধ হয়ে উঠল সেই আলোকের মুখে। আপন সত্তা—আপনার পাবিপার্শ্বিক বিশ্বলোক সম্পর্কে বথা হয়ে উঠল আত্মসচেতন। আগাগোড়া সে নিজেব জীবনটাকে তলিয়ে দেখল। উত্তর খুঁজে পেল তাব মনেব আনাচে-কানাচে ঘুরে-বেড়ান সকল প্রচ্ছন্ন প্রশ্নের। এতদিন সে যেন ছিল ঘুমিয়ে। বোধ-শক্তি ছিল তাব জড, আড়ষ্ট। ঘুম আজ যেন তাব ভাঙল। চোখ তাব খুলে গেল। বুঝতে তার আর বাকী রইল না টাট্টিখানাগুলো সাফ নেই বলে কেন লোকগুলো অকারণ রোজ রোজ খিচ্‌খিচ্‌ করতে থাকে, অচ্ছুৎ বস্তির অপর বাসিন্দারাও বা কেন তাদের দেখে সহসা নাক সিট্‌কিয়ে ওঠে। আজ সকালেই বা কেন জনতাব হাতে তাকে পোহাতে হোল অমন দুর্ভোগ। সবটাই এখন তার চোখে পরিষ্কার হয়ে গেল জলের মত। সহসা তার শিরদাড়া বেয়ে অনুভূতির এক হিমেল তরঙ্গ স্রোত যেন খেলে গেল। সর্বাঙ্গ তার উঠল শিউরে। উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার ক'রে তার বলে উঠতে ইচ্ছে হোল: 'আমি অচ্ছুৎ, আমি হলাম অচ্ছুৎ—অশুচি—অস্পৃশ্য!' আপন মনে সে বিড়বিড় ক'রে উঠল। ভয় হোল, কি জানি সে যদি আবার ভুলে যায় কথাটা, আবাব যদি অন্ধকারে হারিয়ে ফেলে নিজের প্রবুদ্ধ চেতনাকে···সহসা তার যেন চমক ভাঙল। সর্বনাশ! রাস্তা দিয়ে চলবার সময় হাঁক ছাডতে যে সে ভুলে গেছে। পরক্ষণেই গলা ছেড়ে সে হেঁকে উঠল; 'হৈ হৈ, হট্ যাও, হট্‌ যাও, ধাঙড় আসছে!' মুখে 'হট যাও, হট্‌ যাও, ধাঙড় আসছে' চীৎকার করলেও অন্তরাত্মাটি কিন্তু তার অনুরণন তুলল: 'অচ্ছুৎ-অচ্ছুৎ—অস্পৃশ্য—অশুচি!' সে জানে না কখন তার চলার গতি

দ্রুততালে বেজে গেছে।' জোড় কদমে হেঁটে চলেছে সে একদল ফৌজের মত। পায়ে ভারী সামরিক বুটের শব্দ হোতেই সম্বিৎ সে ফিরে পেল। চলার গতিটা কমিয়ে দিল।

হঠাৎ তার খেয়াল হলো রাস্তার লোকগুলো যেন তাকিয়ে আছে তার দিকে হাঁ করে। সঙ্ না ভূত! সে নিজের উপর চোখ দুটো একবার বুলিয়ে নিল। তাই তো, মাথার পাগড়িটা যে কখন খসে পড়েছে কপালের উপর। পাগড়িটা আবার ঠিক ক'রে বেঁধে না নিলে নয়। কিন্তু রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে সে পাগড়ি বাঁধে কি ক'রে?

বুকের মধ্যে তার এতক্ষণ প্রচণ্ড এক ঝড় বইছিল। তার সমস্ত ইন্দ্রিয় যেন অভিভূত হয়ে পড়েছিল ঝড়ের সে মূর্চ্ছনায়। পাগড়ি বাঁধতে রাস্তার একপাশে এসে তার মনটা অনেকটা হাল্কা হয়ে এল। চোখ দুটি গেল জুড়িয়ে। চারিদিকে বিচিত্র ঝল্মল্ করা ব্যস্ত মুখর দৃশ্য··· পাশেই তার বিপুল দেহের একটা বুড়ো ধর্মের-ষাঁড। ছোট ছোট সিং; গায়ে চিত্র বিচিত্র চিহ্ন। চোখ বুঁজে বুঁজে জাবর কাটছে আব মাঝে মাঝে বিশ্রী টোঁয়া ঢেকুর তুলছে। কি বিশ্রী দুর্গন্ধ! বথা নাক সিটকাল। বুড়ো ষাঁড়টার গোবরে জায়গাটা নোংরা হয়ে রয়েছে। ওখানটা তাকে পরিষ্কার করতে হবে ভাবতেই বথার গায়ে যেন জ্বর এলো। ঠিক এমন সময় কোথা থেকে বুড়ো মত একটা লোক এসে হাজির হলো। পরনে শাদা ধব্ধবে কাপড-চোপড়। বাঁ কাধের উপর একখানা পাতলা মস্‌লিন চাদর। বড়লোক বলেই মনে হয়। সে তার তর্জনীটা দিবানিদ্রারত বৃষভ পুঙ্গবের বিপুল দেহে স্পর্শ করল। হিন্দুদের রেওয়াজ ঐ, এ কথা বথা জানত। ষাঁড় দেখলে স্পর্শ করতেই হবে। স্পর্শ কেন করতে হবে অবশ্য জানে না সে। শহরের পথে ঘাটে কতদিন সে দেখেছে ধর্মের ওই ষাঁড়গুলো এদিক ওদিক ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ এসে উপস্থিত হলো শাকসজীর দোকানগুলোর সামনে। শুঁকতে শুঁকতে এক সময় কখন একটা বাধাকপি অথবা কোনদিন বা

এক গুচ্ছ গাজর মুখে ক'রে পালাল। দোকানী হয়ত তখন তেড়ে এলো, বৃষভ পুঙ্গব পেছনে হটে গিয়ে পরম নির্বিবাদে চিবুতে থাকে আত্মসাৎ করা শাকসব্জীগুলো। দোকানীর তর্জন গর্জনে ভ্রূক্ষেপ মাত্রও করে না। ওর অন্যমনস্কতার সুযোগ পেলেই নতুন দফা আক্রমণ করতে কসুর করে না।

'আচ্ছা, এ কেমন ধরণের কথা, হিন্দুরা তাদের গরুগুলোকে কি খাওয়াতে পারে না? এ দিকে তো 'মা' বলে ডাকতে পারে ভক্তি-ছেদ্দার বাহার দেখিয়ে!' বখা ভাবে।—'পরম দেবতা গরুগুলোর চেহারা কি এক একটা! হাড্ডি চর্মসার শরীর। নদীর ধারে চরতে এসে চোয়াল দিয়ে ঘাস ছিঁড়ে খেতে পর্যন্ত পারে না। দিনে দু সেরের বেশী দুধও কোনটা দেয় না।'...তার মনে পড়ে, এক ধনী হিন্দু সওদাগর তার বাপকে একবার একটা মোষ দান করেছিল কুসংস্কারের বশবর্তী হয়েই বোধ হয়। ধনী সওদাগরটির অনেকদিন থেকে ছেলে-পিলে হচ্ছিল না। বামুন পণ্ডিতেরা ওকে তাই ধাঙড়দের গো-দান করতে উপদেশ দিয়েছিল। দানের মোষটাকে রোজ দুবেলা সে পেট ভরে দানা-ভূষি খাওয়াত। মোষটা শেষকালে দিনে বার সের ক'রে দুধ দিত। আর এরা নিজেদের গরু-বাছুরের সামনে একমুঠো ভূষি পর্যন্ত ছিটিয়ে দেয় না। বড় জোর দেয় খানিকটা ভাতের ফেন। তবু গরু-বাছুরের প্রতি ভক্তি-ছেদ্দার বাহার কি? তাই তো ওরা পরের পেঁয়াজ-ক্ষেতের দিকে রোজ ছুটে। মুখে কি পেঁয়াজের গন্ধ রে! আজও নিশ্চয় ঢুকেছিল পরের পেঁয়াজ-ক্ষেতে।

বখা এতক্ষণ আপনার গণ্ডীতেই আবদ্ধ ছিল। পারিপার্শ্বিক পরিবেশের কথা সে এক রকম ভুলেই গিয়েছিল। শালগম আর গাজর-ভর্তি এক গরুর গাড়ী ওখানটায় এনে ঢেলে দেওয়া হোল। বখা তাড়াতাড়ি কয়েক পা পিছু হঠে না এলে ঝুড়ি ভর্তি পচা দুর্গন্ধ শাক সব্জীর পাহাড়ের নীচে সে চাপাই পড়তো। পচা পুতিগন্ধ শালগম আর গাজরের ঝুড়ির দিকে সে নিষ্পলক তাকিয়ে রইল। কি বিরাট অপচয়! বোঁটকা গন্ধটা নাকে আসতেই

বথা পা চালিয়ে চলে এল ওখান থেকে। বাজারের ভিড় আর গরমে সে রীতিমতো ঘেমে নেয়ে উঠল। তার সহজ সরল প্রশস্ত মুখে আর সুশ্রী সুডৌল ঠোঁটে সব সময় যে হাসির ছটা লেগে থাকতো আজ সেটা ম্রিয়মাণ, গম্ভীর উদাসীন বলে যেন মনে হোল। আগেকার সেই সজীব প্রাণস্পন্দন যেন আর নেই।

'হৈ-হৈ, হট যাও—হট যাও, ধাঙড় আসছে!'

বথা আবার হাঁটতে সুরু করল। জনাকীর্ণ প্রশস্ত রাজপথ ছেড়ে সে নিল এক অপ্রশস্ত নতুন সড়ক। সড়কটার এখানে ওখানে খানকয়েক স্থানীয় ব্যাণ্ড বাজিয়েদের দোকান। অবসরপ্রাপ্ত কোন কোন সামরিক ব্যাণ্ড-মাষ্টারের নেতৃত্বে ওরা বিলেতি বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে থাকে। বিয়ে সাদিতে কিংবা লোকের ছেলেপিলের জন্মোৎসব উপলক্ষে ওরা ব্যাণ্ড বাজায়। চাহিদাও খুব। রাস্তাটার এক জায়গায় একটা মুদির দোকান। আর মোড়টায় রয়েছে এক পানের দোকান। আধুনিক কয়েকটা ময়দার কলও আছে। খুঁৎখুঁতে বুড়ীরা সব মোটা আটার জন্য ঐ মিলটায় ছোটে। দোকানের ময়দা ওরা নাকি হজম করতে পারে না। খরচা কমানোর জন্য পাইকারী দরে গম কিনে তারপর ভাঙিয়ে আনবার জন্যও কেউ কেউ ছোটে ওখানে। রাস্তাটার এক কোণে পুরানো ধরনের একটা শস্যের তেলের ঘানিও রয়েছে। একটা প্রকাণ্ড অন্ধকার ঘরের মধ্যে চোখ বাঁধা কলুর বলদগুলো একটানা ঘুরে ঘুরে ঘানি টানছে। ছোট বেলা থেকেই বথা এই পথ দিয়ে যাওয়া আসা করছে। অবিকল ব্যারাকের মত এই পরিবেশটা তার বড়ই ভাল লাগত। বিলেতি বাদ্যযন্ত্রগুলো—বিশেষ ক'রে জাহাঙ্গীরের ব্যাণ্ডের দোকানে স্তরে স্তরে সাজানো সোনালী কাজ করা পোষাক-পরিচ্ছদগুলো তার ইংরেজ অনুকরণপ্রিয় মনকে বিশেষ ক'রে দিত নাড়া। জাহাঙ্গীরই ছিল শহরের সেরা ব্যাণ্ড-বাজিয়ে দোকানের মালিক। সড়কটা আগের চাইতে অনেকটা শান্ত শিষ্ট, নিড়িবিলি

যে কটা দোকান আছে পথচারীকে তারা প্রলুব্ধ করে না। আশেপাশে বেশ প্রশান্ত নিবিড় পরিবেশ।

বথা সহসা গম্ভীর হ'য়ে ওঠে। জাহাঙ্গীরের দোকানে বিলেতি বাদ্যযন্ত্রগুলো আর সোনালী কাজ করা পোষাকগুলো দেখে তার আটত্রিশ নম্বর ডোগবা সামরিক ব্যাণ্ড-বাজিয়েদেব কথা মনে পড়ে যায়। ডোগরা সৈন্যগুলো প্রায় প্রত্যেকদিন ব্যাণ্ড বাজিয়ে কুচ্ কাওয়াজ করতে যেত। পুরানো স্মৃতিটা মনে পড়তেই বথাব বুকটা গেল জুড়িয়ে। মান-অভিমান—সকালবেলাকার সব অপমান দুর্ভোগেব কথা নিঃশেষে কখন মুছে গেল যেন তার বুক থেকে।

মোড়েব বাড়ীটাকে বাঁয়ে রেখে নির্জন রাস্তা ছেড়ে সে এগিয়ে চললো। সামনে কয়েক সার সস্তা অলঙ্কারের দোকানপাতি। নিকেলের উপর চক্চকে রূপোলি ইলেকট্রোপ্লেট কাজ করা হয় এই দোকানগুলোতে। ছোটো বয়সে বথা মার মতো রূপোর অলঙ্কার পববার জন্য আবদার কবতো। বায়না ধবতো হাতের আংটি কিনে দিতে। কিন্তু বড় হয়ে বৃটিশ ব্যারাকে গিয়ে সে দেখেছে সাহেবেবা অলঙ্কার পরতে ভালবাসে না। তার মনটি তাই সূক্ষ্ম কাজ করা দেশী অলঙ্কাবগুলোব প্রতি বিতৃষ্ণায় ভবে উঠেছে। অলঙ্কারের দোকানের নীল কাগজের উপর ঝুলিয়ে বাখা বড় বড় কানপাশা, নাকছবি ও সোনালী কাজ করা চুলেব কাঁটা গুলোব দিকে বথা চোখ তুলেও তাকাল না। একটা বাক্সের উপর নানান রকমেব ছিট কাপড় সাজিয়ে এক মুসলমান ফেবিওয়ালা শাদা থান পবা কয়েকজন হিন্দু বিধবার সঙ্গে বিস্তব দরাদরি করছে রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে। ওকে দেখে ওরা পথ ছেড়ে দেয় কিনা দেখবার জন্য মিনিটক য়েক অপেক্ষা করল। সে হাঁপিয়ে পড়েছিল। হাঁক ছাড়তে তার আর ইচ্ছে হচ্ছিল না। পাশে এক পাঞ্জাবী শিখের ছবি বাঁধানোর দোকান। দোকানদার জার্মানীর ছাপা

সস্তা হিন্দু দেব-দেবীর ছবির উপর কাচের ফ্রেম বাঁধছে। দোকানের দেয়ালে এক বিবসনা ইংরেজ চিত্র-তারকার ছবিও ঝুলছে। হাতে তার একটি ফুল। বথার চোখ দুটো তার উপরই পড়ে রইল। ভুলে গেল সে ঠাকুর দেবতার ফটোর কথা। শিখটা বথার হাতের ঝুড়ি ও ঝাড়ু গাছটার সেদিকে কট্‌মট্‌ ক'রে তাকাল। খেঁকিয়ে উঠে ওখান থেকে ওকে সরে যেতে বলল। বথা চমকে উঠে তাকালে মুখ তুলে। তারপর বথা হেঁকে উঠল: 'হৈ হৈ, হট্‌ যাও, হট্‌ যাও, ধাঙড আসছে।' মুসলমান ফেরিওয়ালাটা তখনও তার সেই খদ্দেরগুলোর সঙ্গে দর-দস্তুর নিয়ে ব্যস্ত। কাপড়টা ওদের হাত থেকে উদ্ধার করতে পারলেই যেন বর্তে যায় সে। অচ্ছুতের আগমন বার্তাটা সে ওদের জানাবার ফুরসতই পেল না। থান পরা বিধবাগুলোর কাছ থেকে সে এক সময় ছিট কাপড়াটা ছিনিয়ে নিল। বথার সামনে গিয়ে ওরা ফিস্‌ফাস্‌, উঃ আঃ, নানান্‌ চীৎকার করতে করতে সরে পড়ল। তারপর গিয়ে জড়ো হল ওরা বালা ও মলের দোকানগুলোর সামনে। বেনারসী শাড়ী ও সোনালী কাজ করা সিল্কের জামা পরে নূতন কনে-বৌরা মা বা শাশুড়ীর পিছু পিছু ভীরু সলজ্জ পা ফেলে মন্দিরের দিকে চলেছে। মল বিক্রেতারা তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য ঘণ্টা বাজিয়ে চলল। বথা মন্দিরের দিকে যাচ্ছিল। অনেকটা ক্লান্ত অবসন্ন কণ্ঠে হাঁক ছাড়লে: 'হৈ হৈ—হৈ হৈ, হট্‌ যাও—হট্‌ যাও, ধাঙড় আসছে।'

অবশেষে ওকে ওরা রাস্তা ছেড়ে দিল।

সামনেই এক বিশাল দেবালয় নানা সূক্ষ্ম কারু-কাজ-করা তার বিপুল গম্বুজ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে মাথা তুলে। চোখ তুলে তাকালে মনটা ছেয়ে যায় কেমন একটা ভয়াল বিস্ময়ে। ছোটবেলা থেকেই দশ হস্ত, দ্বাদশ মস্তক নানান দেবদেবী দেখলেই বথার সর্বাঙ্গ ওঠে ছম ছম ক'রে। মাথা নুয়ে পড়ে শ্রদ্ধা আর ভক্তি ভরে।...প্রকাণ্ড মন্দিরটার কার্নিসে গুটি কয়েক

.মেঘ-রঙা পায়রা উড়ে এসে বসল। পাতলা নীল রঙের পায়রাগুলোকে দেখে আর তাদের বক-বকামি শুনতে শুনতে রথার মনের সব উত্তাপ গেল মুছে। নাট-মন্দিরের এখানে ওখানে ফুল, বেলপাতা আর চাপচাপ ধুলো জমে উঠেছে। জঞ্জালটা আগে কিন্তু পরিষ্কার করতে হবে।

ঝুড়ি ও ঝাড়গাছটা সে মাটিতে নামিয়ে রাখল। ঝাঁকরা মাথা প্রকাণ্ড একটা বটগাছ মন্দির প্রাঙ্গনের উপর ঘন ডালপালা বিস্তার ক'রে দাঁড়িয়ে ছিল। রথা তার নীচে এসে কোমরের কাপড়টা কষে বেঁধে নিলে। কাজে এবার লাগতে হবে। বটগাছটার প্রকাণ্ড গুড়িঁর এক জায়গায় পাথরের একটা ছোট মতো বেদীর উপর খুদে একটা মন্দির। আর সেই মন্দিরের মধ্যে পেতলের মঞ্চের উপর রয়েছে মসৃণ পাথরের একটি সর্প মূর্তি। রথার দৃষ্টিটা সাপের মূর্তিটার উপর গিয়ে পড়ল।

'একি, সাপের মূর্তি কেন?' রথা এক সময় শুধাল নিজেকে—'ব্যাপার-খানা কি? গাছের গোড়ায় কোনখানে হয়ত সাপ খোপ আছে। সে নিজেকে প্রবোধ দিল। তারপর সঙ্গে সঙ্গেই যেন ভয় পেয়ে পিছিয়ে এল। ...বটগাছটার নীচে খুদে মন্দিরটার বেদীতে একবার মাথা ঠুকে দলে দলে ভক্ত নরনারীরা চলেছে মন্দির প্রাঙ্গনের উপর দিয়ে। ওদের দেখে মনে সে অনেকটা সাহস পেল। তারপর সেখানটায় ঝুড়ি ও ঝাড়ুগাছটা ফেলে এসেছিল এগিয়ে গেল সেদিকে। চীৎকার করে তার আগমন বার্তাটা দিল জানিয়ে। সকাল বেলাকার সকরুণ ঘটনার আর যাতে পুনরাবৃত্তি না ঘটে আগে থেকে হুসিয়ার হওয়াই ভাল। কেননা, এখানকার লোকজনগুলো আবার বেজায় গোড়া। উঁচু বড় বড় সিঁড়ির ধাপগুলো পেরিয়ে দরজা দিয়ে ওরা মন্দিরের মধ্যে একবার যাচ্ছে, আর একবার বেরুচ্ছে। ঘুর ঘুর করে বেড়াচ্ছে—নীল, শাদা, লাল, সবুজ রঙের পোষাকের নানান বাহার ছড়িয়ে। রথা আড়চোখে ওদের দিকে একবার তাকায়। শুধোতে ইচ্ছে করে: 'লোকগুলো কি সত্যি পূজা দিতে এসেছে এখানে?'

'রাম, রাম,—শ্রীহরি—নারায়ণ—শ্রীকৃষ্ণ!' সহসা এক ভক্ত গদগদ কণ্ঠে বলে উঠল বথার পাশ কেটে যেতে যেতে—'হে বীর হনুমান—কালী মায়ি!'

'রাম' নাম অনেক বার সে শুনেছে। 'শ্রী-শ্রী' ও। দেয়ালে বানরের মূর্তি আঁকা লাল একটা মন্দিরও তার চোখে পড়েছে। মন্দিরটা হনুমানজীর সে জানত।

কালী মন্দিরের কথায় তার মনে পড়ে। নিকষ মিশমিশে কালো এক নারী মূর্তি—লকলকে রুধিরাক্ত জিহ্বা, চারখানা হাত, গলায় নরমুণ্ডের হার। আর কৃষ্ণ ঠাকুরের মূর্তি হোল নীল বর্ণের। ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে বাঁশী বাজাচ্ছেন। রাস্তার পানের দোকানে কৃষ্ণ ঠাকুরের কত রঙীন ছবি সে দেখেছে। কিন্তু হরিনারায়ণটি কে? ওঁম্ ওঁম্ শান্তিদেব—শান্তিদেব আওড়াতে আওড়াতে এক ভক্ত গেল তার পাশ কেটে। বথার চোখ দুটি ছাপিয়ে ওঠে অবাক বিস্ময়ে: 'শান্তিদেব আবার কোন ঠাকুর হোল? মন্দিরে তাঁর মূর্তি কই?'

'না, এখানে দাঁড়িয়ে কিছু দেখবার জো নেই।' সে বিড়্‌বিড় ক'রে উঠল—'আমি ওখানটায় গিয়ে দেখব।' কিন্তু একলা যাবার তার সাহস হোল না। সব শক্তি সে হারিয়ে ফেলল। সে জানতো, অচ্ছুত্‌রা মন্দিরে ঢুকলে মন্দির হয় অপবিত্র। হাজার ধোয়া-মোছাতেও তার শুচিতা আর ফিরে আসবে না বুঝি! সকাল বেলা কোন কাজ করেনি জানতে পারলে তার বাপও হয়ত রাগ করবে। তাকে ওখানটায় কেউ ঘোরাফেরা করতে দেখলেও বিপদ। নিশ্চয় চোর বলে ঠাওরাবে।

ধ্যাৎ, কপালে যা থাকে থাকুক, একবার গিয়ে দেখে আসতে হবে!—বথা তার অনুশাসনের বাঁধ দূরে সরিয়ে দিল। মাথায় তার রোক চাপল। সে ঘাড় ফিরিয়ে একবার তাকিয়ে নিয়ে সাহসে বুক বেঁধে পা চালাল মন্দিরের সিঁড়ির দিকে। সে যেন নেশা করেছে। মাথাটা তার ঝিম্‌ঝিম ক'রে উঠল। পা দুটো কেমন অসাড় আড়ষ্ট হয়ে গেল। শত সহস্র

বৎসরের অভ্যাস আর সংস্কারের মোহজাল তার টুটিটা যেন চেপে ধরেছে। নির্যাতিত নিপীড়িত অভিশপ্ত জীবন। পদদলিত কুকুরের মত অবনত এক ইতর ঘরে তার জন্ম। মাথা নত ক'রে চলাই অভ্যেস। সবটাতেই কেমন ভয়-ভয় ভাব। প্রতি পদে পদে দ্বিধা, সংকোচের বেড়াজাল। দু এক ধাপ উঠেই সে থমকে দাঁড়াল। বুকের স্পন্দন যেন থেমে গেল তার। যেন সে হারিয়ে ফেলল চলচ্ছক্তি। সে আবার ফিরে গেল তার পূর্বস্থানে। কাঠের হাতল ওযালা ঝাড়ুখানা নিয়ে দিতে লাগল ঝাড় মন্দির প্রাঙ্গনটা। সামনে তার একরাশ ধূলোর ঝড় উঠলো। সূর্যকিরণে সোনার মত চক্ চকে দেখাচ্ছে ধূসর ধূলোগুলো। কিন্তু তা বথার নজরে পড়লো না, ঘাড় গুঁজে সে বটগাছের শুক্‌নো পাতা, ইতস্তত ছড়ানো ফুলের পাপঁড়ি, পাযরার নোংরা ময়লা, খড়কুটা, ধূলো—ঝাড়ু দিয়ে স্তুপাকার করতে লাগল। আপন কাজে সে মশ্‌গুল হয়ে রইল। নাকে যে একগাদা ধূলো এসে ঢুকছে তাতেও খেযাল নেই। মাথার পাগড়ির একটা খুট দিয়ে সে এক সময় নাকের ডগাটা বেঁধে নিলো। তারপর ধীরে ধীরে কদমে কদমে ঝাড়ু দিয়ে চলল।—নাঃ, টাট্টিখানার কাজটা ধীরসুস্থে করবার জো নেই। হাত চালিযে ঝটপট্ ক'রে নিতে হয। এখানকার কাজটা ক্লান্তিকর, সময় সাপেক্ষ হলেও অনেকটা আরামের।

ছোট্ট ঝাড়ু। তা দিয়ে কি প্রাঙ্গনের অত জঞ্জাল ঝাট্ দেয়া চলে? এক এক জাযগায সে ছোট ছোট স্তুপাকারে জড়ো করতে লাগলো জঞ্জালগুলো। পরে ঝুড়ি ক'রে নিযে গেলেই হবে। জঞ্জালের এক একটা স্তুপের কাছে সে একবার খাড়া হয়ে দাঁড়িযে বুঝি কপালের ঘামটা একবার মুছে নিল। সামনেই দাঁড়িযে আছে মন্দিরটি সুউচ্চ উদ্ধত চূড়া তুলে। সে চোখ তুলে তাকাল। পরক্ষণেই আবার ঝুঁকে পড়ে ঝুড়ির মধ্যে ভর্তি করতে লাগল আবর্জনার স্তুপ। মন্দিরের সিঁড়ির কাছে কাছে কখন এসে পড়েছে তা সে নিজেই জানে না। সর্বাঙ্গ তার ছমছম ক'রে উঠল। কেমন যেন

ভয় হোল। মনে হোল অতিকায় এক মানবের মতো মন্দিরটা যেন এগিয়ে আসছে তার দিকে, এক্ষুণি বুঝি তাকে গিলে ফেলবে। সে একটু ইতস্তত করল। পর মুহূর্তেই সে আবার সাহসে বুক বাঁধল। মন্দিরে উঠবার সুর শুদ্ধ পনরটা ধাপ। এক লাফে সে পাঁচটা ধাপ উঠে থমকে দাঁড়াল। বুকের মধ্যে তার যেন ঢেঁকির পাড় পড়ছে। মাথাটা পড়ল ঝুলে। দু এক ধাপ আবার উঠে এল সে। হঠাৎ হাঁটুতে একটা চোট খেয়ে সে বুঝি পড়ে যাচ্ছিল। সিঁড়ির ধাপগুলো আকঁড়ে ধরে সে টালটা সামলে নিল কোন রকমে। তারও উপরের ধাপের দিকে আবার পা বাড়াল। বরাত্ তার বুঝি ভালই। ভক্তবৃন্দের অবিরাম মাথা ঠুকে প্রণাম করার ফলে দরজার মার্বেল পাথরটা যেন খয়ে গেছে। অনেকটা ঘাড় উঁচিয়ে সে একবার উঁকি মারল। দেবালয়ের অভ্যন্তরে যাবার প্রবেশ-পথ ছিল এতদিন তার কাছে অবরুদ্ধ—গোপন রহস্যময়। দর-দালানের গোলক ধাঁধাঁ ছাড়িয়ে পেতলের দরজার ফটক ডিঙিয়ে প্রশস্ত অন্ধকারময় এক প্রকোষ্ঠ। তারই প্রত্যন্ত প্রদেশের সুউচ্চ বেদীটির উপর রথার দৃষ্টি গিয়ে পড়ল। সোনালী কাজ করা সিল্ক ও মখমলের পোষাক-পরিচ্ছদে সজ্জিত পিতলের কয়েকটি দণ্ডায়মান মূর্তি। সুগন্ধ ধূপ-ধুনায় জায়গাটা ভরে গেছে। ভাল করে প্রতিমাগুলোকে দেখাই যায় না। কিছু দূরে বসে আছেন অর্ধ উলঙ্গ এক পুরোহিত। মুণ্ডিত মস্তকের শীর্ষদেশে তাঁর একগুচ্ছ শিখা; শিখার প্রান্তভাগে একটা গিট। সামনে খোলা বিবর্ণ একখানা পুঁথি। পাশে কোশাকুশি, শাঁখ, ঘণ্টা প্রভৃতি পূজার পাচ সরঞ্জাম। কুশ্রী দীর্ঘাকৃতি আর একটি লোক দাঁড়িয়ে সহসা শাঁখ বাজিয়ে উঠলো। উনিও একজন পুরোহিত হবেন হয়ত। কোমড়ে একখানি কাপড় ছাড়া একরূপ উলঙ্গই। মাথায় কালো একরাশ চুল; গলায় যজ্ঞোপবীত। রথা প্রথমে উঁকি মেরে দেখছিল। তারপর ঝুঁকে পড়ে তাকিয়ে রইল। বুঝতে তার বেশী বাকী রইল না, সকাল বেলাকার পূজো সুরু হয়ে গেছে।

'ওঁম্, শান্তিদেব !' উপবিষ্ট পুবোহিত মশায় সহসা উদাত্ত গম্ভীর কণ্ঠে মন্ত্রোচ্চারণ ক'রে উঠলেন। বাঁহাতে ঘণ্টা বাঁজাতে বাজাতে তাব সঙ্গে শঙ্খধ্বনিব ঐক্যতান তুললেন। ক্ষুদ্র মন্দিব প্রাঙ্গনেব এতক্ষণ ঝিমিয়ে-পড়া নির্জনতা যেন ভেঙ্গে খান্ খান হ'য়ে পড়ল। বাস্তবতার করস্পর্শে মন্দিবটি যেন জেগে উঠল সজীব মুখর হ'যে। ভিতবকাব নাট মন্দিব থেকে পূজারীর দল ঠাকুবেব পূজামণ্ডপেব দিকে ছুটলো 'শ্রীবামচন্দ্র কি জয' বলে সমস্বরে চীৎকাব কবতে কবতে।

গম্ভীর উদাত্ত কণ্ঠে সুসংবদ্ধ মন্ত্রপাঠ সুমধুব সঙ্গীত তবঙ্গেব মত বথাব কানে এসে প্রবেশ কবতে লাগল। তার মনটা ভবে উঠল কানায কানায়। সে অভিভূত হযে পড়ল বীতিমতো। অজ্ঞাতে হাত দুটো তাব এক হয়ে গেল। ভক্তিভবে মাথাটা ঝুলে পড়ল অজানা, অচেনা, অপবিচিত কোন ঠাকুবেব বন্দনাব উদ্দেশ্যে।

'গেল,—গেল,—সব অপবিত্র হযে গেল গো !'

আকাশ বাতাস চিবে সহসা একটা চীৎকাব তাব কানে এসে পৌছল। সে চমকে উঠল। চোখে দেখলো যেন অন্ধকাব। জিভ আব গলাটা শুকিযে কাঠ হযে গেল। আর্তস্ববে সে চীৎকাব ক'বে উঠতে চাইল। কিন্তু গলা দিযে কোন আওযাজ বেরুলো না। মুখ নেডে সে কথা কইতে গেল। কিন্তু পাবল না। ফোঁটা ফোঁটা ঘাম দেখা দিল কপালে। মৃতবৎ মনে হোল নিজেকে।

সহসা সে চাড়া মেবে উঠল। সোজা মাথা তুলে তাকালো চারিদিকে। চোখেব ঠুলিটা যেন খসে পড়েছে। সে দেখল, মস্ত গোঁফওযালা এক বেটে পুবোহিত মন্দির প্রাঙ্গনেব এক প্রান্ত থেকে অপব প্রান্তে সমানে হাত পা ছুঁড়ে, হাঁকডাক, তর্জন-গর্জন, ছুটা-ছুটি, লম্ফ-ঝম্ফ দিয়ে একাকার ক'বে তুলেছে। আব রুদ্ধ চাপা কণ্ঠে চিৎকার কবছে : 'গেল, গেল, সব অপবিত্র হয়ে গেল !'

'সর্বনাশ, স্যাংঘাতিক অঘটন একটা ঘটল দেখছি।' বথার মুখ দিয়ে কখন বেরিয়ে পড়ল কথাটা। ক্রুদ্ধ পুরুৎ ঠাকুরের পেছনে একটি নারী মূর্তির উপরও তার চোখ দুটি গিয়ে পড়ল এক সময়। অবাক্ হোল সে। ভয়ও হোল। কি জানি কি সর্বনাশটাই না ঘটল! কিন্তু পিছনের ঐ নারী মূর্তিটাই যে সব সর্বনাশের মূল, সে তখনও টের পাই নি।

কিন্তু টের পেতে দেরী হোল না। একদল পূজার্থী হুড়মুড় ক'রে ছুটে এলো মন্দিরের বাহির দালানে। যেন যাত্রাদলের অভিনয়ের শেষ দৃশ্যে পাত্র-মিত্র, কুশীলবেরা সবাই সার বেঁধে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে গেছে এক সঙ্গে। বেঁটে, হাড্ডিসার পুরুৎটা সিঁড়ির কয়েক ধাপ নীচে নাট-কীয়ভাবে তখনো শূন্যে হাত তুলে দাঁড়িয়ে। একি, সোহিনী না! ওই পুরুৎটার পেছনে কিছু তফাতে নাটমন্দিরের এক কোণ ঘেঁসে দাঁড়িয়ে আছে কেনো জড়োসড়ো হয়ে?

'গেল—গেল—সব গেল অপবিত্র হয়ে গো!'

বামুনটা তখনও সমানে চীৎকার ক'রে চলেছে। উৎসুক জনতা এবার যেন আন্দাজ করতে পারল ব্যাপারখানা। বামুনটার সঙ্গে সঙ্গে ওরাও হাত-পা নেড়ে সমানে চীৎকার ক'রে উঠল। ফেটে পড়ল ক্রোধ, ভয় আর আক্রোশে। চোখে মুখে তাদের চাপ চাপ উত্তেজনা। বথাকে দেখে একজন সহসা খেঁকিয়ে উঠল:

'যা যা, নেমে যা সিঁড়ি থেকে, বেটা ধাঙড় কোথাকার! দূর হ—দূর হ ওখান থেকে বেটা হারামজাদা! আমাদের পূজো আর্চা সবটা দিলি নষ্ট ক'রে। মন্দিরটাকে পর্যন্ত দিলি অপবিত্র ক'রে। প্রায়শ্চিত্তির জন্য এখন একগাদা পয়সা খরচান্ত হতে হবে। দূর হ—দূর হ বেটা, পথের কুকুর একটা, নেমে যা!'

বথা তরুতর্ ক'রে সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেল বামুনটার পাশ কাটিয়ে বোনের কাছে। পর পর দুটো সংশয় তার বুকে দানা বেঁধে উঠল।

নিজের অপরাধের জন্য তার ভয় হয়। সোহিনী তখনও জড়সড় হয়ে চুপ চাপ দাঁড়িয়ে আছে। নিশ্চয় কোন অপরাধ ক'রেছে, অঘটন ঘটিয়ে বসেছে কোন একটা। বোনের বিপদ আশংকায় মনটা তার কেঁপে উঠল দুরদুর ক'রে।

'ও বেটা হারামজাদাদের ছায়ার ত্রিসীমানায় পর্যন্ত যেতে নেই।' বেঁটে বামুনটার ক্রুদ্ধ আস্ফালন বখাব কানে এল।—'ও কিনা আমায় খামকা ছুঁয়ে দিলে।'

'দূর হ—দূর হ—তফাৎ যা, তফাৎ যা।' পূজারীর দল সমানে চীৎকার ক'রে উঠল।—'শাস্ত্রে বলে, ছোটজাতরা মন্দিরের ত্রিসীমানার একশো আটত্রিশ হাতের মধ্যে এলেও মন্দিরখানা অপবিত্র হ'য়ে যায়। ওবেটা হারামজাদা দেখনা উঠে এসেছে সিঁড়ির উপর, একেবারে দরজার গোড়ায়। সবাইকে প্রায়শ্চিত্তি কবতে হবে এবাব। শুদ্ধির জন্য হোমেব ব্যবস্থা করতে হবে।'

'কিন্তু আমি…আমি…' বেঁটে পুরুত্‌টা হাত পা নেড়ে সদম্ভে খতিয়ে উঠলো।

সিঁড়ির উপরকার লোকগুলি ধাঙড় ছেলেটাকে পুরোহিত ঠাকুরের পাশ কেটে যেতে দেখেছিল। ওরা তাই ভাবল পুরুৎ ঠাকুর বুঝি জাত-ধর্ম সব খুইয়ে বসেছেন। ওর জন্য তাদের মনে দুঃখ হোল। কি ক'রে তার সবটা অপবিত্র হয়ে গেল কেউ একবার জিজ্ঞাসা করেও দেখল না একবার জানলও না নাট-মন্দিবে একপাশে ডেকে নিয়ে সোহিনী নাকের জল আর চোখের জল এক ক'রে দাদাকে যে ঘটনাটা বলল।

'ওদের বাড়ীর পায়খানাটা পরিস্কার করছিলাম; এমন সময় ও বামুনটা —মুখপোড়া ও বামুনটা—' সোহিনী ফুঁপিয়ে উঠল।—'ও বামুনটা এসে মিছিমিছি ঠাট্টা মস্কারি করতে লাগল আমার সঙ্গে। কু-প্রস্তাবও করতে লাগল। আমি চেঁচিয়ে উঠতেই সেও চীৎকার ক'রে উঠল সঙ্গে সঙ্গে: আমায় ছুঁয়ে দিলে রে—আমায় ছুঁয়ে দিলে'!

মোহিনীর হাত ধরে টানতে টানতে বখা নাটমন্দিরের মাঝখানে ছুটে এল। ভীড়ের মধ্যে বামুন ঠাকুরকে কোথাও দেখা যায় কি না খুঁজে দেখল। কিন্তু তার টিকির সন্ধানটি কোথাও আর মিলল না। এমন কি সিঁড়ির উপরে দাঁড়িয়ে যে ক্রুদ্ধ জনতা এতক্ষণ ধরে হকার বকার চীৎকার করছিল, ধাঙড়দের জোয়ান ছোঁড়াটাকে মন্দিরের দিকে তেড়ে আসতে দেখে তারাও যে যেদিকে পারল কেটে পড়ল। জনতাকে সরে পড়তে দেখে বখা থমকে দাঁড়াল। তার হাতের দৃঢ় মুঠি দুটি কন কন ক'রে উঠল। চোখ দিয়ে যেন আগুনের হল্‌কা ছুটছে। দাঁত দুপাটি কড়মড় করে উঠল ব্যর্থ আক্রোশে। গলা ফাটিয়ে চীৎকার ক'রে বলে উঠতে ইচ্ছে হোল—দাঁড়াও, বামুন শালাটার কীর্তিখানা তোমাদের সব বলছি ?

সব কটাকে মেরে সাবার করতে পারলেই সে যেন স্বস্তি পায়, মাথায় যেন তার খুন চেপেছে। রাগে ক্ষোভে সর্বাঙ্গ তার যেন বিবর্ণ হয়ে গেল। থরথর ক'রে সে কাঁপতে লাগল। এমনি আর একটি ঘটনার কথা তার মনে পড়ে গেল। ঘটনাটা সে যেন শুনেছিল কার মুখে। তার এক বন্ধুর বোন একদিন কাট খড় কুড়িয়ে বাড়ী ফিরছিল মাঠের মধ্য দিয়ে। জোয়ান একটা চাষী পিছু নেয় ওকে একলা পেয়ে। ইতর ঠাট্টা মস্কারিও-বুঝি করতে থাকে। ব্যাপারখানা ওর ভাই জানতে পেরে আগুন হয়ে ওঠে। একখানা কুড়ুল হাতে ছুটে যায় সে মাঠের দিকে। বেয়াদব সে চাষাটাকে তারপর কুড়ুলখানা দিয়ে স্বহস্তে কেটে ফেলল কুটি কুটি ক'রে। 'কি অপমান,' বখা ভাবলে। 'ছোট একটা মেয়েকে একা পেয়ে কি না অপমান ক'রে বসল শূয়ারের বাচ্চাটা! আর এদিকে খুব যে ভালমানসেমি দেখান হচ্ছে, ভণ্ড কোথাকার! ও নাকি আবার একটা বামুন। মিথ্যে কথা বলতে মুখে বাঁধে না একটুও। আবার বলে কিনা ছুঁয়ে অপবিত্র ক'রে দিয়েছে! বাপরে বাপ! বোনটাকে একা পেয়ে কি পাষণ্ডটা বলাৎকার না ক'রে ছেড়েছে ?' বখার মনে সংশয় দানা

বাঁধতে থাকে। সে সোহিনীর দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে রুদ্ধশ্বাসে চেঁচিয়ে উঠল :

'বল না, বল না আমায় একবার, বাড়াবাড়ি সে কিছু করে নি ত ?'

সোহিনী ফুপিঁয়ে ফুপিঁয়ে কাঁদছিল। কেবল মাথা নাড়ল। মুখে কিছু বলতে পারল না।

রথা অনেকটা আশ্বস্ত হলেও পুরো মাত্রায় নিশ্চিন্ত হতে পারল না। বাগে পেয়ে ব্যাটা কি ওকে ছেড়েছে সহজে। নিশ্চয় কিছু একটা ক'রে বসেছে। কি যে করল তাই ভাবছি। বাপরে বাপ। লোকটাকে আমি মেরে ফেলব, খুন ক'রে ফেলব একেবারে। সব ব্যাপারটা জানবার জন্যে সে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল। বোনকে কিন্তু আর কিছু জিজ্ঞেস করতে তার সাহস হল না। সন্দেহ দোলায় তার বুকটা উদ্বেলিত হয়ে উঠল। মুখ ফিরিয়ে সে আবার শুধাল :

'বল্ না সোহিনী আমায় বল। লোকটা তোকে বাড়াবাড়ি কিছু করেনি ত ?'

সোহিনী বুকে মুখ গুজে কাঁদতে লাগল। কোন জবাব দিল না।

'তুই বল, আমায় একবার বল্। আমি ওকে মেরে আজ খুন ক'রে ফেলব। যদি…' চীৎকার ক'রে উঠল রথা।

'ও—ও—ও আমার সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরে খালি ঠাট্টা মস্কারি করছিল।' সোহিনী অবশেষে মুখ খুলল।—'আমি তখন নিচু হয়ে ঝাড়ু দিচ্ছিলাম। মুখপোড়াটা হঠাৎ পেছন থেকে এসে হাত বাড়িয়ে ফস ক'রে আমার—আমার,' সোহিনী একবার ঢোক গিললে। আবার বললে—'মাই দুটো——'

'শুয়োর কা বাচ্চা।' রথা তুবড়ির মত রাগে ফেটে পড়ল। 'আমি গিয়ে এক্ষুনি ওকে খুন ক'রে ফেলব।' নাট-মন্দিরের দিকে তেড়ে গেল সে অন্ধের মত।

'না না, দাদা, চলে এসো। চলো আমরা বাড়ী যাই।' দাদার ওভার কোটের আস্তিনটা দুহাতে আকড়ে ধরল সোহিনী।

চোখ দুটি তুলে বথা মন্দিরটার দিকে অপলকে তাকিয়ে রইল মুহূর্তখানেক। বাহিরে কোথাও একটাও জনপ্রাণী নেই। চারিদিক নিস্তব্ধ নিথর নিশ্চল। তার শিরদাঁড়াটা বেয়ে একটা হিমেল স্রোত যেন নেমে গেল। সামনেই দাঁড়িয়ে আছে দীর্ঘ গম্বুজ শোভিত বিরাট মন্দির। নির্মম নিষ্ঠুর। তার ভয়াল বিশালতায় যেন আঁৎকে উঠতে হয়। কয়েক পা সে পিছিয়ে আসে। বুকটা ভয়ে দুরু দুরু ক'রে উঠে। মনে হয় মন্দিরের দেবতারা যেন তার দিকে চেয়ে আছেন কট মট ক'রে। দশ হস্ত—পঞ্চ শির—বাস্তব সব জাগ্রত দেবতা অপাঙ্গ দৃষ্টিতে যেন তাকিয়ে আছেন মন্দিরের বাইরে। বথার মাথাটা নত হয়ে আসে আপনা থেকেই। চোখ দুটি আসে ঝাপসা হয়ে। হাতের দৃঢ় মুঠি দুটো শিথিল হয়ে ঝুলে পড়ে দু পাশে। দুর্বল হাঁটু দুটো যেন তার অবশ অসাড় হয়ে ভেঙ্গে পড়বে। অবলম্বন চাই। সোহিনীর কাঁধে ভর ক'রে কোনো মতে সে বেরিয়ে আসে মন্দিরের বাইরে।

পাশাপাশি ওরা দুজনে হেঁটে চলে। সহসা বথার বুকটা টনটন ক'রে উঠে বেদনায়। ছিমছাম সুশ্রী সুন্দরী তার বোনটি। বোনের দেহ-সৌষ্ঠব সম্পর্কে সে আত্ম-সচেতন হয়ে ওঠে। কানে কানপাশা, হাতে তাগা, ভীরু সলজ্জ পা ফেলে চলবার সময় গায়ের অলঙ্কারগুলো বেজে ওঠে রিম ঝিম ক'রে—যেন চমক হানে বিজুলী। চোখ মুখ আর তনু দেহলতা দিয়ে যেন খেলে যায় লাবণ্যচ্ছটা। আর কেউ ওর গায়ে হাত দিক সে ভাবতেই পারে না। হোক না সে সাতপাক ঘোরা রীতিমত শাস্ত্র মতে বিয়ে করা তার স্বামী। আড় চোখে সে সোহিনীর দিকে একবার তাকাল। বিবাহিতা সোহিনীর অনাগত স্বামীটির কথা একবার সে কল্পনা করল। চোখের উপর তার ভেসে ওঠে অপরিচিত সেই মানুষটা সোহিনীকে বাহুডোরে আবদ্ধ ক'রে সুডৌল পরিপূর্ণ স্তন দুটি মুঠোয় ক'রে যেন আদর করছে। আর তার বোনটির সসম্মিত মুখখানিতে পরম তৃপ্তিও সম্মতির

ছাপ। অপরিচিত একটা লোক সোহিনীর অঙ্গ স্পর্শ করছে ভাবতেও আর সর্বাঙ্গ রি রি ক'রে ওঠে ঘৃণায়। মনে হয় তার হৃৎপিণ্ডটাকে কে যেন সজোরে ছিনিয়ে নিয়ে গেল। তার অবচেতন মনটি সোহিনীর ভাবী বরের বুঝি প্রতিদ্বন্দ্বী।

'ছি—' বথা নিজের উদ্‌ভ্রান্ত মনের বলগা টেনে ধরল সজোরে। 'ছিঃ আমি এসব ভাবছি কি বসে বসে? সোহিনী না আমাব বোন?' মন থেকে সে গোটা ছবিটা লেপে মুছে ফেলল। কিন্তু পরক্ষণেই তার মনের পর্দায় উঁকি মারল বেটে খাটো সেই বামুন ঠাকুরের মুর্তিটা। ওব মুখটা মনে পড়তেই গায়ের রক্ত তার আবার উঠল টগবগ ক'রে। প্রতিশোধের অগ্নিশিখা জ্বলে ওঠে চোখ দুটিতে। লোকটার একটা কিছু কবাই হোল প্রতিশোধ নেওয়া। দু একঘা আচ্ছা ক'রে বসিয়ে দেওয়া যেতে পারে কিংবা ঠেঙিয়ে একবারে মেরেফেলাও যেতে পারে জানে প্রাণে। শত সহস্র বৎসরের দাসত্বে হীনতার জিঞ্জির অভিশাপ যদিও তার শিরদাঁড়াকে ভেঙ্গে দুমড়ে অবনত ক'রে দিয়ে গেছে তবুও তার উচ্ছল মনটি আবেগে কর্কট ক্রান্তিব স্বাধীন উদাত্ত আকাশের অসীম প্রাণবন্যায় এখনও তাজা ও ভরপুর। নিজের প্রাণের পরোয়া সে করে না একটুও। এককালে তার পূর্বপুরুষেরা ছিলো গাঁয়ের কিষাণ মজদুর। তাদের রক্তধারা এখনও বয়ে চলেছে তাব দেহের শিরা উপশিরায়। ইচ্ছে করলে এখনই বেয়াদব ঐ ভণ্ডটাকে দু এক ঘা বসিয়ে দিতে পারে সে। বথা বিডবিড় ক'রে ওঠে আপন মনে।

মহৎ একটা কিছু করতে গেলে মুখখানা তার উজ্জ্বল হ'য়ে ওঠে বুঝি অতিমানবীয় অপূর্ব এক দীপ্তিতে। চারদিক থেকে আক্রান্ত একটা বাঘ যেন মরিয়া হয়ে রুখে দাঁড়িয়েছে। তবু কিন্তু সে বুকে জোর পায় না। বাপ-ঠাকুরদার আমলের পুঞ্জীভূত সংস্কার আর রীতি-নীতির দুর্লঙ্ঘ প্রাচীর ডিঙিয়ে এক পা যেতে সে পারে না। বামুন ঠাকুরদের রক্ষা কবচটা যে ধরা-

ছোঁয়ার বাইরে—বিশেষ ক'রে তাদের মতো ছোটলোকদের। হীন দাসত্বের অবনত সত্তাটা মনের মধ্যে আবার চাড়া মেরে উঠে পিছিয়ে দেয় তাকে আপন সঙ্কল্প থেকে। আহত পশুর মত কামড়াতে থাকে আপনার লাঙ্গুল। গোঁড়িয়ে ওঠে সে ব্যর্থ আক্রোশে।

মন্দির থেকে ভাইবোন দুজনে বেরিয়ে এলো। ব্যস্ত কোলাহল মুখরিত রাজপথ। এখানে ওখানে নানান্ দৃশ্যের সমাবেশ। চোখ তুলে ভাল ক'রে একবার সে দেখলও না সে দিকে; কান পেতে কিছু শুনলও না। কিছু বলতেও তার ইচ্ছে হোল না। 'ছুটে গিয়ে ঐ ভণ্ড পামর বামুনটাকে খুন ক'রে এলাম না কেন!' সে ক্রোধে বিড়বিড় ক'রে উঠল। 'সোহিনীর জন্য না হয় একটা জান দিতামই! সবাই ব্যাপারটা জেনে যাবে এর পরে। আহা, বেচারী! লোকের কাছেও বা মুখ দেখাবে কি ক'রে? আমাদের ঘরে মেয়ে হয়ে জন্মে অমন কলঙ্কের ডালি আনলি কেন বয়ে? সকলের মুখে কালি লেপে দিলি কেন অমন ক'রে? ফুটফুটে অমন সুন্দর না হলেই কি পারতিস্ না? ভগবান তোকে বিশ্রী কুরূপা ক'রে তৈরী করল না কেন! তাহলে তো কারও নজর পড়ত না তোর উপর!' কুশ্রী কুরূপা সোহিনীর কথা ভাবতেই তার মনটা টনটন্ ক'রে উঠল ব্যাথায়। 'হে ঈশ্বর, অমন সুন্দরী হয়ে আমাদের ঘরে ও জন্মাল কেন?'—বৃথা শুধায় আপন মনে। আড়চোখে একবার তাকায় বোনের দিকে। দেখে, সোহিনী মুখ ফিরিয়ে আপন বসনের প্রান্ত দিয়ে চোখের কোণ মুছছে থেকে থেকে। সহসা তার বুকটা গলে গেল। সোহিনীর একখানা হাত সস্নেহে সে মুঠোর মধ্যে তুলে নিয়ে এগিয়ে চললো।

কিছুদূর গিয়েই বিক্ষুব্ধ মনটা অনেকটা হাল্কা হয়ে এল। বুক ভরে সে দম নিল।...

'তুই কি এখন বাড়ী যাচ্ছিস সোহিনী?'

সোহিনী দাদার পিছু পিছু আসছিল। লজ্জা আর সংকোচে মাথাটা বুঝি

ঝুঁকে পড়েছিল। ভাবছিল লোকের কাছে সে এখন মুখ দেখায় কি ক'রে? এমন সময় রথা সহসা শুধাল—'হ্যাঁ, তুই বরং বাড়ীই যা। আমি গিয়ে খাবারটা নিয়ে আসছি। আমার ঝাড়ু ও ঝুড়িটাও তুই নিয়ে যা সঙ্গে ক'রে।'

সোহিনী দাদার মুখের দিকে তাকাতে পারল না। মাথা নেড়ে সায় দিল। দাদার হাত থেকে ঝুড়ি ও ঝাড়ুগাছটা নিয়ে সে মন্থর পা ফেলে চলল শহরের ফটকের দিকে। মাথার কাপড়খানা মুখের উপর খানিকটা সে টেনে দিল এক সময়।

অপসৃয়মান বোনটির পিছনে রথা চোখ দুটি তুলে ধরে একবার। তারপর দেবালয় ছেড়ে হেটে চলে ধীরে ধীরে।

'হৈ হৈ, হট্ যাও, হট্ যাও, ঝাড়ুদার আসছে!' সহসা সে তার হুসিয়ারী হাঁক হেঁকে উঠলো। আর একটু হলে সে বুঝি খালি পা এক হিন্দু দোকানদারকে ছুঁয়ে দিয়েছিল। দোকানদারটি তখন এক দোকান থেকে অপর দোকানে ছুটোছুটি ক'রে বেড়াচ্ছিল ধর্মের ষাড়ের মতো। ঘিঞ্জি লোহার বাজার ছাড়িয়ে, না-বিলেতী না-ভারতীয় পাঁচমিশালী পোষাক পরা একটা ভিখারীকে পিছনে রেখে, বুড়ো আতরওয়ালা ও আর একখানি ফলের দোকানের মাঝখানের এক ফাঁকা জায়গায় কখন এসে পৌছল সে নিজেই জানে না। তার বুকখানা অনেকটা হালকা হয়ে গেলেও তখনও তার মধ্যে কিন্তু দ্বন্দ্ব-দোলার তুমুল ঝড় বইছিল। বাইরে থেকে দেখে তা বুঝবার উপায় নেই। 'হ্যাঁ, এই গলিতে আমাকে খাবার আনতে যেতে হবে।' রথা বলে উঠল আপন মনে। তারপর গলিটার মধ্যে ঢুকে পড়ল এক সময়।

গলিটার একজায়গায় বেওয়ারিশ একটা রোগা ঘেয়ো কুকুর বসে বসে হাগছিল আর ভনভনে একঝাঁক মাছির কামড়ে উদ্‌ব্যস্ত হ'য়ে উঠছিল। রোগা হাড্ডিসার আর একটা কুকুর তখন নর্দমার মুখে বাসি পচা খাবার চাটছিল খাবারটা নর্দমার মুখটাকে আটকে দিয়েছিল। একেবারে

গলির ডানদিকটার কিছুদূরে একটা গরু পথ জুড়ে শুয়ে রয়েছে। বথা দেখল, গলিটার এখানে ওখানে জমে আছে নোংরা আবর্জনা। গরু আর কুকুর দু'টোকে ওখানে থেকে হটিয়ে না দিলে নয়। কুকুর দু'টোর দিকে সে সহসা তেড়ে গেল। আঁতকে উঠে বেচারীরা পালিয়ে গেল কেঁউ কেঁউ চীৎকার করতে করতে। কিন্তু মুস্কিল হ'লো পরম পবিত্র গোমাতাটিকে নিয়ে। বথার তাড়াতে গরুটি বিচলিত হ'লো না কিছুমাত্র।

পরম নির্বিকারে আগের মত পড়ে রইল রাস্তা জুড়ে। বথা ওকে খোঁচাতে বিশেষ সাহস পেল না। কেননা, যে সব ধনীলোকের বাড়ীর সামনে গরুটা পড়ে থাকে তা'রা হয়ত দেখতে পেয়ে তাকে এক্ষুনি মারতে আসবে। তাই সে দু'হাতে গরুটার শিং দু'টো ধরে রাস্তাটা পেড়িয়ে গেল পাশ কেটে। নাঃ, গলিটার এখানে ওখানে এত আবর্জনা পড়ে আছে, সোহিনী কি আজ সকালে ঝাট দেয়নি? কাজের বেলায় এমন গাফিলতি করা ঠিক নয়। মন্দিরের সেই বামুনটার হাতে তা'র চরম অপমানের কথা ভেবে সে তা'র সব অপরাধটা ঝেড়ে ফেলল মন থেকে। অমন নিগ্রহের পর কারো কি মাথা ঠিক থাকে? না, কাজ-কর্মে কারো ঠিকমত মন বসে? কিন্তু সোহিনী যে মন্দিরে যাবার আগেই গলিটা ঝাট দিয়ে গেছে মনটি তার তা' মানতে চাইল না।...এক তামা-পিতলের দোকানদার তা'র ছোট অন্ধকার দোকানটায় বসে বসে হাতুড়ি দিয়ে তামার পাত পিটাচ্ছিল। হাতুড়ির টুং-টাং শব্দ দূর থেকে বথার কানে ভেসে এল। সোহিনীর গাফিলতির কথা মন থেকে তা'র মুছে গেল নিঃশেষে। বুকটা যেন অনেকটা হাল্কা হ'য়ে গেল। এগিয়ে চলল সে। সামনে ছোট গলিটার এক বাড়ীতে তা'কে যেতে হ'বে খাবার আনতে। কিন্তু রাস্তাটার মাঝখানেই আবার স্নান করতে বসেছেন পরম ধার্মিক এক হিন্দু। সারা গায়ে তার তেল কুঁচকুঁচ্ করছে। পরণে একটা গামছা ছাড়া আর কিছু নেই বললেই চলে। পাশ কেটে যেতে হ'লেই বথাকে তিনি জল ছিটিয়ে নাইয়ে তুলবেন রীতিমত।

বধা কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করল ওখানটায়। ধার্মিক বুড়িটি ঝপ, ক'রে একবালতি জল সশব্দে মাথার উপর ঢেলে দিয়ে খালি বালতিটা আবার ছুঁড়ে দিল রাস্তার পাশে কুয়োটার মধ্যে। বধা এই সুযোগে তার গন্তব্য স্থল স্যাঁতসেঁতে অন্ধকার গলিটার মধ্যে ঢুকে পড়ল। সরু গলি। মোটা দুজন লোক পাশাপাশি চলা দায়। তবে গলিটা অনেকটা নিড়িবিলি। দোকানদারের হাতুড়ির সেই টুং-টাং আওয়াজটিও আর বিশেষ কানে আসছে না। কিন্তু ধৈর্যের পরীক্ষার এখনও তা'র বাকী। অচ্ছুৎ সে। গৃহস্থ বাড়ীর সিঁড়িতে ওঠা তা'র নিষেধ। ছোঁয়া লেগে সিঁড়িটা তা'হলে বুঝি অপবিত্র হ'য়ে যাবে। কিন্তু রান্নাঘরগুলো হ'ল উপরের তলায়।

উপায় কি? চীৎকার তা'কে করতেই হবে খাবারের জন্য। হাঁক ছেড়ে তা'কে নীচু থেকে জানিয়ে দিতে হবে আপনার আগমন বার্তা।

'ধাঙ্গড়ের রোটি-মাইজি, ধাঙ্গড়ের রোটি দ্যান।' নীচের তলায় দরজার সামনে দাঁড়িয়ে বধা চীৎকার ক'রে উঠল। গলির মাথা থেকে টক্ টক্ ক'রে অবিরত যে শব্দটা আসছিল তাতে বুঝি তার কণ্ঠস্বর হারিয়ে গেল। সে আরও জোরে চীৎকার ক'রে উঠল :

'ধাঙ্গড় এসেছে মাইজি। ধাঙ্গড়ের রোটি দ্যান্।' কিন্তু তা'তেও কোন ফল হ'ল না। কোন সাড়া মিলল না উপর থেকে।

দরজার কাছে আরও কয়েক পা সে এগিয়ে গেল। আবার হাঁক ছাড়ল :

'ধাঙ্গড় এসেছে মাইজি, ধাঙ্গড়ের রোটি দ্যান্।'

উপরতলা থেকে এবারও কোন সাড়াশব্দ এল না। বেলা পড়ে এসেছে। সে জানত এই সময়টা বাড়ীর গিন্নি হেঁসেলের পাট চুকিয়ে নীচে নেমে আসে। ঘরের বারাণ্ডায় বা গলির নর্দমাটার মুখে বসে সবাই মিলে গল্প-গুজব করতে থাকে। কেহ কেহ বা চরকায় সূতো কাটতে থাকে।

'ধাঙ্গড়ের রোটি মাইজি।' সে আবার হেঁকে উঠলো।

এবারও কোন সাড়া আসে না। পা দুটো তার কন্‌কন্‌ ক'রে ওঠে ঠায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। সর্বাঙ্গ যেন অসাড় আড়ষ্ট হয়ে আসে। নড়বড়ে ঢিলে হয়ে যায় যেন পায়ের খিলানগুলো। কোন কাজে তার আর মন বসে না। গলির একটা বাড়ীর কাঠের সিঁড়ির নীচে সে বসে পড়ে একান্ত মনমরা হয়ে। ক্লান্ত অবসন্ন হয়ে পড়েছিল সে, ক্ষুব্ধ, বিরক্ত-ও। ক্ষোভের চাইতে অবসাদটাই যেন ছাপিয়ে ওঠে। চোখ দুটো তার তন্দ্রায় ঢুলে আসে। আধখোলা ঘরের প্রকাণ্ড দরজাটার দিকে সে চোখ দুটি মেলে দেখবার চেষ্টা করল। ভাল করেই সে জানতো, তার স্থান গৃহস্থ ঘরের সিঁড়ির তলায় নয়। স্থান বাইরের নোংরা নর্দমার পাশে ভিজে স্যাঁতসেঁতে গলিটায়। তা হোক্; অতশত মানলে চলে না। হাঁটুদুটো কুঁড়িয়ে এককোণ দেখে সে বসে পড়লো। ঘুম নেমে আসে তার চোখ দুটিতে একসময়।

ক্লান্ত অবসন্ন দেহটা ঘুমে ভেঙে পড়তেই খাপছাড়া অলীক একসার উদ্ভট কল্পনা—অতৃপ্ত বাসনা উঁকি মারে তার সুপ্ত অবচেতন মনের আনাচে কানাচে। স্বপ্ন দেখে সে: জনাকীর্ণ নগরীর অপরূপ এক রাজপথ ধ'রে সুশ্রী সুবেশ হাস্যমুখর একদল বরযাত্রীর সঙ্গে সে যেন চলেছে গরুর গাড়ি ক'রে। আর তার সামনে সামনে রঙিন হলদে কাপড়ে ঢাকা একখান দোলনা কাঁধে ক'রে নিয়ে চলেছে জন চারেক লোক। পুরোভাগে চলেছে একদল শিখ ব্যাণ্ড বাজিয়ে। পরনে ওদের গোরা ফৌজদের পোষাক। কারো হাতে ক্ল্যারিওনেট, কারো কারো বা ফ্লুট, বিগেল, সুপার-স্যাক্সোফোন আর ড্রাম। অমন বাজনা কতদিন সে শুনেছে ক্যাণ্টনমেণ্টে। কিন্তু এ যেন তেমন মন-মাতানো নয়। না আছে সুর, না আছে তাল, লয়। খালি বেসুরে পিটিয়ে চলেছে ব্যাণ্ড।

...তারপর এক রেলস্টেশনে সে যেন এসে পড়ল। একখানা ট্রেন দাঁড়িয়ে আছে প্লাটফরমে। ইঞ্জিনটার পেছনে চারিদিক ঘেরা পরপর চল্লিশ

'খানা মালগাড়ীর ওয়াগান। কোনটাতে পাথরের নুড়ি আর কোনটাতে স্তূপাকারে রয়েছে কাঠ। বথা দেখল, অমন একটা মালগাড়ীতে সে যেন চেপে বসেছে। পাশে তার রয়েছে একটা পুঁটলী। হাতে রূপোর বাঁটওয়ালা একখানা ছাতা; মাথায় একটা শোলার টুপি। আর মুখে তার বাপের হুঁকা শুদ্ধ নলটা। সহসা তার মনে হোল মাল-গাড়ীটা যেন গায়ের আড়মোড়া ভেঙ্গে নড়ে উঠলো। পরক্ষণেই তার কানে এলো একটা কিচ্‌কিচ্‌, মচ্‌মচ্‌, কড়্‌কড়্‌, ঝপঝপ শব্দ। মনে হলো আশেপাশে কোথাও যেন একটা লোক খুন হয়েছে। আতংক, ভয় আর করুণায় মনটা তার গলে গেল। স্বপ্নে দেখলো, মাল গাড়ীটার নীচে ঝুঁকে দেখবার জন্য সে যেন মুখ বাড়িয়েছে। হ্যাঁ, তাইতো, নীল পোষাক পরা রেলের একদল কুলি একখানা মালগাড়ীকে ঠেলে নিয়ে চলেছে রেলওয়ে শেডের দিকে।...সে তারপর এসে পড়লো ছোট্ট অজ এক পাড়াগাঁয়ে। একহাঁটু ধুলো কাদায় ভর্তি গাঁয়ের সরু সরু মেঠো রাস্তা-ঘাটগুলি... দুপাশেই নালা, ডোবা, খাল, বিল। গরুগুলো চরে বেড়াচ্ছে এখানে ওখানে। সে আরও দেখল দুখানা প্রকাণ্ড গরুর গাড়ী একবাশ বোঝা নিয়ে ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ করতে করতে আসছে ওদিক থেকে। গাড়ীর চাকাগুলো কোথাও কাদাতে বসে গিয়েছে। এখনও পাঁক লেগে আছে গায়ে।...কিছু দূরেই বাজার। একঝাঁক চড়াই পাখী উড়ে এসে বসল বাজারের দোকান-গুলোর উপর। খুটেখুটে তারা খেয়ে চললো দোকানীর চাল ডাল।... মড়া-খেকো এক কাক কোথেকে উড়ে এসে বসলো একটা বলদের বাঁকা ককুদটার উপর। ব'সে পরম নিশ্চিন্তে ঠোকরাতে লাগল বলটার ঘাড়েব ঘাটাকে।...সে আরও দেখল ছোট্ট একটা মেয়ে এসে দাঁড়াল এক মিষ্টির দোকানের সামনে। খাবারের ঠোঙাটা হাতে নিয়েই মেয়েটা হেসে ফেলল ফিক ক'রে। তারপর বাড়ী চলল নাচতে নাচতে। এমন সময় মড়াখেকো সেই কাকটা উড়ে এসে মেয়েটাব হাত থেকে ছোঁ মেরে

ঠোঙা শুদ্ধ খাবারটা ফেলে দিল খানার মধ্যে। মেয়েটা কেঁদে উঠলো। পাশেই এক মোটাসোটা সুশ্রী সেকরার দোকান। সে তার হাঁপরের কাছে বসে একখানা রূপোর অলঙ্কারের উপর একটা ফুলের নক্সা কাটছিল। মেয়েটার কান্না শুনে সে তাকাল মুখ তুলে। একটু হাসলেও। তারপর চিমটাটা দিয়ে টক্‌টকে লাল একটা কয়লা বাড়িয়ে ধরল মেয়েটার দিকে।···স্বপ্নে বথা আবও দেখল, সে যেন এক পাঠশালার সামনে এসে পড়েছে। নীল পাগড়ি পরা বাচ্চা পড়ুয়ার দল পণ্ডিত মহাশয়ের সামনে বসে উচৈঃস্বরে স্তব ক'রে পড়ছে আর লিক্‌লিকে বেত হাতে পণ্ডিত মশায় বসে আছেন ওদের সামনে। কটমট্ ক'রে তাকাচ্ছেন ওদের দিকে বারবার। পড়ুয়ারা মুখে মুখে আওড়ে চলেছে পাঠ। স্বপ্নে দেখা অপরূপ সেই আজব নগরীর পাশ কেটে বয়ে চলেছে একটা স্বচ্ছ করতোয়া। আর তার পাড়েই দাঁড়িয়ে আছে গম্বুজ তোলা এক সুবিশাল অট্টালিকা। খোদাই করা হয়েছে পাথর কেটে কেটে। ভিতর দালানের কার্নিশগুলোয় পাথরের সূক্ষ্ম কাজ। খোদাই করা তার অপূর্ব সৌন্দর্য-বিভব প্রত্যেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রে। বথা হাঁ ক'রে তাকিয়ে থাকে। মুগ্ধ, অবাক বিস্ময় ছাপিয়ে ওঠে তার চোখ দুটিতে। প্রাসাদের ভিতরটা লাল, নীল, সবুজ, সোনালী নানান্ রঙে চিত্র বিচিত্রিত। অট্টালিকাখানার ভিতরটা অনেকটা হলঘরের মত। দুপাশে মনোরম কারুকার্য খচিত থামের পর থাম। শেষের দিকটায় খানিকটা বারান্দার মত। ওখানে বিশীর্ণ রুগ্ন এক বৃদ্ধকে ঘিরে দাঁড়িয়েছে অনেকগুলো লোক। প্রাসাদ সংলগ্ন মন্দিরটি থেকে জনকয়েক সৈন্য বেরিয়ে এলো পরস্পর হাসাহাসি আর হড়-বড় ক'রে কথা কইতে কইতে। রোগা বিশীর্ণ সেই বৃদ্ধটাকে কাঁধে ক'রে ওরা মাঠ পেরিয়ে চলল শ্মশান ঘাটের দিকে। শ্মশানে গত রাত্রির চিতাগুলো তখনো নেভে নি। পোড়া কাঠ-গুলো থেকে চুঁইয়ে চুঁইয়ে ধোঁয়া উঠছে কুণ্ডলী পাকিয়ে। শ্মশানের

মড়াগুলোকে আগলে রয়েছে জনকয়েক সন্ন্যাসী। চিতা থেকে ওরা মুঠি মুঠি ছাই তুলে মাখছে নিজেদের চুলে মাথায় সর্বাঙ্গে। এক গোরা সাহেব এককোণে দাঁড়িয়ে ব্যাপারখানা দেখছিল আর মুচকে মুচকে হাসছিল। রথা সহসা দেখল, মুণ্ডিত মস্তক সম্পূর্ণ উলঙ্গ এক যোগী পুরুষ নিমেষের মধ্যে সাহেবটাকে ছোট্ট একটা কালো কুকুরে রূপান্তরিত করে দিলেন কি সব মন্ত্র আউড়ে। যোগীটি তখন ধ্যানে বসেছিলেন। বয়স তাঁর নাকি [illegible]হাজার বৎসরের উপর। রথা ট্যাঁক খুলে প্রণামী দিতে যাচ্ছিল। কিন্তু ওঁর চেলা-চামুণ্ডারা বারণ করল। সন্ন্যাসীটি এতদিন বেঁচে আছেন কি করে, রথা ভাবছিল অবাক হয়ে। এমন সময় হঠাৎ একঝাঁক বানর লাফিয়ে পড়লো এক গাছ থেকে।...

দিবা স্বপ্নের ঘোর সহসা কেটে গেল রথার। মুখ বাড়িয়ে সে দেখল, উঁচু বাড়ীগুলোর মাথায় রোদ এসে চিক্‌চিক্ করছে। বেলা প্রায় দুটো হবে। সে জানে এই সময়টায় সাধু-ফকিররা বেরোয় মুষ্টি ভিক্ষার জন্য ভক্ত গৃহস্থদের দোরে দোরে। ধড়মড় ক'রে সে উঠে বসলো। চোখ দুটো দুহাতে একবার রগড়ে নিল।—না সবুরে মেওয়া ফলে। সাধু সন্ন্যাসী অতিথিদের বিদেয় না ক'রে খাওয়া-দাওয়ার পাট গৃহস্থ বাড়ীতে কেউ নিশ্চয় চুকিয়ে দেয় না। তার বরাতেও ঠিক খাবার জুটে যাবে।—সে ভাবল। তারপর সাধুটির দিকে সে চোখ তুলে তাকাল, অবশ্যি উঠে দাঁড়াল না। রথার চোখ দুটো ঘুমে আবার ঢুলে এলো।

'বম্! বম্! ভোলানাথ!' হাতের কঙ্কন বাজিয়ে সাধুটি চীৎকার ক'রে উঠল। সাধুর চীৎকার শুনে দুজন স্ত্রীলোক ছুটে এলো বারান্দায়।

'সাধুজী, এই যে আপনার ভিক্ষে এক্ষুনি নিয়ে আসছি।' একজন স্ত্রীলোক ছুটে এলো সাধুর হাঁক শুনে। তারপর বাইরে সিঁড়ির নীচে রথাকে বসে থাকতে দেখে থমকে দাঁড়ালো সে।

'মুখপোড়া বেজন্মা', খেঁকিয়ে উঠলো স্ত্রীলোকটী। 'মরণ হয় না তোর, মরতে পারিস না? ওঠ, ওঠ, ওখান থেকে বেরিয়ে যা শিগগীর! বাড়ীখানা আমার অপবিত্র করে দিলে গা! পিণ্ডি গেলার আয়োজন চাইতো হাঁকতে পারিসনি বাইরে থেকে, মুখপোড়া? একি তোর বাপের বাড়ী পেয়েছিস!'

বথা তড়াক্ ক'রে উঠে দাঁড়ালো। চোখ ছুটি ছুহাতে কচলে গায়ের আড়ষ্ট ভাবটা যেন সে ঝেড়ে ফেলল। তারপর হাত ছুটি জড়ো ক'রে ক্ষমা চেয়ে বলল:

'আমায় ক্ষমা করুন, মা। রুটির জন্য আমি আপনাকে অনেকবার ডেকে ছিলুম। আপনি তখন ব্যস্ত ছিলেন কিনা তাই শুনতে পাননি। বড় হাঁপিয়ে উঠেছিলাম তাই ওখানটা বসে পড়েছিলাম একটু।'

'অমন যদি বসতেই হয় তবে দোর গোড়ায় কেন, গলিতে গিয়ে বসতে পারলি নে, হতচ্ছাড়া মুখপোড়া? জাত গেল আমার, ধর্ম গেল, সারা বাড়ীটা আমায় গঙ্গাজল ছিটোতে হবে। মাগো, কালে কালে কিনা হচ্ছে। ছোট-লোকগুলো বামন হয়ে কিনা আকাশের চাঁদ ধরতে চায়! মন্দিরে আজ পূজা দিয়ে এলাম—মঙ্গলবারের অমন সকালটা···তারপর সাধুকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে স্ত্রীলোকটি তার রসনা সংযত করল।

'একটু সবুর করুন, সাধুজী।' খাদে নেমে এলো তার স্বর। 'এক্ষুনি গিয়ে আপনার খাবার নিয়ে আসছি। মুখপোড়া এসে আমার দেরী ক'রে দিলে। রুটির খোলাটা চাপিয়ে এসেছি উনানে। সব কটা রুটি নিশ্চয় পুড়ে ছাই হয়ে গেল।'

বারান্দা থেকে সে সরে গেল। অপর যে স্ত্রীলোকটি ছুটে এসেছিল বারান্দায় সাধুর গলা শুনে অনেকটা সে শান্ত প্রকৃতির; একটু মোটা-সোটাও। এক হাতে সাধুটির জন্য খানিকটা চাউল আর অপর হাতে বখার জন্য একখানি চাপাটি নিয়ে ও নীচে নেমে এলো। ডান হাতের চাউলটি সাধুটির ঝোলার মধ্যে ঢেলে দিল। তারপর চাপাটিখানা দিল বথাকে হাতে হাতে। সস্নেহে বলল:

'গৃহস্থ বাড়ীর দোর গোড়ায় অমন ক'রে কি বসতে আছে বাছা ?'

'দীর্ঘজীবী হও মা, দীর্ঘজীবী হও! পরিবারের সকলের মঙ্গল হোক্।' সাধু দুহাত তুলে আশীর্বাদ করল। 'খানিকটা ডাল দেবে মা ?'

'হ্যাঁ সাধুজী, কাল থেকে তাই দেব। হাত দুটো আজ জোড়া, রান্না নিয়েই ভয়ানক ব্যস্ত আছি।' ছুটে সে উপরে চলে গেলো।

গোটা বাড়ীটা অপবিত্র হয়ে গেছে বলে যে স্ত্রীলোকটা বখাকে এতক্ষণ ধরে বক্‌ছিল সে এবার নীচে নেমে এলো। কট্‌মট্‌ ক'রে ওর দিকে তাকিয়ে বলে উঠলো :

'ওয়াক্—থুঃ! সারা সক্কালবেলা যত রাজ্যের গু-মুৎ ঘেটে এসে একবারে ঘরে উঠে এলি যে ?'

সে এবার সাধুটির দিকে ফিরে দাঁড়ালো। চারটি ভাত আর খানিকটা ডাল-তরকারি সাধুর হাতের কালো করোটিটার মধ্যে ঢেলে দিয়ে বললঃ

'আজ এই নিন্। কিছু অশুচি হয় নি বাবা! ধাঙড় বেটা সত্যিই কিছু ছুঁয়ে দেয়নি আমাদের। দয়া ক'রে একটু দাওয়াই দিয়ে যান বাবাজী, ছেলেটি যেন ভালোয় ভালোয় সেরে ওঠে জ্বর থেকে।'

'ছেলে-পিলেদের আর তোমাদের মঙ্গল হোক্।' সাধুটি আশীর্বাদ করল : 'কাল সকালে আমি একটি ওষুধ এনে দেব।' সাধু এবার বাইরের দিকে পা বাড়াল।

'মরতে পারিস নে!' স্ত্রীলোকটি ঝংকার দিয়ে উঠলো এবার বখার দিকে তাকিয়ে। 'খাবার নিতে এসেছিস, ভাই-বোন আজ সকাল থেকে কি কাজটা করেছিস শুনি ? তোর বোনটা ত আজ গলিটা পর্যন্ত ঝাড়ু না দিয়ে চলে গেছে। আর তুই তো বাড়ীখানা পর্যন্ত দিলি নোংরা অপবিত্র ক'রে। যা, নর্দমাটা আগে পরিষ্কার ক'রে আয় গে তবে রুটি পাবি। যা, যা, কিছুটা কাজ ক'রে আয় গে, বাড়ীটা তো ছুঁয়ে অপবিত্র ক'রে দিলি!'

বখা চোখ তুলে একবার তাকালে ওর দিকে। গালাগালিটা সে হজম

করে নেয় নির্বিকারে। উঠানের একপাশে কাঠের পৈঠাটার নীচে হাত-ঢুকিয়ে দিলে। সে জানতো সোহিনী তার ছোট ঝাড়ু গাছটা রোজ লুকিয়ে রাখে ওখানটায়। তারপর ঝাড় দিতে লেগে গেল সে।

'মা, আমি পায়খানায় যাচ্ছি।' ছোট্ট একটা ছেলে উপরতলা থেকে চীৎকার ক'রে উঠল।

'না, না, উপরে গিয়ে কাজ নেই।' ছেলেটার মা বখার কাজ তদারক করতে করতে জবাব দিল।—'উপরেব পায়খানায় যাস নে বলছি ময়লাটা তাহলে সারাদিন পড়ে থাকবে। চট ক'রে নীচে নেমে আয় না। - নর্দমায় গিয়ে বসগে। ধাঙড়টা রয়েছে পরিষ্কার ক'রে নেবে 'খন।'

রাস্তায় অতগুলো লোকেব সামনে পুবীষ ত্যাগ করতে ছেলেটার বুঝি লজ্জা করছিল। সে মাথা নাড়ল: 'উঁহু।'

মা তেড়ে গেল ছেলেটাব দিকে। বখার জন্য যে রুটিটা এনেছিল বখাকে দিতে তা ভুলেই গেলো। উপবে গিযে ছেলেটাকে নীচে পাঠিয়ে দিল এক প্রকাব জোর ক'বে। বখাকে তারপর ডেকে বলল:

'এই বখিয়া, এই নে তোর রুটি।' রুটিখানা সে বখার দিকে ছুঁড়ে দেয় উপর থেকে।

বখা হাতের ঝাড়ু গাছটা পাশে রেখে দিয়ে পাকা ক্রিকেট খেলোয়াড়েব মতো রুটিখানা লুফে নিতে প্রস্তুত হযে দাঁড়ালো। কিন্তু কাগজের মত ফিন্‌ফিনে রুটিখানা ঘুড়ির মতো উড়তে উড়তে এসে পড়ল ভিজে স্যাঁতসেঁতে গলিটাব মাঝখানে। বখা চট্‌ ক'রে রুটিখানা তুলে নিল। তারপর চাপাটির সঙ্গে পুঁটলীতে বাঁধল। সামনেই ছেলেটা হাগছিল। নর্দমাটা পরিষ্কাব করতে তার ইচ্ছে হচ্ছিল না। বিরক্তি লাগছিল। ঝাড়ুখানা স্বস্থানে রেখে দিয়ে বাড়ীর দিকে সে পা বাড়াল। রুটির জন্য গিন্নীকে ধন্যবাদ দিতে ভুলেই গেলো। গৃহকর্তীর চোখ এড়ালো না তা। চেঁচিয়েউঠল:

'ওমা, আজকাল তোরা যে দেখছি রীতিমতো বড়লোক হয়ে গেছিস্। উই পোকার পাছায় ডানা গজালো কবে থেকে রে!'

'আমার হয়ে গেছে মা,' ছেলেটা নীচ থেকে চীৎকার ক'রে উঠল।

'পাশের বাড়ীর আচার-ওয়ালাদের কাঁউকে একটু জল দিতে বল্ না, বাবা। ওরা কেউ না থাকলে ধুলো দিয়ে পুঁছে নে।'

সিঁড়ির তলায় খানিকটা ঘুমিয়ে নেওয়ার পর সে ভেবেছিল সকাল বেলাকার সব পুঞ্জীভূত রাগ আর অপমানের দুর্বিসহ বোঝাটা যেন নেমে গেছে তার বুক থেকে। উবে গেছে বুঝি মনের সব বিক্ষুব্ধ উত্তাপ। কিন্তু পুরানো ক্ষতটা তার চাড়া মেরে আবার যেন চিতিয়ে উঠল। মনটা টনটন্ ক'রে উঠল ভয়ানক। উত্তপ্ত হয়ে উঠল কানদুটো। 'মন্দিরের দিকে আমার না গেলেই ঠিক হতো', সে বিড়বিড় ক'রে উঠল আপন মনে। রুটি ক'খানা তাহলে সোহিনী এসে নিয়ে যেতে পারতো। এখানে আসতে আমাকেও বা কে সেধেছিল?' মন্ত্রমুগ্ধের মতো সে চলল হেঁটে। দিনভর গু-মুৎ ঘাটার নোংরা কাজ নিয়ে পড়ে থাকলেও পরনের বিলেতি পোষাক-পরিচ্ছদ দিয়েছিল তাকে এক নূতন মর্যাদাবোধ। চোখ দুটি তার সহসা দপ ক'রে জ্বলে উঠল। 'নোংরা গলি থেকে রুটিখানা কুড়িয়ে না নিলে কি হতো না?' সে শুধায় নিজেকে। ছোট একটা বিশ্বাস তার বুক থেকে খসে পড়ল। অনেকটা সে স্বস্তি বোধ করল।

ভয়ানক খিদে পেয়ে গিয়েছিল। মনে হলো এক পাল ক্ষুধিত ইঁদুর ঘুরে বেড়াচ্ছে কিল্‌বিল্ ক'রে পেটের ভিতর। ধারালো দাঁত দিয়ে কুটিকুটি ক'রে ছিড়ে খাচ্ছে তার নাড়িভুঁড়িটাকে। গলাটা শুকিয়ে তার কাঠ হয়ে গেছে। থুতুটা হয়ে গেছে সাদা টানা আঠার মত। থুঃ ক'রে খানিকটা থুতু সে ফেলল মাটিতে।

শহর ছাড়িয়ে সে হেঁটে চলল ঘরের দিকে। শরীরটা যেন ভেঙ্গে পড়ছে। পা দুটো তার যেন চলছে না। মাথার পাগড়িটা

খুললে এখুনি টস্‌টস্‌ ক'রে ঘাম ঝরতে থাকে বুঝি কপাল বেয়ে।...সে মুখ তুলে তাকাল। সূর্যটা উঠে এসেছে ঠিক মাথার উপর। 'তাইতো, বেলা যে অনেক বেড়ে গেছে! মাত্র খান দুই চাপাটি নিয়ে আমি এখন বাড়ী ঢুকি কোন মুখে? -বাড়ীতে পা দিলে বাবা অমনি জিজ্ঞেস করবে, ভাল খাবার-দাবার কিছু আনলাম কিনা। ওরা মাত্র দুখান রুটি দিল, আমাব কি দোষ? খাবার আনতে সোহিনী যায়নি কেন, বাবা নিশ্চয় প্রশ্ন করবে। ব্যাপাবখানা তাঁকে বলব না কি? বাপ শুনলে ঠিক রাগ করবে।...

একদিনের কথা তার মনে পড়ল। সে তখন আরও ছোট ছিল। পল্টনের এক সিপাই নির্জন একস্থানে তাকে একাপেয়ে পিছু ধাওয়া করেছিল। বাড়ী ফিরে সে বাবাকে বলে দিয়েছিল সিপাই-এর কীর্তিখানা। বাবাব তখন কি রাগ! তাকে ধরে খুব ক'রে বকেছিল। বাবাটা সব সময় পরের হয়েই কথা কইবে। ভুলেও কস্মিনকালে আপনার পাতের দিকে ঝোল টানবে না। পুরুত্‌ঠাকুরটার কথা তার কানে তুলি কি ক'রে? ঘুণাক্ষরেও সে এটা বিশ্বাস করবে না। আর রাস্তার সেই ছোঁয়া ছুঁয়ির কথাটা বললে হয়ত তেলে-বেগুনে একেবারে জ্বলে উঠবে। বলে উঠবে: 'একদিন মাত্র নিজে কাজে যেতে পাবিনি, তোদের পাঠালাম, প্রথম দিনেই কিনা তোরা রাস্তায় একটা না একটা ঝগড়া-ঝাটি বাঁধিয়ে বসলি।' বাবা ঠিক এই কথা বলে উঠবে। আরও শুনিয়ে দেবে: 'কাজকর্ম তোরা শিখবি কবে থেকে?'...তার চাইতে বরং গিয়ে কিছু একটা মিথ্যা কথা বলাই ঢের ভাল। কিন্তু সোহিনী খাবার কেন আনতে যাইনি, বাবা কি ওকে জিজ্ঞেস না ক'রে ছেড়েছে? এত সকাল সকাল কেন সে বাড়ী ফিরেছে কারণটা নিশ্চয় জানতে চেয়েছে। ওকে কিছু না বলাই ভাল। কিন্তু বাবা কি আর প্রশ্ন না ক'রে ছাড়বে? যাক্‌, করুকগে, কপালে যাই থাকে থাক্‌!' মন থেকে সে সব দ্বিধা-সংকোচ আর দ্বন্দ্বের গুরুভার ঝেড়ে ফেলল। মুখ তুলে তাকাল আকাশের দিকে। দল ছাড়া একটা শকুন পাক দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে

শূন্যে। আব কয়েক খণ্ড মেঘকে কে যেন সেঁটে দিযেছে আকাশের গায়ে।...

আপন মনে নানান কথা ভাবতে ভাবতে বখা কখন বাড়ী এসে পৌছল নিজেই টের পায় নি। সে এসে দেখল, বাড়ীব সবাই বাইবে বসে বসে রোদ পোহাচ্ছে। ধাঙ্গডদেব বস্তীর রাস্তা-ঘাটে সবকাবী আলোব কোন বালাই নেই। গোটা বাত্রিটা ধোঁযাচ্ছন্ন, ভিজে, স্যাতসেঁতে, ঘিঞ্জি খুপরির মধ্যে ওদেব কাটিয়ে দিতে হয় চাক্‌চাক্ জমাট অন্ধকাবে। দিনেব বেলা খোলা মেলা জায়গায় ছুটে এসে ওরা রাত্রির নিষ্প্রদীপ অন্ধকাবেব জের বুঝি আদায় ক'বে নেয় সুদে আসলে। অনেকেই নিজেদেব দড়িব খাটিয়া-গুলো বাইবে টেনে এনে তার উপব গায়ে দেবাব মোটা চটেব কম্বলগুলো পেতে বসে থাকে। কিন্তু গবম কালটায় ওদেব বেগ পেতে হয় বীতিমত। শীতকালে কিন্তু সূর্য ওঠাব সঙ্গে সঙ্গেই ওবা বোদে বেবিয়ে আসে। বাইবে বসে থাকে সন্ধ্যা পর্যন্ত।

ঘবেব বাইবে বাবান্দায এক জায়গায় একখানি হেঁসেলেব মত ক'বে নিয়ে ছিল সোহিনীব মা। ওদের হেঁসেলটা হিন্দুদের সচবাচব বান্নাঘরেব মতো নয। ছোঁয়াছুঁযিব অত কড়া আচাব বিচাব নেই। না আছে তাব চারটি প্রাচীব ; না আছে স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানেব বালাই। সোহিনী তবু মাব হেঁসেলখানা আগলে থাকে। উনানেব পাশেই পব পর দুখণ্ড ঝাড়ু বোজ বাখা হয খাড়া ক'বে। তার পাশে নোংবা ময়লা সরাবার একটা খালি ঝুড়ি। দুটো মাটিব কলসী, একটা হাঁড়ি, আব সস্তা এনামেলের একটা মগ বয়েছে এখানে ওখানে ছড়ানো। সব কটা বাসন কোসনই মাটিব। নীচে কালি জমে পুরু হযে উঠেছে। মা মারা যাবার পর থেকে একদিনও বাসন কটা আব মাজা হয়নি। সোহিনী এখনো ছোট। ঘর সংসারের অভিজ্ঞতা তাব কোথায়? তা ছাড়া বাইরের কাজকর্ম নিয়ে তাকে সারাদিন ব্যস্ত থাকতে হয। হাত দুটি থাকে জোড়া।

ঘরের দিকে অত নজর দেবার সময় কোথায়। শুধু তাই নয়, জলেরও আবার নেহাৎ টানাটানি। ওরা ভাঙ্গি; সারাদিন নোংরা কাজকর্ম নিয়ে থাকলেও ঘর ধোয়া মোছার জন্য এক কলসী অতিরিক্ত জল মিলবে না।

'রখাটা গেল কোথায়?' বোনের হাতে খাবারের পুঁটলিটা তুলে দিয়ে বখা শুধাল।

'সোহিনী চুপ ক'রে রইল। লখা জবাব দিল:

'হতচ্ছাড়া খাবার আনতে গেছে পল্টনের সেই লঙ্গড়খানা থেকে।' খাটিয়াটা হেঁসেলের কাছে টেনে এনে বুড়োটা তার উপর চেপে বসেছিল। গড়গড করে হুঁকোটায় তামাক খাচ্ছিল আর খক্-খক্ করে কাশছিল। বেশ ফিট্‌ফাট্ দেখাচ্ছিল ওকে। লোম তোলা ছোট চিম্‌টিখানা দিয়ে বুঝি এতক্ষণ বসে বসে চিবুকের অবাঞ্ছিত লোমকটা উপড়ে ফেলেছিল। চিমটেটা আর রঙ-করা একখানা ছোট দেশী আয়না তার বাপ সব সময় বালিশের তলায় রেখে দেয়। সকালটা বোধ হয় বুড়োর ভালোই কেটেছে। চোখে-মুখে ওর কেমন একটা প্রশান্ত ভাব।...

'হ্যাঁরে, ভালো দেখে খাবার-টাবার কিছু আনলি?' বখাকে বুড়ো শুধালে। 'একটু চাট্‌নি, ভালো ভালো একটু তরি-তরকারী মুখে দিতে মনটা আইটাই করে।'

'মাত্র খান তুই চাপাটি তো দিল ওরা।' জবাব দিল বখা।

'নচ্ছার বেটা, জানি তুই কোন কাজের না!' বিড়বিড় ক'রে উঠল লখা রাগে। 'ঐ হতচ্ছাড়া হারামজাদাটা লঙ্গড়খানা থেকে ভাল খাবার কিছু আনল কিনা দেখি।'

ভাল খাবারের কথা মনে হতেই লখা জমাদারের জিভে জল এসে যায়। মনে পড়ে সহরে লালাদের বিয়ে বাড়ীর সেই বিপুল ভুরিভোজনের কথাটা। বাবুদের পাতের রাশি রাশি উচ্ছিষ্ট লুচি, মণ্ডা, চিংড়ি কাট্‌লেট, নানান্ তরি-তরকারী, অম্বল, পায়েস, মিষ্টির ছড়াছড়ি। রসুই থেকে ওদের জন্য আলাদা

খাবারের ব্যবস্থাও হয়েছিল। অমন দিন কি লখা কখনও ভুলতে পারে? বাবুদের বাড়ীতে কাজ করতে এসে বাড়ীর মেয়েরা বিয়ের উপযোগী বডোসডো হয়ে উঠল কিনা দেখতো সে। ওদের তাড়াতাড়ি সাদি দিয়ে দেবার জন্ম বাড়ীর কর্তা আর গিন্নীদেব পীড়াপীড়ি করতো। বুলাশা শহরের অধিকাংশ মেয়ের বাল্য-বিবাহেব জন্ম লখাই হয়ে পডতো অনেকটা উদ্‌যোগী মেয়ের বিয়ের সময় বাপ-মাবা লখার কথা ভুলতো না। ওকে ডেকে এনে একজোড়া কাপড আব বড বকমেব একটা সিধের ব্যবস্থাও ক'রে দিত।...

লখার আরও মনে পড়ে, যুদ্ধ জেতাব পর লড়াই ফেরতা তাদেব পল্টনেব ফৌজেরাও খানাপিনা ভোজের কি বিবাট ঘটাটাই না করেছিল। পল্টনের সব ধাওডদের সে হোল জমাদার। পবিবেশনের ভারটা ছিল তার উপর। নিজেই সব কিছু সে তদারক কবছিল। এক বাক্স মিষ্টি বেমালুম সবিয়ে এনে দিয়েছিল সে বখাব মাকে। সারা বছরে ধবে খেয়েও ফুরোতে পাবেনি তারা।

'শহরেব লোকজনদের আমি তেমন ভাল ক'রে চিনি না। অনেক বাড়ীতে খাবারের জন্ম যাওয়াই হয়ে ওঠেনি।' বখা আপন অপটুতার ফিরিস্তি গাইল। লখা তখনও আগেকার ভোজের চব্য-চষ্য-লেহ্য-পেয়র স্বপ্নে মশ্‌গুল। ছেলের কথায় চটে উঠে। বলল:

'সবটা এখনও চিনে নিস্‌নি কেন? আমি চোখ দুটি বুজলে তোকে সব কিছু তদারক ক'রে বেডাতে হবে না?'

প্রথম দিন শহরে কাজ করতে গিয়ে কি চরম অপমান আর নির্যাতনটাই না তাকে আজ ভোগ করতে হয়েছে, ভবিষ্যতে আজীবন ওই কাজ ক'রে যেতে হবে ভাবতেই বখা সভয়ে আঁতকে উঠল রীতিমত। চোখের উপর তার ভেসে উঠল: ক্রুদ্ধ এক জনতা তাকে যেন তাড়া করেছে, বেঁটে-খাটো এক বামুনঠাকুর দু'হাত সমান শূন্যে ছুঁড়ে যেন চীৎকার করে বলছে: 'গেল-গেল, সব অপবিত্র হয়ে গেল!' চোখেব উপর তার আরও ভেসে ওঠে: নর্দমাটা ঝাড়ু দেয়নি বলে ওবাড়ীর সেই গিন্নীটা তাকে যেন বকছে যিনি

ওপরের দোতলা থেকে চাপাটিখানা ছুঁড়ে দিয়েছিল।—'না-না—!' অন্তরাত্মা তার যেন তীব্র প্রতিবাদ ক'রে উঠল। 'না—কখনো না। এর চাইতে বৃটিশ-ফৌজদের ব্যারাকে সাহেব-সুবোদর কমোডগুলো পরিষ্কার করা ঢের ভালো।' বখা বিড়্বিড়্ ক'রে উঠে আপন মনে।

'তোর আজ হোল কি রে?' ছেলের গম্ভীর থমথমে মুখ আর আরক্ত চোখ দুটোর দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল বখার বাপ: 'হাঁপিয়ে পড়েছিস নাকি খুব?'

বাপের সস্নেহ কণ্ঠে বখার মনটি জুড়িয়ে গেল। আর একটু হলে সে বুঝি কেঁদেই ফেলত। নাট-মন্দিরের ঘটনাটা সব বলে ফেলবে নাকি? মনটা চুলবুল ক'রে উঠল। না, বলা ঠিক উচিত হবে না। ইতস্তত করল সে মুহূর্তখানেক। তারপর ব্যাপারটা চেপে রাখবার চেষ্টা ক'রে জবাব দিল: "না, কিছু হয়নি বাবা।' ছেলের কথার পুনরাবৃত্তি করল বখার বাপ। বললে: 'নিশ্চয় কিছু একটা হয়েছে; ঠিক কথাটা বলে ফেল না।'

বখা নিজেকে আর চেপে রাখতে পারছিল না। বাপের সস্নেহ কণ্ঠে তার হৃদয়ের মীড়গুলি যেন অনুরণিত হয়ে উঠল। দম যেন তার বন্ধ হয়ে এলো। মনে হলো, সে যেন এক্ষুনি ভেঙ্গে পড়বে। তুবড়ির মত সহসা সে ফেটে পড়লো: 'সকালবেলা ওরা আজ খামকা আমায় অপমান করল বাবা। রাস্তা ধরে হেঁটে যাচ্ছিলাম, এমন সময় একটা লোক আমায় দিল ছুঁয়ে। তারপর আমায় যাচ্ছেতাই গালাগালি করতে লাগল। ধরে মারলও।' বখার গলাটা রুদ্ধ হয়ে এলো।

'হ্যাঁরে বেটা চলবার সময় তুই কি হাঁক ছেড়ে হুঁশিয়ার করে চলিস্নি?'

বাপের কথা শুনে বখার পিত্ত জ্বলে উঠল। সত্যি কথা বললে তার বাপ যে এমন ধারা বলবে সে আগে থেকেই জানতো। কথাটা তার বাপকে যেন না শোনালেই ভালো হতো, সে ভাবল।

ছেলের বিক্ষুব্ধ মুখের দিকে তাকিয়ে লখার মনটা বোধ হয় ব্যথায় টন্‌টন্ ক'রে উঠল। মোলায়েম কণ্ঠে বলল:

'আবও একটু হুঁসিয়াব হ'যে চলাফেবা করতে পাবিসনে বেটা ?'

'কিন্তু তাতে লাভ কি ?' বথা খেঁকিয়ে উঠল—'হাজার হাঁক-ডাক ছাড়ু না কেন ওরা আমাদেব প্রতি দুর্ব্যবহার কববেই। আমবা ওদেব নোংবা ময়লা সব পরিষ্কাব করি কিনা তাই তো আমাদেব পেয়ে বসে। ভাবে, আমবা সব নীচু, ছোট জাত। মন্দিবেব ঐ বামুন পণ্ডিতটা আজ করলে কি জান ? সোহিনীব উপর বলাৎকাব কবতে চেষ্টা কবেছিল। তারপব সব গেল—গেল, ছুঁয়ে দিল—ছুঁয়ে দিল' বলে' চীৎকাব সুরু ক'বে দিল। সেকবা পাড়ায় বড বাড়ীখানাব সেই গিন্নীটা পাঁচতলাব বাবান্দা থেকে কিনা ছুঁড়ে দিল আমাব খাবাবটা। না, আমি আর ওকাজ কবতে পাববো না বাবা। কাজে আর যাবো না কক্ষনো।'

লখা বিচলিত হোল কিছুটা। কিন্তু ওব প্রকাণ্ড গোঁফজোড়াটিব আড়ালে একখানি ক্ষুব্ধ অথর্ব হাসিব বেখা দেখা দিল। ব্যস্ত হয়ে শুধাল :

'হ্যাঁ, পাল্টা নিসনি তো তুই ? মাবধোব গালি-গালাজ তুই কিছু কবিস্ নি তো ?'

বাবুলোকদেব কাছ থেকে চিবকাল সে গালি-গালাজ, লাথি-জুতো খেয়ে এসেছে মুখ বুজে। মাথা তুলে প্রতিবাদ কববাব একদিনও তাব সাহস হয়নি। মাথা পাগলা ছেলেটা কি জানি আজ কি ক'রে বসলো। লখাব মনটা শঙ্কিত হয়ে উঠল ছেলেব হঠকাবিতাব জন্য।

'না পাল্টা আমিও একচোট্ নিলে পাবতাম। কিন্তু নিই নি।' বখা জবাব দিল।

'নাবে বেটা না,' লখা ছেলেকে প্রবোধ দিল- 'উঁনারা বাবুলোক—উঁনাদেব বিরুদ্ধে আমাদের কিছু করা সাজে না। দাবোগাব কাছে যতই তুই নালিশ করনা গিয়ে উঁদের একটা কথাতেই কিন্তু সব নালিশ হয়ে যাবে নাকচ। হবে না ? উঁবা যে আমাদেব মুনিব লোক। মান্তিগণ্যি ক'রে চলতে হয় উঁনাদের। যা হুকুম করবে তাই কবতে হয। সবাই সমান

না রে বেটা, সবাই সমান না। ওঁনাদের মধ্যেও দয়ালু—ভালো লোকের অভাব নাই।'

লখা ছেলের কুপিত মুখের দিকে একবার তাকাল আড়চোখে। বাবু লোকদের প্রতি ছেলের বিতৃষ্ণার কথা তার অজানা ছিল না। সান্ত্বনার সুরে বলল :

'তবে শোন্ বেটা, তুই যখন খুব ছোট ছিলি তোর তখন একবার ভারি ব্যামো হয়। এই দেখেই আমি শহরের হাকিম ভগবান্ দাসের বাড়ীর পানে ছুটলাম। হাকিম সাহেবের বাড়ীর সামনে গিয়ে আমি সুরু ক'রে দিলাম ডাকাডাকি। কিন্তু কেউ যদি আমার শুনতো ডাকাডাকি! ডাক্তারবাবুর দাওয়াইখানার পাশ দিয়ে দেখলাম যাচ্ছেন এক বাবু। আমি তাঁর কাছে গিয়ে দু'হাত জোড় ক'রে বললাম : বাবুজী, ও বাবুজী, হাকিমজীকে একবার আমার কথাটা গিয়ে বলেন না; ভগবান আপনার দয়া করবেন। সেই কখন থেকে চীৎকার করছি বাবুজী, কতজনকে সাধাসাধি করলাম। কেউ কিন্তু হাকিমসাহেবকে গিয়ে আমার কথাটা বলল না। আমার ছেলের ভারি ব্যারাম বাবুজী। কাল রাত থেকে বেহুঁশ হয়ে পড়ে আছে। হাকিমজীকে একটু দাওয়াই দিতে বলুন না।'

'যা, যা, সরে যা—সরে যা।' বাবুটি সহসা খেঁকিয়ে উঠলেন। 'গায়ের উপর এসে পড়বি নাকি তুই? সকালবেলা ফের স্নান করব নাকি তোর জন্য? আমরা সবাই সেই কখন থেকে বসে আছি, অফিসের তাড়াহুড়ো, হাকিমসাহেব আমাদের দেখে উঠবার ফুরসৎ পাচ্ছেন না। তা আমাদের না দেখে ওদের দেখতে হবে আগে! বেটা সারাদিন তুই করবি কি? যা, বসে থাক্‌গে গিয়ে, না হয় আসিস্ অন্যদিন।'...এই বলে বাবুটি দাওয়াইখানার মধ্যে ঢুকে পড়ল হন্‌হন্ ক'রে।...আমি কিন্তু তবু ঠাঁই দাঁড়িয়ে রইলাম।. ওপাশ দিয়ে যাকে যেতে দেখলাম, তার পায়ে পড়ে কান্নাকাটি ক'রে বলতে লাগলাম, হাকিমসাহেবকে আমার কথাটা একবার গিয়ে জানান না। কিন্তু খাঙড়দের কথা কেই বা শোনে? সবাই নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত।...

'কোণের আস্তাকুঁড়টার পাশে ঘন্টাখানেক ধরে আমি ঠাঁই দাঁড়িয়ে রইলাম। একঝাঁক বিছে আমায় সর্বাঙ্গে যেন হুল ফোটাতে লাগল। হাকিমজীর দাওয়াখানায় সারি সারি ঔষধের শিশিগুলো দেখে রক্তজল-করা আমার ট্যাঁকের পয়সা কটা দিয়ে অসুস্থ ছেলেটার জন্য একফোঁটা ওষুধ কিনতে পারছিনা ভাবতেই আমার মনটা হু হু ক'রে উঠল। হাকিম সাহেবের বাড়ীর সামনে দাঁড়িয়ে ছিলাম বটে, আমার মনটা কিন্তু তোর কাছেই পড়েছিল। ভয় হোতে লাগল তুই বুঝি আর বাঁচবিনে। শেষবারের মত তোকে একবার দেখে যেতে কে যেন বলে উঠল আমার কানে কানে। অমনি আমি ছুটলাম বাড়ীর দিকে।...

'তোর মা তোকে তখন কোলে নিয়ে বসেছিল। আমায় দেখে ছুটে এল। হ্যাগা, দাওয়াই আনলে ?—

'বোখারের ঘোরে তুই তখন প্রলাপ বকছিলি। আমায় চিনতে পর্যন্ত পারলি নে। লোকজন সবাই বলাবলি করতে লাগল তোকে বাইরের উঠানে এবার নিয়ে আসতে হবে, তাই আমি হাকিম সাহেবের বাড়ীর দিকে আবার ছুটলাম। তোর মা পেছন থেকে ডেকে বললে : —এখন আর ওষুধে কি হবে ? আমি কিন্তু শুনলাম না। হাকিম সাহেবের বাড়ীর দিকে ছুটলাম। তাঁর বাড়ী এসে সরাসরি পর্দা ঠেলে ঢুকে পড়লাম ভেতরে। পায়ের উপর আছড়ে পড়ে বললাম : ছেলেটার ধড়ে এখনো প্রাণ আছে হাকিমজী, আমার ছেলেটাকে বাঁচান। আমি আপনার কেনা গোলাম হয়ে থাকব আজীবন। দয়া করুন, হাকিমজী, দয়া করুন ! ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করবেন।...

'ভাঙ্গি ! ভাঙ্গি !'

দাওয়াইখানার মধ্যে সহসা হৈ হৈ পড়ে গেল। হাকিম সাহেবের পা দুটো আমায় জড়িয়ে ধরতে দেখে আশপাশের লোকগুলো যে যেখানে পারে ছিটকে পড়তে লাগলো। হাকিম সাহেবের মুখখানা

শুকিয়ে ফ্যাকাশে হয়ে গেলো। গলার স্বর সপ্তমে চড়িয়ে তিনি চীৎকার ক'রে উঠলেন: বেটা চাঁড়াল, কার হুকুমে তুই এখানে ঢুকেছিস? আমার হু'পা জড়িয়ে এদিকে তো খুব কান্না কাটি হচ্ছে, আমার কেনা গোলাম হয়ে থাকবি—অমুক হবি তমুক হবি! বলি, আমার শ'ত শ'ত টাকার ওষুধ যে ছুঁয়ে নষ্ট ক'রে দিলি, বেটা তুই তার দাম দিবি?...

'হাউ মাউ ক'রে আমি তবু কাঁদতে লাগলাম। বললাম, জ্ঞান ছিল না মহারাজ, ভুলে গেছলাম সব। আমার দুগালে দুঁজুতি মারুন। আপনি মহৎব্যক্তি মহারাজ। গরীবের বাপ মা। আমি কি আপনার ওষুধের দাম দিতে পারি? যা হুকুম করবেন, তাই করব, মহারাজ। ছেলেটা মরো-মরো—বাঁচবে না হয়ত। দয়া ক'রে একবার পায়ের ধুলো দিয়ে যান—একটু দাওয়াই দিয়ে যান মহারাজ!...

'হাকিমজী সবেগে মাথা নাড়লেন। চীৎকার ক'রে বলে উঠলেন: হুঁ: যা হুকুম করবেন, তাই করব! বলি হারামজাদা, হন্তদন্ত হয়ে দাওয়াই খানার মধ্যে ঢুকে পড়লেই কি তোর ওষুধ মিলবে ভেবেছিস?...

'না-না সরকার, বাইরে অনেকক্ষণ ধরেই আমি ঠাঁই দাঁড়িয়ে ছিলাম। ওপাশ দিয়ে যারা আসছিল, তাদের প্রত্যেকের পায়ে পড়ে কান্নাকাটি ক'রে বলছিলাম: হুজুরকে একবার খবরটা দিওগো আমার ছেলের ভারি ব্যামো। কিন্তু সরকার, কেউ আমার দিকে একবার ফিরেও তাকালে না। এতটুকু দয়া করলে না। ছেলেটাকে বাঁচান হুজুর, সারারাত ওকে আমি কোলে ক'রে বেড়িয়েছি। ভেবেছিলাম রাত পোহালেই আপনার কাছে ছুটে এসে একটু দাওয়াই নিয়ে যাবো। রাত-দুপুরে এলে কে আমার ডাক শুনে দরজা খুলে দিত বলুন?...

'হাকিমজীর দিলটা বুঝি গলে গেল। কাগজ পেন্সিল নিয়ে খসখস্ করে তিনি বুঝি ব্যবস্থাপত্র লিখে চলছিলেন। ঠিক এমনি সময় তোর চাচা হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এসে চীৎকার ক'রে উঠল:

'লখা, ও লখা : ছেলেটা যে মরে গেল রে !…

'তাই শুনে আমি অমনি ছুটে বেরিয়ে এলাম। হাকিমজীর কলমটাও দেখলাম সহসা থেমে গেল। বাড়ী এসে দেখি তোর অবস্থা তখন ভারি খারাপ। তোকে সবাই বাইরের উঠানে নিয়ে এসেছে। আর তোর মা তখন কাঁদছে মাথা কুটে কুটে।…

একটু পরেই বাইরের দরজায় কে যেন এসে ঘা দিলো। শোনরে বেটা,—তোর চাচা বাইরে এসে দেখে কি, হাকিমজী স্বয়ং এসে হাজির—হুজুর নিজে এসেই পায়ের ধূলো দিয়েছেন আমাদের বাড়ীতে। হাকিমজী সত্যি ভারী ভালো লোক। তিনি তোর নাড়ী টিপে দেখলেন। যমের বাড়ী থেকে তোকে সেবার তিনিই তো ফিরিয়ে আনলেন।'…

'তিনি তো আমাকে জানে মেরেও ফেলতে পারতেন।' রথা টিপনী কেটে বসল।

'না রে, না।' লখা বললে : 'ওঁরা সত্যি আচ্ছা আদমি—দয়া-মায়ার শরীর ওদের। আমরা জানিনে কিনা, ওদের শাস্ত্রে যে বারণ আছে; তাইতো ওঁরা আমাদের ছোঁন না—আমাদের ছায়া মাড়ান না।'

নিয়তির বিধানকে নির্বিবাদে মাথা পেতে নেওয়া, আর নিজেকে চিরকাল খাটো ক'রে দেখা, নিজের এই জন্মগত পঙ্গু দুবলতা সম্পর্কে লখা আজিও সচেতন হয়ে উঠলো না। এই দীর্ঘ ফিরিস্তির কোথাও তা প্রকাশ পেলো না। প্রতিবারই সে মনকে চোখ ঠেরে এসেছে—এসেছে আত্মপ্রবঞ্চনা ক'রে।

রথা কিন্তু বিচলিত হয়ে ওঠে। তার নিজের অমন একটা সাংঘাতিক অসুখের কথা বাপের মুখে বার বার উচ্চারিত হতে শুনে নিজের প্রতি কেমন যেন করুণা জাগে তার। চোখ ফেটে জল এসে পড়ে। আত্মসংবরণ করতে রীতিমতো বেগ পেতে হয়।

'হতচ্ছাড়া রথাটা কোথাও ঠিক খেলায় মেতে গেছে।' কথার মোড় ফিরিয়ে বুড়ো সহসা বক্‌বক্ করতে থাকে : 'তোরা যখন খুশি খাস, আমি

আর পারছিনে। কই রে সোহিনী, দু-একখান রুটি দিবি তো দে খেয়ে নি।'

'তরিতরকারী কিছু নেই কিন্তু,' সোহিনী জবাব দিলে: 'সকালবেলাকার খানিকটা চা আছে বাবা। দেব, রুটির সঙ্গে ভিজিয়ে খেতে পারবে?'

'যা হয় পোড়া বাপু, খিদে আর সয় না।' বুড়ো এক গেঁয়ো ছড়া কেটে বিড়্‌বিড়্‌ ক'রে উঠলো। সোহিনী চা-টা গরম করতে গেলো।

রথা জলের কলসীটার কাছে গিয়ে বসল উবু হয়ে। টিনের মগ থেকে খানিকটা জল নিয়ে হাত ও মুখখানা একবার ধুয়ে নিল। বাপের মুখে খাবারের কথা শুনে তার নিজেরও যেন খুব খিদে পেয়ে গেলো।

রথার এবার টিকির সন্ধান মিললো। নেড়া মাথা, তার উপর এক হাঁড়ি খাবার বসিয়ে আর এক হাতে একটা প্যান ঝুলিয়ে রথার পায়ের মস্তবড়ো এক জোড়া ফিতেহীন বিবর্ণ মিলিটারী বুট পায়ে দিয়ে সশব্দে একরাশ ধুলা উড়াতে উড়াতে দেখা গেলো ওকে বাড়ী ফিরতে। গায়ে একটা ছেঁড়া ফ্ল্যানেলের সার্ট। জামার হাতা দুটোয় নাক ঝেড়ে নোংরা কদর্য ক'রে রেখেছে সে। ঢিলে জামাটা হাঁটুর উপর লেপটে পায়ে প্রতি পদে পদে চলার বাধা সৃষ্টি করছে। মুখখানা ক্লান্ত বিষণ্ণ। দুই কোল বেয়ে থুতু পড়ে পুরু হয়ে উঠেছে। ভন্‌ভন্‌ ক'রে মাছি উড়ছে তার উপর। নোংরা মুখখানাকে আরো বিশ্রী ক'রে রেখেছে ছোটো খাটো দুটি চটুল চোখ, আর অপ্রশস্ত কপালটা। বড় বড় কান দুটোর উপর রোদ পড়ে চিক্‌চিক্‌ করছে। চোখ দুটোই যা ওর ক্ষুদে সয়তানি বুদ্ধির পরিচয় দেয়। রথাই তো খাঁটি প্রতিনিধি অভিশপ্ত অবজ্ঞাত স্যাঁৎসেঁতে সেই ঘিঞ্জী অছুত পল্লীর, যেখানে একটু আলো নেই, বাতাস নেই, একফোঁটা জল বা নর্দমার কোন বালাই নেই; শহরের শত শত লোক যেখানে এসে ত্যাগ ক'রে যায় পুরীষ, সেই সরকারী টাট্টিখানার আশপাশে যারা পড়ে থাকে মাথা গুঁজে, বুক ভরে যারা দম নেয় ইতস্তত বিক্ষিপ্ত নিজেদের

পুরীষের উৎকট দুর্গন্ধময় বাতাস; দিনেও যেখানে রাত্রির আঁধার আর রাত্রিতে যেখানে ঘন তমিস্রার চাক চাক পুঞ্জীভূত নিথর নিবন্ধ্র নিশা। অভিশপ্ত সেই পৃথিবীর নোংরা পূতিময় আবহাওয়ায় হয়ে উঠেছে লালিত পালিত। বড় হয়ে উঠেছে নোংরা সেই পরিবেশে। অচ্ছুত পল্লীর আশপাশের থমথমে আবহাওয়া তাকে গড়ে তুলেছে নিস্পৃহ, উদাসীন আর আলস্যপরায়ণ ক'রে। অটুট জীবনী-শক্তিতে ভরপুর সে। তবু প্রাণরস তার প্রতিদিন শুষে নিচ্ছে ম্যালেরিয়ার করাল জিহ্বা। প্রাণে একেবারে না মরলেও দিন দিন সে প্রাণহীন, ক্ষীয়মান হয়ে পড়ছিল। মাছি আর মশাগুলো যেন ইয়ারে দোস্ত পাতিয়ে নিয়েছে ছোটবেলা থেকে তার সঙ্গে।

'এতক্ষণে ফিরলি বুঝি?' রথা চীৎকার ক'রে উঠলো।

রথা দাদার কথার কোন জবাব দিল না। রান্নাঘরে যেখানটায় মোহিনী বসেছিল এগিয়ে গেল সেদিকে। মাথার খাবারের চাঙারিটা বোনের সামনে সশব্দে নামিয়ে দিয়ে নিজেও সে মেজের উপর থেবড়ে বসে পড়লো। তারপর খাবলা খাবলা চাঙারি থেকে সে খাবার তুলে খেতে লাগলো। গালের একদিকটা তার উঠছে ফুলে ফুলে। খাচ্ছে যেন পেটুকের মতো।

'অন্ততঃ হাতটা একবার ধুয়ে নে জংলি কোথাকার।' যে হাতে খাচ্ছিল সে হাত দিয়েই রথাকে নাক ঝাড়তে দেখে রথা বলে উঠল বিরক্ত হয়ে।

'নিজের চরকায় নিজে তেল দাওগে।' রথাও তিরিক্ষি হয়ে জবাব দিল সমান গলায়। সে জানে খাটিয়ার উপর বাবা বসে আছে সশরীরে। তাকে ছেড়ে বাপ কোনদিন রথার হয়ে কথা কইতে আসবে না। তার প্রতিই যে বাপের টান বেশী তার জানতে বাকি নেই।

'আয়নার সামনে গিয়ে নিজের চেহারাখানা একবার দেখে আয়গে যা!' রথাও জবাব দিল গলা চড়িয়ে।

'ওহো, তোরা সবাই আবার ওর পিছু লাগলি কেন?' লথা বাধা দিল: 'খালি আজকের মতো ঝগড়াঝাটিটা না ক'রে থাকতে পারিসনে?'

'এস দাদা, একখানা রুটি খাও।' সোহিনী সস্নেহে বলে উঠল।

একান্ত অনিচ্ছা সত্বেও বথা তাব চেয়াব ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। সোহিনীর কাছে গিয়ে বসে পড়ে খাবাবেব চাঙাবিব মধ্যে ডান হাতখানা ঢুকিয়ে দিল। দেখল একগাদা খাবাব আব খানকযেক ছেড়া ও আস্ত চাপাটি রয়েছে চাঙাবিটাব ভেতব। একটা হাঁড়িতে খানিকটা ডাল তবকাবীও আছে।

এঁটো হাতে খাবাবেব চাঙাবিটা থেকে ওবা সবাই খেতে সুরু কবল। বাববাব নোংবা এঁটো হাত ডুবিয়ে ডুবিযে বখাব খাওয়াব ধবণ দেখে বথা নাক সিঁটকাল বিবক্তিতে। সবে সে পেছন ফিবে বসল। খাবাবেব চাঙাবিব মধ্যে অর্ধভুক্ত একটুকবো ভিজে চট্‌চটে রুটিব উপব হাত পডতেই হাতখানা সে সর্প-পৃষ্টেব মত তৎক্ষণাৎ সবিযে নিল। চোখেব উপব তাব ভেসে উঠল: পাতেব এঁটো কুটো থালায ক'বে নিযে কোন সিপাই বুঝি এসেছিল আঁচাতে। বখাকে সহসা দেখতে পেযেই বুঝি বাসন ধোযা এঁটোকুটোগুলো বথাব চাঙাবিতে ঢেলে দেয। ছবিটা তাব চোখেব উপব ভেসে উঠতেই গা-টা তাব ঘিন্‌ঘিন্ ক'বে উঠল। মনে হোল, এখুনি বুঝি পেট ফেটে বমি আসবে। হাতেব রুটিটা দূবে ছুঁড়ে দিযে তডাক্ ক'বে সে উঠে দাঁডাল।

'কি বে খেলিনে, তোব না খুব খিদে পেযেছিল?' ছেলেকে সহসা উঠে পড়তে দেখে লখা প্রশ্ন কবল।

নীচু হযে বথা মগ থেকে জল নিযে হাত ধুতে লাগল। বাপেব প্রশ্নেব কোন জবাব দিল না। কি জবাবই বা দেবে সে? খাবাব দেখে গা ঘিন্‌ঘিন্ কবছে বললেই কি আব ওবা বিশ্বাস কববে? তবু ওজব একটা সে খুঁজে বললে:

'রামচরণদেব বাডীতে আজ যে আমাব নেমন্তন্ন। ওব বোনেব আজ সাদি! না গেলে ভয়ানক বাগ কববে।'

অমন নির্জলা মিথ্যেটা বলতে তাব কানেও কেমন যেন বাধ-বাধ ঠেকছিল।

বামচবণেব বোনের সাদিতে যাচ্ছে কেন সে, নিজেও বুঝে উঠতে পারলে না। কেউ তাকে নেমন্তন্ন কবেনি। গুলাবও তো জন্মেও কোনদিন কববে না : যা কুঁদুলে, ছেলেকে বিগড়ে দিল বলে বথাকে হামেশা গালমন্দ কবতে কসুব কবে না। বামচবণও কবেনি নিমন্ত্রণ। আর তাব বোনেব তো কথাই ওঠে না। বছব দশেকেব পব থেকে বীতিমত 'বড' হয়ে সে তো আব তাব সঙ্গে কথাই বলেনি কোনদিন। তবু যাচ্ছে কেন সে? গায়ে পড়ে খামকা বিয়ে বাড়ীতে যাওযাব কি বা দবকাব?...

বাড়ী থেকে বেবিযে পড়তে পাবলেই যেন বেঁচে যায। বামচবণদেব বাড়ী যাচ্ছে কেন সে? শেষবাবেব মতো তাব বোনকে দেখে আসতে বুঝি? শুধাল সে নিজেকে। বামচবণেব বোনেব কচি মুখখানি ভেসে ওঠে তাব চোখেব উপব। ন্যাড়া মাথা ছোট্ট একটা মেয়ে : গাযে লাল টুকটুকে বঙ্‌চঙে একটা জামা। তাব উপব শাদা ফুল তোলা—খৃপিদেব জামা যেমন হযে থাকে। দূব থেকে ওকে দেখলে বাস্তাব বানব-নাচিযেদেব ক্ষুদে বানব বলেই ভুল হয। ওবই তখন কি বা বযেস। বড জোব বছব আষ্টেক হবে; মাথায় জবীব কাজ কবা এক টুপি পবে ঘুবে বেড়াতো সে তখন ফবফব ক'বে। জবীব সেই টুপিটা এক মহাজনদেব বাড়ী থেকে চেযে এনেছিল তাব বাপ। মহাজন-বাড়ীব ছেলেপিলেদেব পবিত্যক্ত জামা কাপড়ে ওদেব ভাইবোন তিন জনেব সাবা বছবেব কাপড জামাব অভাব দিব্যি মিটে যেত। বথাব মনে পড়ে বামচবণ আব ছোটাব সঙ্গে পল্টনে খেলতে খেলতে অনেক সময ওবা বাড়ী ফিবে আসতো। সবাই তখন গিযে 'বৌ বৌ' খেলত। বামচবণেব ছোট বোনটি বঙ্‌চঙে এক ফ্রক পড়তো বলে খেলা ঘবে ওকেই বৌ সাজতে হ'তো। আব বথাব মাথায় সর্বদা জবীব টুপি থাকত বলে তাকে সাজতে হ'তো বব। বস্তীব অপব ছেলেবা কনে বা ববযাত্রী সাজতো কোন না কোন পক্ষেব।...বথাব আরও মনে পড়ে, নেড়া মাথা পুঁচকে ও মেযেটব বব সাজতো বলে ছোটা

তাকে কত ঠাট্টাই না করত। রামচরণের বোনটাকে দেখে তারও হাসি পেতো অনেক সময়। তবু ছোটার কথা শুনে সে চটে উঠত হাড়ে-হাড়ে। রামচরণের বোনের পক্ষ নিয়ে কতোদিন না সে ঝগড়া করেছে নিজের বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে। সেদিনকার সেই নেড়া-মাথা পুঁচকে মেয়েটা মাথায় আজ বড় হয়ে উঠেছে অনেক খানি। ঢলঢলে গৌরবরণ মুখখানা; মাথায় কালো কুচকুচে একরাশ চুল। রূপান্তরিত হয়ে গেছে যেন তন্বী সুন্দরী এক কিশোরীতে। ওর সঙ্গে বর কনে খেলতে এখনো তার ইচ্ছে করে না এমন নয়। কিন্তু সে যা লাজুক; যা মুখচোরা। ওর দিকে একবার তাকাতে পর্যন্তও তার সাহস হয় না। তবু ওর কথা মনে পড়লে বুকখানা তার নেচে ওঠে আকুল হয়ে। অনুরণিত হতে থাকে যেন হৃদয়ের মীড়গুলি। চৌদ্দ বছরে এখন সে পড়েছে। একত্রিশ নম্বর পাঞ্জাবী পল্টনের এক ধুপি ছোকরার সঙ্গে আজ তার সাদি হয়ে যা'চ্ছে। গত এক বছর ধরে এই খবরটা রোজই সে শুনে আসছে। তাদের ভাঙ্গি পাড়ায় এটাও রটে গেছে যে গুলার মেয়ের বিয়ে উপলক্ষে শ'দুই টাকা আদায় ক'রে নিয়েছে বরপক্ষ থেকে। ছোটা এসে কানে কানে তাকে খবরটা দিয়ে গিয়েছিল। সেদিন সন্ধ্যে'বেলা খবরটা প্রথম শুনে সে কিন্তু দমে গিয়েছিল ভয়ানক। বুকভেঙে তার বুঝি কান্না এসেছিল হু হু ক'রে। অনেক সময় কাজ করতে করতে দুর্বল মুহূর্তে চোখের উপর তার ভেসে উঠত ওর মুখখানি। সর্বাঙ্গ তার যেন পুলকিত রোমাঞ্চিত হয়ে উঠত। ঘুমের ঘোরেও অনেক সময় রথা রামচরণের বোনের নাম ধরে চীৎকার ক'রে উঠত। স্বপ্ন দেখত, সে যেন ওর তন্বী দেহলতাকে আপনার বলিষ্ঠ দুই বাহু পাশে আবদ্ধ করে রেখেছে। তন্দ্রার ঘোর কেটে যেতেই ধড়্‌ফড়্‌ ক'রে সে উঠে বসত। ঘামে তার সর্বাঙ্গ যেত ভিজে।

রথা রামচরণদের বাড়ীর দিকে এগিয়ে যায় মন্থর পদে। স্মৃতির ভাণ্ডার উপুড় ক'রে ফেলে-আসা কত কথা আজ তার মনে পড়ে।

মনে পড়ে: কেরোসিন তেলের একটা পুরানো বোতল নিয়ে সেদিনও বুঝি ও দোকানে যাচ্ছি তেল আনতে। পথে দেখা হয়ে গেল রথার সঙ্গে। তাকে দেখেই প্রীতিমুগ্ধ চোখ দুটি ওর নেচে উঠেছিল আনন্দে। একটু চটুল হেসে পাশ কেটে চলে গিয়েছিল মেয়েটি। আরও একদিনের কথা তার মনে পড়ে। ভোরের আবছা তরল অন্ধকারে অচ্ছুত পল্লীর গুটিকয়েক তরুণীর সঙ্গে রামচরণের বোনও নদী থেকে গা ধুয়ে ঘরে ফিরছিল। সিক্ত বসনখানা সর্বাঙ্গে তার লেপ্টে গেছে। রথা তখন ঘাড় গুঁজে টাটি সাফা ক'রে চলেছিল। ওকে দেখে বুকের মধ্যে তার আনন্দের শিহরণ খেলে গেল। ওর বিবসনা নগ্ন মূর্তিটি যেন চোখের উপর ভেসে ওঠে। ভয়ানক তার ইচ্ছে হয়· ওর উলঙ্গ তন্বী দেহ-খানাকে আপনার বলিষ্ঠ সুবিশাল দুটি বাহু আর হাঁটুর কীলকের মধ্যে আবদ্ধ ক'রে দলিত মথিত নিষ্পেষিত ক'রে ফেলতে। জোর ক'রে মিটিয়ে নিতে চায় যেন আপনার লালসার আশ।··আঁৎকে উঠে সে সহসা দুহাতের মধ্যে আপনার মুখ ঢাকে। ছিঃ, নোংরা এসব সে ভাবছে কি? সৎ, সাচ্চা ছোকরা বলেই তাকে সবাই জানে। অচ্ছুত পল্লীতে তার সে সুনাম আজ বুঝি জাহান্নামে যেতে বসেছে। মন থেকে সে অসুস্থ চিন্তাগুলো উপড়ে ফেলতে চেষ্টা করল।···

শি-ও শি-ও—শি-!

রথা ধুপী পল্লীতে এসে পড়ল এক সময়। জন কয়েক ধোপা নদীর এক হাঁটু জলে নেমে এক খণ্ড পাথরের উপর ঝুঁকে পড়ে কোমড় বেঁকিয়ে সশব্দে কাপড় কাঁচছে আর বুঝি কাপড় জমাগুলোর দফা রফা শেষ করছে। রথা থমকে দাঁড়াল। তালে তালে কাপড় কাঁচার পাট দেখতে তার ভাল লাগে। ছোট বেলায় তার একবার ধুপী হবার বাসনাও গিয়েছিল। কিন্তু গুলাবের জারজ বেটা রামচরণই তার সে বাসনার মূলে কুঠার হেনে শুনিয়ে দিয়েছিল: স্থাথ্ রথা, তোর সঙ্গে আমরা হেসে

খেলে বেড়াই বটে—খেলা-ধুলোও করি; কিন্তু জানিস, আমরা হলাম জাত-হিন্দু, আর তুই হলি ধাঙড়। তোর ছায়া পর্যন্ত আমাদের মাড়াতে নেই। কথা তখন নেহাৎ ছোটই ছিল। ধোপার ছেলের উদ্ধতপূর্ণ ইঙ্গিতের সম্যক তাৎপর্য তখনও বুঝে উঠতে পাবে নি। আজ হলে হয়তো ঠাস ক'রে মেরেই বসত। ছোট লোকদেব মধ্যেও যে অনেকগুলো ধাপ আছে, আব তাবা—ধাঙড়রা যে একেবারে নীচের তলাব লোক—এখন আব তার জানতে বাকি নেই।

ধোপাদেব ক'পড কাঁচার দিকে সে কিছুক্ষণ আপন মনে তাকিয়ে রইল। ওদের গাধাগুলো ছাড়া পেযে নদীর ধারে চড়ে বেড়াচ্ছিল। সে তাদের পিছু নিল। রামচরণকে হয়ত পাওযা যেতে পারে গাধা-গুলোর সঙ্গে। ধোপারা বিকেলের রোদে কাঁচা কাপড সব মেলে দিযেছিল শুকোতে। কথা গিযে সেখানেও খুঁজে দেখল বামচবণকে। কিন্তু কোথাও পেল না। পাবেই বা কি ক'রে? আজ না তাব বোনেব সাদি! এমন দিনে কি সে আব বেড়িযেছে কোথাও? বা বে, সেবাব তাব বাপ যখন মারা গেল, সে কি আব তাদের সঙ্গে ছিপ হাতে মাছ ধরতে যায নি? —কথা শুধায় নিজেকে—তা গিয়েছিল। তাকে তো আর তার বাপ জন্ম দেয় নি। কিন্তু এ আলাদা। আপন মায়ের পেটেরই বোন! তাব বিয়েতে বাড়ী না থেকে কি পারে? সে ববং ওদের বাড়ীই যাবে। সেই ভাল।

বামচবণের বাড়ীর দিকে সে পা বাড়াল। কিন্তু এবার তার লজ্জা করতে লাগল। হাজার হোক বিয়ে বাড়ী। এক গাদা লোক গিস্-গিস করছে ওখানে। রাজ্য শুদ্ধ সব ধোপারা নিশ্চয়ই সেজে গুঁজে এসে হাজির হয়েছে। গান করছে হয়ত নিজেদের দক্ষিণ-দেশী ভাষায়। গাযে পড়ে সে বিয়ে বাড়ীতে যায় কি ক'রে? সত্যি তার লজ্জা করতে লাগল। হাত পাগুলো যেন অসাড় হয়ে গেল। বিয়ে বাড়ীতে গিয়ে রামচবণকে সে ডাকবে কি ক'রে?

পরক্ষণেই বথা তার সর্ব দুর্বলতাকে গা থেকে ঝেড়ে মুছে ফেলল নিঃশেষে। অচ্ছুতদের বস্তীর একটা মোড ফিরতেই সে রামচরণদের বাড়ীর হাত বিশেক দূরে এসে পডল। সবিস্ময়ে দেখল কাঠের একটা খুঁটি ঠেস দিয়ে ছোটা কখন এসে রামচরণদের বাডীর দাওয়ার উপর উপবিষ্ট নানান বয়সের স্ত্রী-পুরুষের দিকে তাকিয়ে আছে।

বথা খুঁটিটার দিকে এগিযে গিয়ে দাঁড়াল ছোটার পাশে গিয়ে। ছোটা চমকে উঠে ফিরে দাঁডাল। বন্ধুর একখানা হাত সস্নেহে চেপে ধরলে। দুজনেই তখন বিয়ে বাডীর আনন্দ-মুখর সুবেশ অভ্যাগতদের দিকে তাকিয়ে রইল ফ্যাল-ফ্যাল ক'রে। রামচরণের বোনের কথা এক সময় মনে পড়তেই বুকটা বথার টিপ টিপ ক'রে উঠল। ঘেমে উঠল সে রীতিমত। ঠিক এসময় আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে ঢাকের কাঠি বেজে উঠল ড্যাক ড্যাডুম্‌ ক'রে। সানাই ধরল রা। কান দুটো ঝালাপালা হয়ে ওঠে। তালা লাগবার উপক্রম।

'দাঁড়া, রামচরণকে আমি ডাকছি।' ছোটা এক গাল হেসে বলে উঠল।

না সাহেবী, না দেশী বিচিত্র এক পোষাক পরে রামচরণ তখন বসে লাড্ডু খাচ্ছিল। ছোটা আর বথাকে দেখতে পেয়ে চোখ ঠেরে কাছে ছুটে এল।

'হ্যাঁ রে শালা, আমাদের গোটা কয়েক খেতে দে—।'

রামচরণ তার ইজেরের পকেট দুটো আর রুমালখানা লাড্ডু বোঝাই করতে ভোলে নি। গুলাব তখন নিমন্ত্রিত অভ্যাগতদের পঁচাই আর লাড্ড পরিবেশনে ব্যস্ত। রামচরণ মার দিকে আড চোখে একবার তাকাল। বলল :

'আরে চুপ কর শালা, মা দেখতে পাবে।'

গুলাবের শ্যেন দৃষ্টিকে কিন্তু এড়ান গেল না। বাজখাঁই গলায় সে চিৎকার ক'রে উঠল :

'বলি হতচ্ছাড়া বেজন্মা, আজ না তোর বোনের স্যাদি? আজকেও তুই নোংরা ধাঙড়দের আর মুচিদের ওই ছোঁড়াগুলোর সঙ্গে ঘুরে বেড়াবি টোঁ-টোঁ করে? লজ্জা করে না তোর?'

'বজ্জাত মাগী চুপ কর তুই।' রামচরণও সমান গলায় খেঁকিয়ে উঠল। তারপর অচ্ছুত বস্তীর উত্তর দিকের টিপিটার দিকে দৌড়ুতে লাগল। ছোটাও ছুটল রামচরণের পিছু পিছু। বখা অগত্যা তার ভারী দেহখানা নিয়ে চলল থপ্ থপ্ ক'রে।

'দে ভাই দে, গোটা কয়েক লাড্ডু দে। সেই কখন থেকে দাঁড়িয়ে আছে হাঁ ক'রে তোদের বাড়ীর সামনে।' ছুটতে ছুটতে ছোটা বলে চলল।

'পাহাড়ে পৌঁছেই দেবো রে দেবো। তোর আর বখার জন্যই তো এনেছি সব। এখন ছুটে আয় ভাই, নইলে মা এক্ষুনি এসে পড়বে।' রামচরণ আশ্বাস দিল ছোটাকে। তারপর বখার দিকে মুখ-ক'রে বলে উঠল: 'ওই হাতি, শুনছিস, লাড্ডু খাবি তো আয় না ছুটে।'

বখার ভবিষ্যৎখানা আজ বিশেষ ভাল ছিল না। রামচরণের স্থূল পরিহাসে হাড়ে হাড়ে সে চটে গেল। মুখে কিন্তু কিছু বলল না। নীরবে সঙ্গীদের অনুসরণ ক'রে চলল।

বুলাশা পাহাড়ের কোণ বেয়ে ঢালু যে পথটা নেমে এসেছে তা ধরে চলতে থাকে সে! দুপাশের ঘাসের লম্বা লম্বা ডালগুলো দুহাত বাড়িয়ে যেন পথ আগলে ধরে। ঝির ঝির ক'রে দমকা একটা ঠাণ্ডা হাওয়া বয়ে যেতে থাকে। বখার বুকখানা জুড়িয়ে যায়। অচ্ছুত পল্লীর নোংরা পরিবেশ আর মুখর কল-কোলাহল সব মুছে যায় তার মন থেকে। থমকে দাঁড়ায় সে পথের উপর। চোখ তুলে তাকায় সামনে। চারিদিকে থোকায় থোকায় শ্যামলশ্রীর অপূর্ব সমারোহ। বুলাশা পাহাড়ের সবুজ বনানী অফুরন্ত তার সৌন্দর্য ভাণ্ডার উন্মুক্ত ক'রে যেন আছে দাঁড়িয়ে। ধ্যান-মগ্ন বনস্পতিরা মৃদু-মন্দ হাওয়ায় আন্দোলিত হচ্ছে এদিক-

ওদিক। ঝল-মল করছে রোদে। বথা অবাক বনে যায়। হাবিয়ে ফেলে নিজেকে। আশ-পাশেব গাছ-পালাব ঝিব-ঝির খস-খস পত-পত শব্দ সে যেন শুনতে থাকে কান পেতে। হাত ছানি দিয়ে তাকে ডাকছে যেন বনস্পতিবা !…ভাগ্যিস বামচবণবা এগিয়ে গিয়েছিল অনেক দূব। নইলে বোধ হয় আশ-পাশেব এই শান্ত নিবিড় সমাহিত পবিবেশকে ভেঙে খান খান ক'বে দিত।…

ওখানটায় সে পাযচাবী কবতে লাগল। প্রকৃতিব সংগোপন মণি-কুটীরে পৌঁছে বন্ধু-বান্ধবদেব সঙ্গে মিলে মিশে আনন্দ সম্ভোগ কবতে তাব মন চাইল না। ছেলেবেলাকাব কথা তাব মনে পড়ে এখানে এলে। দল-বল নিয়ে ছেলে-বেলায় ওবা খেলতে আসত এই পাহাড়ে। ওখানকাব ওই টিপিটাব মাথায় একটা নিশান উড়িয়ে দিয়ে তাকে বানিয়ে তুলত নকল কেল্লা। তাবপব কেল্লাটা অধিকাব ক[illegible]বাব জন্য তখন কঞ্চিব তীব-ধনুক নিয়ে দুই পক্ষে তুমুল লড়াযে মেতে যেত। অনেকেব হাতে আবাব বীতিমত খেলনা পিস্তলও থাকত। তখনকাব কি মজাব দিনই না গেছে! সে ছিল সবাই-এব সর্দাব—'জান্‌বেল' (জেনাবেল—সেনাপতি)।…

আটাশ নম্বব শিখ পল্টনেব ছোঁড়াদেব সঙ্গে সেবাবকাব লড়াই-এর কথাটা মনে পড়লে আজও তাব সর্বাঙ্গ শিউড়ে ওঠে। মনটা ফেপে ওঠে গর্বে। বাপ্‌স্‌! বিক্ষিপ্ত, চটপট সে কি লড়াই। তবু শেষে ওবাই জিতে গিয়েছিল।…হায, সে সব দিন কি আব আছে? ছেলেবেলাকাব ফেলে-আসা দিনগুলোব কথা মনে পড়লেই বুকটা তাব হু হু ক'বে ওঠে। কেমন যেন তাব কান্না পায। আজকাল খেলাধুলা কববাব একটু সে ফুবসৎই পায না। হকি খেলতে একটু বেরুলেই বাপ অমনি ডাকা-ডাকি হাঁকা-হাঁকি শুরু ক'বে দেয।…সহসা বথা কেমন যেন মনমবা হযে ওঠে। কিন্তু পবক্ষণেই সে মন থেকে ওসব চিন্তা মুছে ফেলে নিশ্বেষে। তাকায় আশ-পাশেব পবিপূর্ণ বনশ্রীর দিকে। ঢালু পাহাড়েব গা বেয়ে সযত্নে কে যেন ঘন ঘাসের

একখানা গালিচা দিয়েছে বিছায়ে। নানান রঙ-বেরঙের ফুল এখানে-ওখানে ফুটে আছে থোকায় থোকায়। কোন্ ফুলটার কি নাম, অত শত জানে না সে। তার কাছে ফুল খালি ফুলই।...নীচে কিছু দূরে পাহাড়ী ঝরণার জল জমে জমে একটা ডোবার মত হয়েছে। চারিদিকে তার লম্বা-লম্বা ঘাস আর আগাছা গজিয়ে উঠেছে। দমকা হাওয়ায় তাড়া খেয়ে ওরা বারবার নুয়ে পড়ছে জলের উপর। মনে হয় যেন জল পান করছে ঝুঁকে পড়ে। তৃষ্ণাতুর পথচারীরা ওপাশ দিয়ে যাবার সময় ডোবাটা থেকে জল খেয়ে যায় সবাই।

প্রাণভরে সে দম নিল। এক ঝাঁক চড়ুই পাখী কিচিব-মিচির ক'রে বেড়াচ্ছে আশপাশে। বুকটা তার অনেকটা চড়ুই পাখী-গুলোর মত হালকা হয়ে গেল। নীচের ডোবাটার দিকে এগিয়ে চলল সে। পথের দুই পাশে কত ফুল ফুটে আছে। অমন সুন্দব দৃশ্যটি কিন্তু তার মনে একটুও বেখাপাত করল না। মূঢ় অবোধ শিশুব মত তার চোখ এড়িয়ে গেল। প্রতিদিনকার জীবনযাত্রার দুর্বাব ঘূর্ণিপাকেই বিব্রত বিপন্ন সে। মনোরম কোন প্রাকৃতিক দৃশ্য বা শোভা তার মনে ধাক্কা দিলেও তেমন ক'রে সাড়া দেয় না। দিতে পারেও না। যে সামাজিক পবিবেশ এবং দাসত্ব শৃঙ্খলের গণ্ডীর মধ্যে বংশানুক্রমিক ভাবে সে বড়ো হয়ে উঠেছে তাতে হাজার ইচ্ছা থাকলেও আর দশ জনের মত প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করবার মত অবকাশ তার কোথায়!...

নীচের পুষ্করিণীটির পারে নেমে এল সে। অসংখ্য গাছ-পালা বহু শাখা-পল্লব বিস্তার ক'রে পুষ্করিণীটিকে ছায়াশীতল ক'রে রেখেছে। পাতার ফাঁকে ফাঁকে সূর্যের আলো এসে ঠিকরে পড়েছে জলের উপর। দেখে মনে হয় বখার অশান্ত হৃদয়টার মত ছোট ছোট ঢেউগুলি রোদে নাচছে যেন চিক্‌চিক ক'রে। অফুরন্ত প্রাণ-বন্যায় চারিদিক উথলে উঠছে যেন থরে বিথরে। হাত পা ছড়িয়ে দিয়ে বখা সটান চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ল পুষ্করিণীর পারে।

একটু বুঝি তন্দ্রার মত এসেছিল। হঠাৎ ঘোর তার কেটে গেল। দেখলে ছোটা কখন এসে নাকে তার কুটো দিয়ে সুড়সুড়ি দিচ্ছে আর টেনে টেনে এক গাল হাসছে। বিকট শব্দে হেঁচে উঠল বখা। ধড়ফড় ক'রে উঠে বসল সে উপুড় হ'য়ে। বেরসিক সে নয়। বন্ধু-বান্ধবের একটু ঠাট্টা-ইয়ার্কিতে চটে উঠল না। কিন্তু সকালবেলাকার পর পর অতগুলো ঘটনার পর থেকে মনটা তার আজ তিতিয়ে উঠেছিল। বন্ধুর রহস্যটাকে তেমন ক'রে নিতে পারল না। তবু ফিকে হাসল একটু সে। ছোটার নজর তা এড়াল না। প্রশ্ন করল :

'কি রে শালা তোর হয়েছে কি ?'

'কিছু না।' বখা জবাব দিল নিস্পৃহ কণ্ঠে। '—তোরা দুজনে ছুটে এগিয়ে গেলি। আমি ধীরে ধীরে আসছিলুম রে।'

'তুই আমাদের খুঁজে দেখলি না কেনো ?'

'কাল রাত্রিতে ঘুমটা ভাল হয় নি ভাই, ভারী ঘুম পাচ্ছিল। বেজায় ক্লান্তিও লাগছিল।'

'ঘুম হবে কি ক'রে ? তুই ভদ্দর লোক হচ্ছিস কিনা, তাইতো লেপ গায়ে দিবি না। বাপের কথা শুনবি নে।' ছোটা টিপ্পনী কাটল। লেপ গায়ে দেওয়া নিয়ে বাপ বেটার কথা কাটাকাটির ইতিহাসটুকুন্ শুনে নিয়ে-ছিল সে বখার কাছ থেকে।

'থাম রে শালা।' বখাও বলে উঠল : '—তুইও কম যাস নাকি ? শালা সাহেব হয়েছে কিনা, টুপি আর ইজেরটি ঠিক চাই।'

সাহেব-সুবোদের বেশ-ভূষা আচার-ব্যবহার অনুকরণ করার প্রাণান্তকর চেষ্টা করলেও নিজেদের এই দুর্বলতা সম্পর্কে ওরা সবদা সচেতন হয়ে থাকত। ভদ্দর লোক বনে যাওয়া নিয়ে গুরুজনদের এই পরিহাসটা নিজেদের মধ্যে বলা-বলি ক'রে বেড়াত হামেশা।

প্রসঙ্গটাকে চাপা দেবার জন্য বখা এক সময় বলে উঠল :

'হ্যাঁ রে, সেই লাড্ডুগুলো গেল কোথায় শুনি?'

'এই যে তোর ভাগ।' ভাঙা-চোরা গোটা তিনেক লাড্ডু একখানা রুমালে ক'রে রামচরণ নিয়ে এসেছিল। লাড্ডুগুলো এগিয়ে দিল বথার দিকে।

'এদিকে একটা ছুঁড়ে দে,' বথা বলল।

'তুই নে না।' রামচরণ জবাব দিল।

বথা তবু ইতস্তত করতে লাগলো। হাত গুটিয়ে বসে রইল। রামচরণ বক্‌বক্ ক'রে বলে উঠল:

'কি রে, তুই নিজে নিতে পারছিস্ নে?'

'না ভাই, তুই বরং আলগা ছুঁড়ে দে।' বথা বলল বিনীত কণ্ঠে।

রামচরণ আর ছোটা দু'জনাই রীতিমত তাজ্জব বনে গেল। বথাকে এভাবে কথা বলতে ইতিপূর্বে তারা কোন দিন দেখে নি। রামচরণরা ধোপা। ছোটলোক অচ্ছুত্‌দের মধ্যে ওরাই জাতে বড। তারপর মুচির ছেলে ছোটারা। আর বথারা হোল সকলের নীচের ধাপের—একেবারে শেষ পোংক্তির। কিন্তু ওরা তিনজন ওসব জাত-বিচার মানত না। হিন্দুদের ওসব ছোঁয়া-ছুঁয়ি ভেদা-ভেদি আর জল চলাচলের নিয়ম-কানুন নিয়ে নিজেদের মধ্যে কত ঠাট্টা-তামাসা ক'রে বেড়িয়েছে। তিনজনে মিলেমিশে কত মিঠাই-মণ্ডা খেয়েছে। বুলাশা ব্রিগেডের বিভিন্ন সৈন্যদলের ছেলে-পিলেদের টীমগুলোর সঙ্গে হকি ম্যাচ খেলতে গিয়ে বৎসরান্তে একবার ক'রে অন্তত কত সোডা ওয়াটার না খেয়েছে ওরা কাড়াকাড়ি ক'রে।

'হ্যাঁ রে, হয়েছে কি তোর?' ছোটার কণ্ঠে গভীর উৎকণ্ঠা ফুটে উঠল। সস্নেহে আবার প্রশ্ন করল:

'বল না ভাই, হয়েছে কি?

'না রে ভাই, কিছু না।'

'হ্যাঁ-হ্যাঁ, বল; বন্ধু-ইয়ারদের কাছে বলবি নে তো বলবি কার কাছে?' ছোটা পীড়াপীড়ি করতে থাকে।

বথা তখন সকাল বেলাকাব ঘটনাটি বলে গেল।

'শহবের রাস্তা ধবে যাচ্ছিলুম ভাই, একটা লোকেব গাযে একটু ছোঁয়া লাগতেই লোকটা কি ভাবেই না গালাগালি কবল। বাজ্যশুদ্ধু অতগুলো লোকেব সামনে ধাঁই ক'বে মেবে বসল পর্যন্ত।'

'তুইও কযেক ঘা বসিযে দিলি না কেনো?' ছোটা রীতিমত বেগে উঠল।

'শোন্ না আবও বলছি।' বথা তখন নাট-মন্দিবে পুরুৎঠাকুবেব কীর্তি-খানা বলে গেল। 'জানিস্, পুরুৎঠাকুবটা মোহিনীব উপব বলাৎকাব কবতে গিযে অবশেষে 'ছুঁযে দিলে—ছুঁযে দিলে' বলে চীৎকাব ক'বে উঠল।'

'আচ্ছা তুই দাঁড়া, ও শালা বেজন্মা কোনদিন আসুক না আমাদেব পাড়ায়। শালাকে ঠিক দেখে নেবো।' ছোটা এবাব ফেটে পড়ল বাগে অপমানে।

'আবও শোন্ ভাই, আবও শোন।' এই বলে বথা তখন স্যাকবা পাড়ার সেই গিন্নীব কথাটা বলে গেল বাড়ীব উপব-তলা থেকে যে রুটি ছুঁড়ে দিয়েছিল তাব উদ্দেশে।

'তাই নাকি,' ছোটাব মনটা সহানুভূতিতে গলে গেল। বথাব পিঠে একবাব হাত বুলিযে দিযে সান্ত্বনাব সুবে বলল: 'যাকগে ভাই, তুই কিছু মনে কবিস নে! আমবা সব ছোটলোক—অচ্ছুত, কীই বা কবতে পাবি বল?'

প্রসঙ্গটাকে চাপা দেবাব জন্য তাবপব বলল:

'চল, হকি খেলিগে। ও শালা একবাব আমাদেব পাড়ায এলে হয়। তখন এমন সাজা দেব, জীবনে আব কখনও ভুলবে না।'

'হ্যাঁ রে চল, এবাব খেলতে যাই।' বামচবণও সায দেয়।

হকির প্রসঙ্গ উঠতেই হাবিলদাব চাবৎ সিংএব কথা মনে পড়ে যায় বথাব। চারৎ সিং তাকে নতুন একখানা ষ্টিক দেবে প্রতিশ্রুতি দিযেছিল।

বলেছিল ব্যারাক থেকে গিয়ে নিয়ে আসতে এক সময়। বথা আটত্রিশ নম্বর ডোগরা পল্টনের ব্যারাকের দিকে পা বাড়ায়।

কারও কোন পাত্তা নেই; ফাঁকা খাঁ-খাঁ করছে ব্যারাকেব প্রকাণ্ড প্রাঙ্গনটা। কোয়াটাব গার্ডটাও নেই; কে-জানে কোথায় গেছে। রুদ্ধ অস্ত্রাগারেব সামনে থালি দু'জন নিবাক শান্ত্রী বাবান্দাব এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে টহল দিযে বেড়াচ্ছে। পাচিলের গায়ে এক জায়গায় ঝোলান আছে সোলাব একটা টুপি। একমাত্র টুপিটা ছাডা সব কিছুই নির্জীব, ম্রিয়মান বলে মনে হয় বথাব। ওই টুপিটাকে ঘিবে কত কাহিনীই না ছড়িয়ে আছে। কেউ কেউ বলে পল্টনে সাহেব লোকদেব কর্তৃত্বেব মূর্তিমযী প্রতীক হোল ওই টুপিটা। কেউ বা বলে: পল্টনের কোন উচ্চপদস্থ কর্মচারী টুপিটা ভুলে ফেলে গেছে। সাহেব আদমি; সামান্য একটা টুপি হাবিয়ে গেলে কতটুকুই বা যায আসে ওদের? টুপিটা আর ফিবে নিতে আসে নি। চুপিসারে অনেকে বলে বেডায, আসলে ওই টুপিটা হোল এখানকাব কোন উপরি-ওযালা সাহেব কমচাবীব। একবাব এক সিপাইকে খামাকা গুলী ক'বে বসেছিলেন বলে সামবিক আদালতে ওঁব বিচার হয। কিন্তু সাহেব লোককে তো আব সাধাবণ সিপাই শান্ত্রীদেব মত গাবদে পাঠান চলে না। তাই তাঁর পরিবর্তে তাঁব টুপি আর তববাবিখানাকেই গাবদ কবা হয়েছিল। সেই রাত্রিতেই কিন্তু সাহেবটি হঠাৎ উধাও হয়ে যান। কেউ কেউ কানাঘুষা ক'রে থাকে, পল্টনের বড় সাহেবেব নাকি হাত ছিল এই ব্যাপারে। তিনিই নাকি ওঁকে পালিযে যাবাব সুযোগ ক'বে দিয়ে বেহাই দিয়েছিলেন সাজাব হাত থেকে। কিন্তু কোন শান্ত্রীকে তুমি যদি জিজ্ঞেস কব, শুনতে পাবে: টুপিটা পল্টনেব এক সাহেবের। সাহেব কুচকাওযাজ করতে মাঠে গেছে। এক্ষুনি ফিরে এসে টুপিটা নিয়ে যাবে। ৩৮ নম্বর ডোগরা পল্টনের ছেলেছোকবাগুলো ছাড়া সাহেবেব ঐ টুপিটা নিয়ে আব কাবো কোন কৌতূহল ছিল না। ওদের মধ্যে একেবারে যাবা

ছোট ছিল, তারাই খালি শাস্ত্রীর কথা বিশ্বাস ক'রে ভয়ে পালিয়ে যেতো। সাহেব দেখলে ওরা ভূত দেখার মতো ভয়ে কেঁপে উঠতো। কি জানি কখন হাতের ছড়ি দিয়ে সপাৎ ক'রে মেরে বসে? ওদের মধ্যে আবার যারা একটু বয়সে বড় তারা সান্ত্রীদের কথাগুলোকে মিথ্যা বলে উড়িয়ে দিতো। ভাবত, ছোট ছোট ছেলেপিলেদের হটিয়ে দেওয়ার জন্য এটা একটা ভাঁওতা মাত্র। কিন্তু শাস্ত্রীরাই বা কেন তাদের কাছে অমন মিথ্যে ভাঁওতা দিতো, কিছুতেই বুঝে উঠতে পারতো না। দেয়ালের গা থেকে টুপিটা পেড়ে নিয়ে নিজে কেন মাথায় দেয় না।...

দেয়ালের গায়ে ঝুলানো শোলার ঐ টুপিটাকে কেন্দ্র ক'রে অতো খোস-গল্পের প্রধান কারণ হোল ৩৮ নম্বর ডোগরা পল্টনের প্রত্যেকটি ছেলে ঐ টুপিটার জন্য পাগল হয়ে উঠেছিল বলে। সবাই চায় কোট-পেণ্টালুন পরে মাথায় শোলার টুপি চড়িয়ে খাস বিলিতি সাহেব বনে যেতে। ওই টুপিটার প্রতি তাই ছিল ওদের বেজায় লোভ...বখারও অনেকদিন থেকে টুপিটা হাত করবার একান্ত ইচ্ছা ছিল। একটু বড় হয়ে সে যখন ব্যারাক ঘর ঝাড়ু দিতে এল, ঝাঁট্ দেবার জন্য সে ওপাশটাই প্রথম বেছে নেয়। নানান ফন্দি আঁটত দেয়ালের গায়ে পেরেক থেকে কি ক'রে সে টুপিটা মেরে দেবে।

ওখানকার নন্-কমিশনড্ বাবুদের কিংবা সিপাই শাস্ত্রীদের সঙ্গে ভাব ক'রে টুপিটা সে হাত করতে চেষ্টা করেছিল। হাবিলদারটি তার বাপ লখা জমাদারকে নিশ্চয়ই চিনে থাকবে। ওকে বোলে একবার দেখলে হয় না? যাগ-গে, টমিদের পুরানো পোষাক-পরিচ্ছদের দোকান থেকে অমন একটা টুপি কিনে নেয়া যাবে অখন। বখা নিজের মনকে নিজে চোখ ঠারে। হ্যাঁ, ওখান থেকে কিনে নিলেই হবে। ভারি তো সামান্য একটা টুপি, কতদিন থেকে পড়ে আছে ওখানটায় কে জানে। একগাদা ধুলো আর ময়লা জমে কেমন রঙ্-চটা বিশ্রী হয়ে গেছে।

তা ছাড়া, শোলার টুপি পরে কেউ আবার হকি খেলতে যায় নাকি? আর যাই হোক, রামচরণের মত সে বোনের বিয়েতে ইজের আর টুপি পরে সং সাজতে পারবে না। সাহেবদের বেশভূষার প্রতি নিজের অতখানি অনুরাগের জন্য তার কেমন লজ্জা হয়।

হাবিলদার চারৎ সিং-এর কোয়ার্টারের দিকে বথা পা বাড়াল। সামনেই একটা নালা। তার ওপাশে লম্বা সারি-সারি ব্যারাক। লম্বা বারান্দাটায় কেউ নেই। মাত্র হাত বিশেক দূরে চারৎ সিংএর ঘর। দরজাটা ভিতর থেকে ভেজানো। হাবিলদারজী হয়ত এখন বিশ্রাম করছেন। সিপাইরাও বোধ হয় ঘুমুচ্ছে। ওদের বিরক্ত করতে তার ইচ্ছা হোল না।

বারান্দায় সে পায়চারি করতে লাগলো। তারপর এক গাছতলায় গিয়ে বসলো। একটু পরেই পিতলের একটা লোটা হাতে ক'রে চারৎ সিং ঘর থেকে বেরিয়ে এলো। বারান্দার এক পাশে বসে প্রচুর জল ছিটিযে চোখ মুখ ধুতে লাগলো। নিজেব প্রক্ষালন ও প্রসাধন কার্যে চারৎ সিং এত ব্যস্ত ছিল যে কিকির গাছতলায় বথাকে একবার দেখতেও পেলো না। বথা উঠে এসে সেলাম ঠুকে বললে:

'সেলাম হাবিলদারজি!'

'আরে বথিয়া যে, আছিস্ কেমন?' চারৎ সিং সবিস্ময়ে বলে উঠ্‌ল। 'পল্টনের গেল হকি ম্যাচে তোকে খেলতে দেখিনি যে? ডুব মেরে ছিলি কোথায় এতদিন?'

'আমায় এখন কাজ-কম্ম কোরতে হয় হাবিলদারজী।' বথা জবাব দিল।

'তোদের খালি কাজ—কাজ—কাজ! রেখে দে অত সব কাজ কম্ম।' চারৎ সিং সটান উঠে দাঁড়াল। গামছাটায় মুখখানা একবার মুছে নিয়ে বারান্দার এক কোণ থেকে নিজের ছোট হুঁকোটা তুলে নিয়ে এক ছিলিম তামাক সেজে কলকেটা বথার দিকে এগিযে দিয়ে বলল:

'যা তো বেটা, রান্না ঘর থেকে একটু আগুন নিয়ে আয় তো।'

বধা থ' বনে গেল। চাবৎ সিং বলছেন কি! চাবৎ সিং জাত-হিন্দু হযে তাকে বোলছেন কলকেব আগুন নিযে আসতে বান্না ঘর থেকে ?

সে যে অচ্ছুত্‌—জাতে ধাঙড, সে কথা হাবিলদাবজী ভুলে গেছেন নাকি? ভুলবেনই বা কি ক'বে? আজ সকালে তো তিনিই তাকে টাট্টি সাফ করতে দেখেছেন। হ্যাঁ, সব জেনে শুনেই তাকে কলকেব আগুন আনতে বলছেন। হুঁকোটা কি জল-ভর্তি আছে, না খালি শুকনো ?

কিছুক্ষণ ফ্যাল্ ফ্যাল ক'বে হাবিলদাবজীব দিকে তাকিযে থাকে বধা। অপূর্ব এক পুলক সর্বাঙ্গে তাব খেলে যায। কলকেটা চাবৎ সিং-এব হাত থেকে সাদবে নিযে পা বাডায় সে রান্না ঘবেব দিকে।

'ঠাকুবটাকেও একবাব ডেকে দিস্ বধা।' চাবৎ সিং-এব গলা সে শুন্‌তে পেলো পেছন থেকে। 'আমাব চা-টা ওকে নিযে আস্‌তে বলিস্।'

'আচ্ছা, হাবিলদাবজী।' ছুটে যেতে যেতে বধা জবাব দিল।

বান্নাঘবে কাঁচা উনুনটিব সামনে বসে ঠাকুবমশাই তখন আলুব খোসা ছাডাচ্ছিল। উনানটাব উপব পিতলেব একটা প্রকাণ্ড ডেক্‌চি চাপানো বযেছে। কুণ্ডলী পাকিযে পাকিযে একবাশ ধোঁযা উঠছে সচ্‌প্যানটার মুখ থেকে।

'হাবিলদাবজীব কলকেব জন্য একটু আগুন দিন তো ঠাকুব মশাই?' বধা বান্নাঘবেব দোব গোডায এসে আগুন চাইল ঠাকুবেব কাছে।

ঠাকুব বধাব দিকে কটমট্ ক'বে তাকাল। মনে মনে বুঝি বলল: 'তুই আবাব এলি কেন?' কিন্তু বধাব হাতে হাবিলদাব চাবৎ সিং-এর কলকেটা দেখে ঠাকুব মুখে কিছু বলল না। এব কারণও আছে। হাবিল-দারজীব প্রতি ঠাকুব মশাযেব মনটা তুষ্ট ছিল। ওবাব ছুটিতে বাড়ী যাবার আগে নতুন একটা কাচা সার্ট আর ধব্‌ধবে একটা পাগডী চাবৎ সিং বকশিস দিযে গিযেছিল ঠাকুব মশায়কে। ঠাকুর তাই দুটো জলন্ত কাঠ কয়লা বধার দিকে এগিযে দিল। কয়লা দুটি কলকেতে তুলতে তুলতে বধার আজ

সকাল বেলাকার স্বপ্নে-দেখা সেই দৃশ্যটির কথা মনে পড়ে যায়, কাণাগলিটার ক্রন্দনরত সেই মেয়েটার কথা—যার দিকে সেক্‌রাটী একটা জ্বলন্ত কয়লা এগিয়ে দিয়েছিল।

'বহুৎ মেহেরবাণী' বথা কৃতজ্ঞতায় গলে পড়ে· 'হাবিলদারজী আপনাকে তাঁর চা-টা নিয়ে যেতে বলেছেন।'

চারৎ সিং তখন আরাম কেদারায় আরাম ক'রে বসেছিল। বথা এসে কল্‌কেটা তার হাতে তুলে দিল। কলকেটা হুঁকোর মাথায় বসিয়ে আপন মনে তামাক টানতে লাগলো।

বথা এখন করে কি? বারান্দার এক পাশে একখানা ইঁটের উপর গিয়ে বসল সে। হুঁকো দেখলেই মনটা তার কেমন চুল-বুল ক'রে ওঠে। ইচ্ছে হয় একটান্ টেনে নেয়। আচ্ছা, হকি ষ্টিকখানার কথা কি হাবিলদারজী ভুলে গেছেন? কই, দেবার একবার নামওতো কোরছেন না। বথা রীতিমত অধৈর্য হয়ে ওঠে। ঠিক এমন সময় ঠাকুর মশাই একটা মগ আর এক গামলা চা নিয়ে হাজির হোল।

বারান্দার একপাশে চড়ুই পাখীদের একটা জল-পাত্র পড়ে ছিল। চারৎ সিং বথাকে সেটা দেখিয়ে বল্‌ল:

'ও বথা, ওটা নিয়ে এদিকে আয় তো।'

বথা পাত্রটা নিয়ে এগিয়ে যেতেই চারৎ সিং নিজের গ্লাস থেকে খানিকটা চা বথার হাতের পাত্রটায় ঢেলে দিল।

'না-না-জী, একি করছেন?' বথা মৃদু প্রতিবাদ ক'রে উঠল।

চারৎ সিং ওর পাত্রে আরও খানিকটা চা ঢেলে দিয়ে বল্‌ল:

'নে-নে, খেয়ে নে বেটা,—'

'বহুৎ মেহেরবাণী হাবিলদারজী আমার প্রতি আপনার বহুৎ দয়া।'

'খেয়ে নে চা-টা, সারা দিন কাজ-কর্ম করিস্, চা-টা খেলে পর দেখবি বেশ ভালোই লাগবে।'

বথা সবটা চা ঢক-ঢক ক'রে গিলে নিয়ে পাত্রটা যথাস্থানে রেখে এলো। চারৎ সিং এদিকে বার বার একটু একটু ক'রে চায়ে চুমুক বসাতে লাগল আর নিজের ভিজে সরু গোঁফ জোড়া ঠোঁট আর জিভ দিয়ে চেটে নিয়ে বলল :

'এবার একখানা হকি ষ্টিক চাই কেমন ?'

চারৎ সিং উঠে নিজের পাশের ঘরের গিয়ে ঢুকল এবং একটু পরেই নতুন একখানা ষ্টিক হাতে ক'রে বেরিয়ে এলো।

'এ যে একেবারে' আনকোরা দেখছি, হাবিলদারজী।' বথা ষ্টিকখানা হাত বাড়িয়ে নিয়ে বলল।

'আনকোরা হোক আর যাই হোক তোর তাতে কি ? কোটের মধ্যে ক'রে নিয়ে যা—পালা। কাউকে বলিস্ না যেন।'

হাবিলদারজী বুঝি চেয়ে আছেন। বথা চোখ খুলে একবারও তাকাতে পারল না। মাথাটি তার ঝুলে পড়ে বুকের ওপর। সদাশয় মহৎ ব্যক্তিটির দিকে মুখ তুলে সে তাকায় কি ক'রে ? কি দয়া! আশ্চর্য, কি অসীম দয়া মানুষটার! রীতিমত সে অবাক্ হয়ে যায়। অমন ভাল মানুষটার সম্পর্কে একটু আগে সে কি ধারণাটাই না করেছিল। সত্যি কি দয়া! নতুন আনকোরা একখানা ষ্টিকই কিনা দিয়ে দিল তাকে। ওভার-কোটের নীচে লুকিয়ে রাখা ষ্টিকখানা সে সহসা বার ক'রে দেখে। ষ্টিকখানা কি সুন্দর চক্‌চকে ; গায়ে 'অঙ্গরেজী' মার্কা। গোটা দুনিয়ায় অমন আর একটা ষ্টিক আছে কিনা সন্দেহ। 'সত্যি, ভারী সুন্দর!' বথা সহসা বিড় বিড় ক'রে ওঠে! বুকটা তার ঢিপ্-ঢিপ্ করতে থাকে। বাঁক ফিরে সে নালার দিকে পা বাড়ায়। বলে আঘাত করার ভঙ্গিতে ষ্টিকখানা একবার মাটি ছুঁইয়ে নেয়। খুবই ভাল ষ্টিকখানা, বল মারবার সময় কেমন দুমড়ে গেল! ভাল ষ্টিকের লক্ষণই ওই।

পরক্ষণেই সে ষ্টিকখানা মাটি থেকে তুলে নেয়। ধুলোটা মুছে নেয় পরম

যত্নে। চামড়া মোড়া হাতলটা সহসা আকড়ে ধরল সে দু-হাতে। কেমন যেন তার ভয় হয়। কেউ এসে যদি ষ্টিকখানা কেড়ে নেয় তার হাত থেকে। চলতে চলতে রথা চারৎ সিং-এর কথা ভাবতে থাকে। সত্যি মানুষটা কি দয়ালু। মাথা তার খারাপ কিনা, তাই সে ভাবতে গিয়েছিল, হাবিলদারজী ভুলে গেছেন তাঁর কথা।

আচ্ছা কি সুন্দর শরৎকালের বিকেলটা। মেঘমুক্ত নির্মল আকাশ। চারিদিক ঝল্‌মল্‌ করছে রৌদ্রে। রথার বুকটা নেচে ওঠে আনন্দে। পথে কেউ নেই। একটা সিপাই পর্যন্ত গেল না পাশ দিয়ে। ছোটা কি রাম-চরণ কিংবা তাদের দলের আর কারো দেখা পেলে সে ষ্টিকখানা দেখাতো। না-না, রামচরণকে কিছুতেই দেখাবে না সে। দেখালে পর অমন আর একখানা ষ্টিক-এর জন্য হাবিলদারজীর কাছে ধর্না দেবে নিশ্চয়। উদ্ব্যস্ত ক'রে তুলবে তাঁকে। হাবিলদারজী তাহলে রাগ কোরবেন। কাউকে এই কথা না বলতে তিনি বার বার সাবধান ক'রে দিয়েছিলেন।...বাবুদের ছেলে দুটো এই সময় এলে বেশ হতো। বলটি যে আছে তাদের কাছে। আর বড় দাদাবাবু তো তাকে বিকেল থেকে অঙ্গরেজী পড়াবেন ব'লে বলেও ছিলেন।

সত্যি কেউ এলে হয় এখন। অন্যমনস্ক হয়ে রথা পায়চারি করতে লাগল।

কিছু দূরে বাবুদের ছোট ছেলেটিকে দেখা গেল বেরিয়ে আসতে ঘর থেকে। হাতে তার প্রকাণ্ড একখানা ষ্টিক। বাবুদের ছোট ছেলেটির খেলার বাতিকের কথা রথা ভুলে যায় নি এর মধ্যে। ওর দিকে সে এগিয়ে গেল। রথাকে দেখে বাবুদের ছোট ছেলেটি সোৎসাহে বলে উঠল :

'সেই সকালবেলা তোকে বল্‌লাম না, চারৎ সিং আমায় একখানা নতুন ষ্টিক দিয়েছে, এই দ্যাখ সেটা'।

'ওঃ, ভারি সুন্দর তো!' রথা বলে উঠলো : 'কিন্তু এই দেখুন আমারটা, আপনারটার চাইতেও সুন্দর।'

'কই দেখি?'

বথা ষ্টিকখানা বাবুদের ছোট ছেলেটিব হাতে দিল।

ছেলেটি সবিস্ময়ে বলে উঠল :

'আরে, এটা যে ঠিক আমাব মত!' বথাব বুক আনন্দে ভবে উঠলো। আব যাই হোক, ধাঙড বলে যে হাবিলদাবজী তাব প্রতি আলাদা কোন ব্যবহাব কবেননি। বাবুদেব ছেলেকে যা দিযেছেন তাকেও দিযেছেন তাই।

'ওই, বথে, আজ তুই খেলছিস তো?' বাবুদেব ছোট ছেলেটি পাকা খেলোযাড়েব মত প্রশ্ন কবল বথাকে।

'হ্যাঁ, খেলবো।' বথা হেসে জবাব দিল। প্রবল উৎসাহ আব উদ্দীপনায ভবপুব বাবুদেব এ ছেলেটাকে তাব সত্যি ভাল লাগে। শুধাল :

'বডদাদাবাবু কোথায গেলেন?'

'ও খাচ্ছে, এক্ষনি এসে পডবে। দাঁড়া, বল আব ষ্টিকগুলো আমি নিযে আসছি। ছেলেবা সব এসে পডবে এক্ষুনি।' লাফাতে লাফাতে সে ঢুকে পডলো বাডীব মধ্যে।

বথা তাকিযে থাকে ওব দিকে। তখনো এতো ছোট, বডদেব মত খেলবাব কি অসীম আগ্রহ। বড হযে নিশ্চয অসাধাবণ প্রতিভা-সম্পন্ন কেউ একজন হবেন। হযত হবেন কোন বড বাবু কিংবা কোন সাহেব। উজ্জ্বল চোখ দুটিও সাক্ষ্য দেবে তাব।

'ওই বথে!'

বথা বাধা পায, ছেদ পডে তাব চিন্তাব সূত্রেব। চমকে উঠে সে ফিবে তাকায। ছোটা আব বামচবণেব পিছু পিছু একদঙ্গল ছেলে—দর্জিদেব ইব্রাহিম, চাল তৈযেবীওযালাদেব ছেলে নাইমাৎ আব আশমাৎ, ব্যাণ্ড মাষ্টাবদেব ছেলে আলি, আবদুল্লা, হাসান আব হোসেন এবং তাদের পেছনে বুঝি ১৩ নম্বব পাঞ্জাব বেজিমেণ্টেব এক দল ছোকবা আসছে হৈ হল্লা ক'বে। বথা তাদেব দিকে এগিযে গেল। ছোটা ছুটে এসে কানে কানে ফিস্ ফিস ক'রে বলল :

'হ্যাঁরে, আমি ওদের বলে দিয়েছি তুই সাহেবের বেয়ারা। তুই যে জাতে ধাঙড় ওরা কেউ জানে না কিন্তু।'

বথা জানে পাঞ্জাবী ছোঁড়াদের টীমে গোঁড়া এমন হয়ত কেউ কেউ আছে যারা বথাব সঙ্গে খেলতে আপত্তি করবে। সে নীরবে সায় দেয়। তারপর বন্ধুকে নতুন ষ্টিকখানা দেখিয়ে বলে :

'চারৎ সিং দিয়েছেন রে, রামচরণকে কিন্তু বলিস না যেন। দেখিস আজ কয়টা গোল করি ওখানা দিয়ে।'

'আরে, ভারি সুন্দর ত! চমৎকাব ষ্টিকখানা বে!' ছোটা সবিস্ময়ে চিৎকাব ক'বে উঠলো। 'শালা তোর বরাত্‌টা ভালো!' ওভার কোটটা থেকে একবাস ধূলোর ঝড় তুলে বথাব পিঠটা সে চাপড়ে দেয। তারপর ফিরে দাঁড়িয়ে চিৎকার ক'রে ওঠে :

'এখন রেডি হয়ে নাও তোমবা সব।'

কে কে আজ খেলবে তাই নিয়ে যখন টীম বাছাই হচ্ছিল বাবুদেব ছোট ছেলেটি তখন একগাদা ষ্টিক এনে হাজির কবল ছোটাব সামনে। প্রতিদানে ছোটা কিন্তু তাকে একবার খেলতেও বলল না। সে তার দল আগেই বেছে নিযেছে।

'ছেলে মানুষ, ওকে শুদ্ধু নে রে।' বথা ওকালতি করল বাবুদেব ছোট ছেলেটির হয়ে।

'না। এ বড় ছেলেদেব ম্যাচ। কোথাও লেগে-টেগে বসলে ওকে নিয়ে ভারি বিপদ হবে তখন।'

বথা এ নিয়ে আর বিশেষ বাড়াবাড়ি করল না।

মাঠের এক পাশে ছাড়া-কাপড় চোপড়গুলো সব গাদা ক'রে বাখা হয়েছিল। বাবুদের ছোট ছেলেটা তার পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। খেলা সুরু হতেই বথা এক ফাঁকে ছুটে এসে নিজের ওভার-কোটটা তার পাযেব কাছে ছুঁড়ে দিয়ে বলল :

'ওটার উপর চোখ রাখবেন দাদাবাবু।'

পরক্ষণে সে তার জায়গায় ফিরে গেল।

বাবুদের ছোটছেলেটি সহসা দুহাত তুলে চিৎকাব ক'বে উঠলো পরম উল্লাসে। চিৎকাব ক'রে ওঠবারই কথা। সত্যি দেখবার মতই দৃশ্যটি! খেলার কোন সসম্বন্ধ শৃঙ্খলা ছিল না। যে যার খুশিমত মাঠেব একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে গাঙ্ ফড়িংএর মত লাফালাফি ছুটাছুটি ক'রে বেড়াচ্ছিল। তবু বথা বিপক্ষ দলের সবাইকে বেমালুম ফাঁকি দিয়ে বল নিয়ে হাজির হলো একত্রিশ নম্বর পাঞ্জাবী দলের গোলের সামনে। চারিদিক থেকে সবাই এসে ওকে ঘিরে ধবলো। বথা কিন্তু না ছেড়ে সবাইকে পাশ কাটিয়ে বলটাকে সে সটাং চালান ক'বে দিল বিপক্ষদলের গোলের মধ্যে। চারিদিকে হৈ হৈ পড়ে গেল। পাঞ্জাবী দলেব গোল রক্ষক তখন মবিয়া হয়ে বথার পাযে এক ঘা দিল বসিয়ে। তাই দেখে ছোটা, রামচরণ, আলি, আবদুল্লা দোগরা দলেব বাদবাকী সবাই ঝাঁপিয়ে পড়লো পাঞ্জাবী দলের গোল বক্ষকটির উপর।

দেখতে দেখতে দুই পক্ষে তুমুল মাবামারি সুরু হয়ে গেল। পাঞ্জাবী-টীমেব ক্যাপ্টেন 'ফাউল—ফাউল' বলে চিৎকার ক'রে উঠল।

ছোটাও সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার ক'রে উঠল 'ফাউল কোথায়!'

পাঞ্জাবী দলেব ক্যাপ্টেন রুখে এলো। দোগরা দলেব ছেলেদের ঠেলে দিল সরিয়ে। তাবপর বজ্র মুষ্টিতে ছোটার জামার কলারটা আঁকড়ে ধরল। ছোটাও ছাড়বার পাত্র নয়। সে তার প্রতিপক্ষের টুঁটিটা চেপে ধরল। তাবপর দুজনের মধ্যে ঘুষাঘুষি ধস্তা-ধস্তি রাম-বাবনের যুদ্ধ সুরু হয়ে গেল। বাকি সকলেও ষ্টিক নিয়ে নিজেদের মধ্যে মারামারি সুরু ক'রে দিল। গতিক মন্দ দেখে পাঞ্জাবী দলের ছোকরারা পিছু হটতে লাগল।

'ইঁটা চালা—' ছোটা তার সাঙ্গ-পাঙ্গদের নির্দেশ দিল এক সময়।

আকস্মিক মারা-মারি আর হট্টগোলের মধ্যে সবাই বাবুদের ছোট

ছেলেটির কথা ভুলে গিয়েছিল। কাপড়-চোপড়ের পাহাড়ের সামনে সে তখনও তার নিজ স্থানে দাঁড়িয়ে ঘটনাটা লক্ষ্য করছিল সবিস্ময়ে। ইষ্টক বর্ষণ এবার সুরু হতেই সব ধকলটা গিয়ে পড়ল তার উপর। প্রায় সব কটা মাথার উপর দিয়ে পার হয়ে গেলেও রামচরণের নিক্ষিপ্ত একখানা ইঁট তার মাথার পেছন দিক দিয়ে এসে লাগল স্বশব্দে। ছেলেটি একটা চিৎকার ক'রে সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে বেহুস হয়ে পড়ে গেল মাটিতে। মারামারি ফেলে সবাই ছুটে গেল তার দিকে। ছেলেটির মাথাটা কেটে গিয়ে ফিন্‌কি দিয়ে তখন রক্তের স্রোত বইতে সুরু করেছে। বথা সহসা ছুটে গিয়ে দুহাতে ওকে কোলে তুলে নিল। তারপর ওদের বাড়ীর দিকে পা বাড়াল। পথে দেখা ছেলেটির মায়ের সঙ্গে। বথাকে দেখেই ওর মা খেঁকিয়ে উঠল :

'তবে রে নচ্ছার বেটা ধাঙড় কোথাকার, কি করেছিস রে তুই আমার বাছার ?'

বথা কি যেন বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু ছেলেটার মাথা থেকে অবিশ্রান্ত রক্ত ঝরতে দেখে ওর মা বথাকে থামিয়ে দিল। বুক চাপড়ে চীৎকার ক'রে উঠল :

'তবে রে শতেক খেকো বেজন্মা, আমার বাচাকে খুন ক'রে এসেছে গো !' বথার দিকে ও হাত বাড়াল। 'দে, আমার বাছাকে আমার কোলে দে। ওকে খালি খুন ক'রে আনেনি, আমার বাড়ীটা শুদ্ধ ছুঁয়ে অপবিত্র ক'রে দিলে গো !'

'মা-মা, ওকি কথা বোলছ মা ?' বাবুদের বড় ছেলেটি সহসা এগিয়ে এসে বাধা দিল। বথা তো ওকে মারে নি মা। রামচরণ—সেই ধুপী-দের ছেলেই ওকে ইঁট মেরেছে।'

'যা-যা দূর হয়ে যা, তুই আমার কাছ থেকে। কোথায় ছিলি তুই শুনি ? ভাইকে একবার দেখতে পারলি নে ?'

কোল থেকে ওকে ধীরে ধীরে নামিয়ে দিয়ে বথা নিঃশব্দে বেরিয়ে এল।

ব্যথা ও বেদনায় মনটা তার কান্নায় কান্নায় পূর্ণ হয়ে উঠল। কি করেছে সে যার প্রতিদানে তাকে আজ এই বিরূপ ব্যবহারই পেতে হলো? বাবুদের ছোট ছেলেটিকে সে কি কম ভালবাসে? ছোটা তখন ওকে খেলায় নেয় নি বলে সেই মনে বেশী আঘাত পেয়েছিল। তবু তার প্রতি এই ব্যবহার কেন? কেনই বা তাকে মিছামিছি বকলেন উনি? হ্যাঁ, সে অবশ্য ওকে ছুঁয়েছে। কিন্তু ও যে জখম হয়ে পড়ল মাটিতে। না ছুঁয়ে ওকে মাঠ থেকে সে আনে কি ক'রে?...ঝগড়াটা না বাঁধলেই ভাল হতো।...ঐ ত আমার গোল-করা নিয়ে সব ঝগড়ার সূত্রপাত। নিজেকে সে ধিক্কার দিতে লাগল। আহা, ছেলেটী জবর চোট পেয়েছে। খুব সাংঘাতিক নয় ত?

সহসা সে সজাগ হয়ে ওঠে নিজ সম্পর্কে। তার আশেপাশে কেউ কোথাও নেই। ধাঙড়পল্লী। পোড়ো জমিটার উপরে একঝাঁক চড়ুই পাখী বিকেল বেলাকার পড়ন্ত রোদে কিচির মিচির ক'রে ঘুরে বেড়াচ্ছে। বধা সহসা চমকে উঠে বগলের নীচের তার ষ্টিকখানা আঁকড়ে ধরে। তারপর একটা গলি বেছে নিয়ে এক ফণিমনসার ঝোপের মধ্যে ষ্টিকখানা লুকিয়ে রাখতে ভোলে না। তক্ষুনি হয়ত বাড়ী গিয়ে টাটি সাফ করে নি বলে গাল খেতে হবে তাকে। বধা বাড়ী এসে দেখল তার বাপ একখানা চেয়ারের উপর বসে গুড় গুড় ক'রে হুঁকো টানছে। ছেলেকে দেখেই লখা তেড়ে মারতে গেল। হাত পা ছুঁড়ে চীৎকার ক'রে বলে উঠল:

'কুত্তিকা বাচ্ছা, শূয়োর কোথাকার! এখন ফেরা হোল বুঝি? সারা বিকেলভর ছিলি কোথা শুনি? একেবারে নবাব বনে গেছিস, না—? বলি, বেজন্মা, এখানকার কাজ-কর্ম সব করে কে? সেপাই লোক সব ডেকে ডেকে হয়রাণ হয়ে গেল।'

বাড়িতে পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অমন ধরনের বিরূপ অভ্যর্থনার জন্ম প্রস্তুত ছিল না বধা। তবু সে চুপ ক'রে রইল। মাথা পেতে নিল সব ভর্ৎসনা আর তিরস্কার। লখা তখনও সমানে বকে চলেছে:

'বেজন্মা, শূয়োরকা বাচ্ছা সেই কোন্ সকাল বেড়িয়েছিস আর এখন ভর-সন্ধ্যায় ফেরা হোল? এদিকে বুড়োবাপটা বাঁচলো কি মরল তার খেয়াল নেই? বলি ধাঙড়বেটাব আবার সাহেব হবার অত সখ কেন? টাট্টিগুলো ওখানকার সাফ করে কে, শূয়োর কোথাকার!'

বখা টাট্টি-সাফার ঝাড়ুখানা নিতে এগিয়ে গেল। দেখল রখা কখন এসে ঝাড়ুখানা হাতে তুলে নিয়েছে। দাদার দিকে আড়চোখে তাকিয়ে টিপ্পনি না কেটে সে ছাড়ল না:

'তা ফেরা হোল কখন সাহেবের?'

'সারাদিন খালি খেলা—খেলা—খেলা! বেজন্মা শূয়োর বাচ্চাটার একটু কি লজ্জা আছে?' লখা তখনও সমানে বকে চলেছে।

বখা আর সহ্য করতে না পেরে বাইরের দিকে পা বাড়াল। পেছন থেকে শুনতে পেল তার বাপ তখনও চিৎকার করছে:

'দূর হ—দূর হ আমার সামনে থেকে, বেজন্মা কোথাকার! ও ঝাড়ু আর কোনদিন ধরবি ত তোকে আমি খুন ক'রে ফেলবো। বেরিয়ে যা তুই আমার বাড়ী থেকে। এই মুখো আর আসবি ত মুস্কিল হবে।'

সবই নিয়তির বিধান বলে ইতিপূর্বে সে এর চাইতেও অনেক বেশী গাল মন্দ তিরস্কার, এমন কি মার পর্যন্ত সয়ে গেছে। হাসিমুখে সব নীরবে গড়িয়ে দিয়ে গেছে গায়ের উপর। টুঁ শব্দটি করেনি। হাত তুলে একবার আত্মরক্ষা পর্যন্ত করেনি। কিন্তু সেই সকাল থেকে একটার পর একটা এমন সব ঘটনা ঘটতে লাগল তাতে তার মনটা কানায় কানায় বিষিয়ে উঠল। সহ্যের মাত্রাটা ছাড়িয়ে গেল। অন্তরাত্মাটি তাব দপ্ ক'রে জ্বলে উঠল।

সামনেই মাঠ। মাঠের বুক চিরে হন্‌হন্ ক'রে সে এগিয়ে চলল। ডান হাতে পড়ে রইল তাদের অচ্ছুৎ পল্লীর সেই মজা নদীটি। তার মনের মত অশান্ত দমকা বাতাস ছোট ছোট ঢেউ তুলেছে নদীটার বুকে। অস্তগামী সূর্যের

স্তিমিত আলোয় চিক্‌চিক্‌ করছে ঢেউগুলি। চলতে চলতে রথা মাঠের মাঝ-খানে থমকে দাঁড়ায়। মনে পড়ে, সকালবেলা ওই মাঠের মাঝখানেই ছুটে এসে সে প্রভাত রবির নূতন রশ্মি দেখে গিয়েছিল প্রাণভরে।

জন-বিরল মাঠ। উত্তরে একরাশ জঞ্জাল,—অসংখ্য ভাঙ্গা চোরা শিশি-বোতল, পুরানো তুমড়ানো টিন, কুকুর-বিড়ালের বিকৃত শবের মধ্যে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত তাদের অচ্ছুৎ পল্লীর মাটির ঘরগুলো দেখা যায়। দুই একজন লোক বুঝি আনাগোনা করছে আশেপাশে। না, আজকে কার মুখ দেখে উঠেছিল সে কে জানে, গোটা দিনটাই তার মন্দে কাটল। এক পিপুল গাছের তলায় এসে পশ্চিমদিকে মুখ ক'রে রথা বসে পড়ল এক সময়।

'টুম উডাস্‌ আছে।' রথার কাঁধে একখানা হাত রেখে ভাঙ্গা হিন্দু-স্থানীতে কে যেন বলে উঠল সহসা। রথা চমকে উঠে ফিরে তাকাল। দেখল কর্ণেল হাচ্চিন্‌সন্‌ সাহেব কখন এসে দাঁড়িয়েছেন তার পেছনে। কর্ণেল হাচ্চিন্‌সন্‌ স্থানীয় 'স্যালভেশন্‌ আর্মীর' বড় পাদ্রী। অনুন্নত অচ্ছুৎ পল্লীর আশেপাশে তিনি হামেসা ঘোরাফেরা করেন। এক মাইল দূর থেকে দেখলেও তাঁকে ঠিক চেনা যায়। ভারতবর্ষে খৃষ্টান মিশনারীদের মধ্যে যারা মনে করতেন স্থানীয় লোকদের উদ্ধার ক'রে খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত করতে হলে পাদ্রীদের দেশী বেশ-ভূষা পরিধান একান্ত উচিত, তিনি হলেন সেই দলের। তিনি তাই সব সময় পরতেন শাদা একজোড়া প্যাণ্টলুন, গাঢ় নীল রঙের একটা জামা আর লাল ফিতাবাঁধা শাদা একটা টুপি। ইউজিন্‌ স্যানণ্ডোর কাছাকাছি না হলেও এককালে তাঁর গায়ে প্রচণ্ড শক্তি ছিল। মাথায় ছিল একরাশ ঘন চুল। এখন অবশ্য সে জায়গায় প্রকাণ্ড টাক পড়েছে। তাঁর স্ত্রীর ধারণা কিন্তু কর্ণেল সাহেবের মাথায় টাক পড়েছে এদেশী লোকদের মত ঐ বিজাতীয় টুপি পরার জন্য, এবং সব সময় তিনি পড়া-শুনা নিয়ে অমন ব্যস্ত থাকেন বলে। শুধু চুল নয় খোদ কর্ণেলদের মত এককালে তাঁর প্রকাণ্ড একজোড়া কালো গোঁফও ছিল। গোঁফের ঐ

বাহার দেখেই যৌবনে মিসেস্ হাচিন্‌সনের মন ভিজে গিয়েছিল তাঁর প্রতি। ক্যামব্রিজের এক মদের দোকানে তিনি আগে পরিচারিকার কাজ করতেন। মদ খেতে বসে কর্ণেল হাচিন্‌সনের গোঁপ জোড়াটির ডগা বেয়ে ফোঁটা ফোঁটা মদ চুইয়ে পড়তে দেখেই তিনি ওঁর প্রেমে ভিড়ে পড়েন। বিয়ে করেন ওঁকে। কিন্তু ঘর ছেড়ে বিদেশ-বিভুঁই ভারতবর্ষে আসাটা তিনি বরদাস্ত করতে পারেন নি। বাড়ীর দেশী-চাকর-বাকরগুলি দেখলে তাঁর চোখ টাটিয়ে উঠত। তা'ছাড়া তাসখেলা, একটুখানি খানাপিনা করা কিংবা তাঁর একটু ফুর্তি করার রুচিটা কর্ণেল সাহেব বুঝি বরদাস্ত করতেন না। স্বামী-স্ত্রী দুজনের মধ্যে এ নিয়ে একটু মনঃমালিন্যের বেশ বজায় থাকলেও কর্ণেল সাহেবের প্রতি মিসেস্ হাচিন্‌সনের প্রেমের একচুলও ফাটল ধরে নি। এখন অবশ্য কর্ণেল সাহেবের গোঁফের সেই বাহার নেই। বয়সও হোল পঁয়ষট্টি বছরের মত।

পুরো বিশ বছরে মাত্র পাঁচজন স্থানীয় লোকের 'আত্মউদ্ধার' কার্য সম্পন্ন করা ভিন্ন—তাও আবার অনুন্নত অচ্ছুৎ পল্লীর নেংরা বাসিন্দা—খৃষ্টান পাদ্রীদের কাজ বিশেষ এগোয় নি। তবুও পাদ্রী সাহেবের মহান আদর্শ নিষ্ঠা আর উৎসাহের কোথাও অভাব নেই। সব সময় তিনি এক গাদা হিন্দুস্থানী বাইবেলের তর্জমা কপি বগলদাবা ক'রে আর জামা ও ওভার-কোটের পকেট হুটোয় লুক লিখিত সুসমাচারে ভর্তি ক'রে বেরুতেন। পথে যাকে পেতেন তাকেই একরকম জোর ক'রে একখানা কেতাব গছিয়ে তবে ছাড়তেন।

'টুম উডাস আছে।' কর্ণেল সাহেব এগিয়ে এসে পিঠে হাত রাখলেন। সখা চমকে উঠে ভাবল ছোটা কিংবা রামচরণ এসেছে বুঝি তাকে সান্ত্বনা দিতে; অচ্ছুৎ পল্লীর আর কেউ বা এলো বুঝি। খাস সাহেবের মুখে হিন্দুস্থানী বাত্ ইতিপূর্বে সে শোনেনি কখনো। কর্ণেল সাহেবকে দেখেই সে চিনে ফেলল। সে যখন ছোট ছিল উনি প্রায়ই আসতেন তাদের বাড়ীতে।

পরম পিতা যীশু খ্রীষ্টের ধর্মে দীক্ষা নিতে বারবার পীড়াপীড়ি করতেন তার বাপকে। কিন্তু বুড়ো পাদ্রী সাহেবের কথায় তার বাপ রাজি হয়নি। বাপ ঠাকুর্দার ধর্মই তার পক্ষে ভাল বলে বিদায় ক'রে দিয়েছে সাহেবকে।

তাদের সঙ্গে তেমন ক'রে মাখামাখি করলে কি হবে, সাহেব সাহেবই। এখনও ট্রাউজার পরে, কমোডে পায়খানা করে।...

রথা দাঁড়িয়ে কপালে সেলাম ঠুকে বলে উঠল :

'সালাম সাহেব।'

'সালাম সালাম, ঠিক হ্যায়, ঠিক হ্যায়—টুম বৈঠ'। কর্ণেল সাহেব ফিরিঙ্গী গলায় ভাঙ্গা হিন্দুস্থানীতে বলে উঠলেন। ঝুঁকে পড়ে সস্নেহে শুধালেন : 'টুমি কি হয়েছে? অসুখ করেছে?'

সস্নেহ অমন কণ্ঠ—অযাচিত করুণা—রথা কেমন অভিভূত হয়ে যায়। মনে হয় সে যেন স্বপ্ন দেখছে। বিলাতী সাহেবদের মুখে সে অবশ্য 'আচ্ছা' 'যাও' 'জলদি করও,' 'শুয়োরকা বাচ্ছা' কিম্বা 'কুত্তিকা বাচ্ছা' প্রভৃতি নানান হিন্দী বাত শোনে নি অমন নয়, কিন্তু অমন বিশুদ্ধ দেশী ভাষা—অমন দরদী কথা...। মাথাটা তার লজ্জায় নুয়ে পড়ল। বলল :

'কিছু না সাহেব—কিছু হয় নি। একটু হাঁপিয়ে পড়েছিলাম কিনা তাই। আমি, সাহেব, এখানকার এক ঝাড়ুদার, লখা জমাদারের বেটা।

'হামি টা জানে। টোমার বাবা কেমন আছে?'

'ভাল হুজুর।'

'আচ্ছা, টোমার বাবা টোমাকে কি বলেছে হামি কে আছি?'

'হ্যাঁ হুজুর, আপনি তো সাহেব।'

'না-না, হামি সাহেব নেহি হ্যায়—সাহেব নেহি হ্যায়। টোমাদের মত একজন আড্‌মি আছি।' সাহেব কিছু জানে না এমন ভান ক'রে বলল : 'হামি স্যালভেশন্ আর্মীর পাদ্রী আছি।'

কর্ণেল সাহেবদের মত পাদ্রী সাহেবদের আর সাধারণ সাহেবদের মধ্যে

যে বড রকমের তফাৎ আছে বথা তা জানত না। তার কাছে সবাই সাহেব। সবাই ট্রাউজার পবে, মাথায টুপি দেয়, টুটা-ফুটা পোষাক পরিচ্ছদগুলি তাদেব মত চাকর-বাকরদের এস্তাব বিলিয়ে দেয। কর্ণেল সাহেব গির্জা ঘরের আশে-পাশে কোথাও থাকেন সে জানত। এও জানত তার সঙ্গে বৃটিশ পল্টনেব ব্যারাকেব পাদ্রীব খানিকটা তফাৎও আছে। তবু সে মাথা নেড়ে সায় দিল :

'হ্যাঁ সাহেব, জানি বই কি।'

'হ্যাঁ হামি পাদ্রী আছি। জগতেব একাম'ত্র ত্রাণকর্তা যীশু খ্রীষ্টই আমাব ঈশ্বর আছেন।' কর্ণেল সাহেব স্বগর্বে বলে চললেন : 'আমাডেব গির্জা ঘবে প্রভু যীশুব কাসে এলে টুমি টোমাব সকল বিপডেব হাট ঠেকে ট্রাণ পাবে।

বথা বীতিমত ঘাবড়ে যায। তাব বিপদেব কথা পাদ্রী সাহেব জানলেন কি ক'রে? ত্রাণকর্তা যীশু প্রভুটিই বা কে। উনি আবাব গির্জা ঘবে থাকেন নাকি? পাদ্রী সাহেবটি কি ওঁব ধর্মে বাবাকে দীক্ষিত কবতে চেয়েছিলেন? ভাবতে তাব কেমন যেন অবাক লাগে। শুধায :

'জগতের ত্রাণকর্তা যীশু প্রভু কি সাহেব?'

'এসো, আমার সঙ্গে এসো, বলসি।' কর্ণেল হাচ্চিন্‌সন্‌ বথাব হাত ধবে টেনে নিয়ে চললেন একবকম হেঁচডাতে হেঁচডাতে। উৎসাহে ফেটে পড়ে বিড়বিড় ক'রে আপন মনে গান গেয়ে উঠল :

> 'টোমার মাঝে আমাব প্রকাশ যীশু,
> জীবনখানা সঁপে দিলুম টোমাব করে—
> ওগো বিনিময়ে টাব চাইনি কিছু!'

বথা রীতিমত অবাক বনে যায়। উৎকট এক আত্মপ্রসাদ অনুভব করে সে সাহেবের সাদর আহ্বানে। গানটার এককলি মাথা-মুণ্ড বুঝতে না

পারলেও সে ওঁর পিছু পিছু হেঁটে চলল নীরবে। পাদ্রী সাহেব তখনও আপন মনে গেয়ে চলেছেন :

'যীশু, টোমার মাঝে আমার প্রকাশ'.

যীশু! যীশু! আবার কে!

জগতের ত্রানকর্তা সেই যীশু? কে তিনি? পাদ্রী সাহেব তো বলছেন, তিনি হলেন ঈশ্বর। হিন্দুদের দেবতা—তাঁর বাপ-ঠাকুর্দা যাঁকে পূজা করে, উঠতে বসতে তাঁর মা যাঁর নাম মুখে আনত হামেসা—সেই রামচন্দ্রের মত যীশুও একজন দেবতা বুঝি? বখার মনের আনাচে-কানাচে একগাদা প্রশ্ন জমে ওঠে। এক্ষুনি বুঝি সে ফেটে পড়বে বেলুনের মত। পাদ্রী সাহেব কিন্তু তখনও আপন মনে গেয়ে চলেছেন :

'শুধু টোমার মাঝে আমার প্রকাশ যীশু,
জীবনখানা সঁপে দিলুম টোমার করে—
ওগো বিনিময়ে যে চাইনি কিছু।'

'আচ্ছা হুজুর,' গানের মাঝখানে বখা সহসা প্রশ্ন ক'রে বসল। 'আচ্ছা হুজুর উনি কে? যীশু মেসায়?'

উত্তরে কিন্তু পাদ্রী সাহেব তখনও আপন মনে গেয়ে চলেছেন···

বখার কেমন যেন ধাঁধাঁ লাগে। হেঁয়ালীর মত মনে হয় পাদ্রী সাহেবের চাপা, অস্পষ্ট, ছন্দবদ্ধ গানের কলিগুলি। কিছুই সে বুঝতে পারে না। আবার প্রশ্ন করে : 'উনি কে সাহেব? যীশু মেসায়া।'

কর্ণেল সাহেব সহসা যেন বাধা পান। ফিরে আসেন বুঝি ধূলির ধরণীতে। জবাব দেন :

'যীশু হলেন্ পরম পিতা ভগবানের পুত্র। আমাদের সকলের ক্ষমার জন্য, উদ্ধারের জন্য তিনি তিলে তিলে নিজের প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন।'

বথার কেমন যেন খট্‌কা লাগে। 'আমাদের ক্ষমার জন্য তিলে তিলে তিনি প্রাণ দিলেন বিসর্জন—ভগবানের পুত্র'—তার মানে কি? মার কাছে তো শুনেছি, ভগবানেরা সব থাকেন স্বর্গে আশমানে; কেউ তাহলে ভগবানের পুত্র হয় কি ক'রে? আমাদের ক্ষমার জন্যই বা তিলে তিলে তিনি প্রাণ বিসর্জন দিলেন কি ক'রে? ক্ষমাই বা কিসের? দোষ করল কে? কে ঈশ্বরের ঐ পুত্রটি? পাদ্রী সাহেবকে সে শুধায়

'হ্যাঁ সাহেব যীশু মেসায়াটি কে? তিনি কি সাহেবদের দেবতা?'

প্রশ্নটা করেই বথার কেমন যেন ভয় ভঁয় করতে থাকে। সে জানে ইংরেজরা চাপা লোক! কথা-বার্তা বড় বিশেষ একটা বলেন-টলেন না। তার প্রশ্ন শুনে, কে জানে, পাদ্রী সাহেব হয়ত কিছু মনে করছেন!

পাদ্রী সাহেব ঘাড় ফিরিয়ে জবাব দিলেন :

'হ্যাঁ বাছা, তিনি হলেন ঈশ্বরের পুত্র। আমাদের মত পাপী তাপীদের উদ্ধারের জন্য নিজ প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন।'

পাদ্রী সাহেব তাবপর আপন মনে আব একটা গান গেয়ে চললেন। গানটা একঘেয়ে বিশ্রী লাগলেও বথা মুখে কিছু বলল না। খাস সাহেবের সহস্পর্শে এসে তার বুকটা গর্বে ফুলে উঠল। কৌতুহলী হয়ে এক সময় সে প্রশ্ন করল :

'সাহেব, আপনাদের গীর্জা ঘরে কি যেশু বাবারই ভজনা করা হয়?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, ওঁরই ভজনা করা হয়'।

পাদ্রী সাহেব নতুন ক'রে আবার গান ধরলেন। বথার সত্যিই এবাব বিশ্রী লাগল। মাথা-মুণ্ড একটা কলিও যদি সে বুঝতে পারত। সাহেবের পরনে প্যাণ্টলুন দেখে সে তাঁর সঙ্গ নিয়েছিল। সাহেবী বেশ ভূষা—পেণ্টলুন পরাটা বুঝি তার জীবনের একমাত্র কাম্য— একমাত্র

স্বপ্ন। সাহেবের মত কোট প্যান্টলুন পরে, আর তাদের মত টিস্ মিশ ক'রে কথা বলে সে যদি তাদের গাঁয়ের রেল ইষ্টিসানের সেই গার্ডটির মত হতে পারত, জীবনটা বুঝি তার ধন্য হয়ে যেতো। যেশু বাবা কে—এ নিয়ে তার এত মাথা ব্যথাই বা কেন? পাদ্রী সাহেবটি তাকে বোধ হয় তাদের নিজ ধর্মে দীক্ষা দিতে চান। অপর কোন ধর্মে দীক্ষিত হ'তে সে চায় না। কিন্তু যেশু বাবাটিকে তো জানতে তার কোন আপত্তি নাই। পাদ্রী সাহেব তখনও আপন মনে গান গেয়ে চলেছেন। বার বার বলছেন যেশু বাবা হলেন ঈশ্বরের পুত্র। কিন্তু ঈশ্বরের আবার ছেলে হয় কি ক'রে? ঈশ্বরই বা কে? আর রাম-চন্দ্রের মত উনি যদি কোন দেবতা হ'ন, তাঁর তবে আবার ছেলে হল্ল কবে? রামচন্দ্রের কোন ছেলে-পিলের কথা সে তো শোনে নি জীবনে। সত্যি তার কেমন যেন ধাঁধাঁ লাগে। সাহেবের হাত থেকে কোন রকমে পার পেতে পারলে সে যেন স্বস্তির হাঁফ ছেড়ে বাঁচে।

রথা অনেকখানি পিছিয়ে পড়েছিল। কর্ণেল সাহেব তা লক্ষ ক'রে মনে মনে ভাবল, হাতের শিকারটা বুঝি ফস্‌কে গেল এবার। পরম উৎসাহে তাই তিনি জাত-পাদ্রীদের মত রথার কাছে এগিয়ে এসে তার একখানা হাত ধরে বললেন:

'যীশু ঈশ্বরেরই পুত্র, বাছা! আমাদের জন্যই তিনি ক্রস কাষ্ঠে নিজ প্রাণ বিসর্জন দিলেন। আমরা কিন্তু এখনও সেই তিমিরের মধ্যে—সেই পাপীই রয়ে গেলাম?'

ক্রস কাষ্ঠে আবার আত্মবিসর্জন কেন? রথা শুধায় নিজেকে। বাড়ীর কথা তার মনে পড়ে যায়। জ্বর-জারী মহামারী কিংবা অমন কিছু একটা তাদের বস্তীতে সুরু হলেই মা তার কালী মন্দিরে গিয়ে পাঁঠা কিংবা কিছু একটা মানত ক'রে আসত। বলি খেয়ে মা কালীর ক্রোধ তবে শান্ত হ'ত। বিপদের হাত থেকে তারা রক্ষা পেত। কিন্তু যেশু বাবার

এই আত্মবলিদানের মানে কি?—ফ্যাল ফ্যাল ক'রে সে পাদ্রী সাহেবের দিকে তাকিয়ে থাকে। পাদ্রী সাহেবের এক সময় খেয়াল হয় ধাঙড়দের ছেলেটা তাঁর ইংরেজী ভজনের এক বিন্দু-বিসর্গও বুঝতে পারে নি। তাই বিশদভাবে তিনি বুঝিয়ে বললেন :

'যেশু আমাদের সকলকে সমান ভালবাসেন। তাঁর কাছে ধনী আর দরিদ্র, ব্রাহ্মণ আর ভাঙ্গির কোন তফাৎ নেই। আমাদের সকলকে প্রেম করেন বলেই তিনি আমাদের জন্য নিজ প্রাণ বিসর্জন দিলেন।'

'ধনী আর দরিদ্র, ব্রাহ্মণ আর ভাঙ্গির কোন তফাৎ নেই'—পাদ্রী সাহেবের মুখের শেষ কথাটা মনে তার ধাক্কা দেয়। যেশু বাবার কাছে ধনী আর দরিদ্র, ব্রাহ্মণ আর ভাঙ্গির, নাট-মন্দিরের সেই বামুন পণ্ডিতটার আর তার মধ্যে কি তাহলে সত্যি কোন তফাৎ নেই! আগ্রহে ফেটে প'ড়ে সে প্রশ্ন করল :

'আচ্ছা সাহেব, যেশু বাবার কাছে বামুন আর আমার মধ্যে কি কোন তফাৎ নেই?'

'না বাছা, যীশুর চোখে আমরা সবাই সমান।' পাদ্রী সাহেব বক্-বক ক'রে আউড়ে চললেন : 'তিনি হলেন ঈশ্বরের পুত্র। আর আমরা সবাই হ'লাম পাপী-তাপী। পরম পিতার দরবারে তিনি আমাদেরই মধ্যস্থ হয়ে দাঁড়ান। যীশু আমাদের সকলের উপরে।'

'সকলের উপরে', 'আমরা সবাই পাপী' কেন—কেন? কেন একজন আর একজনের উপরে থাকে—কেন এই বৈষম্য? বখার মনে সংশয় দানা বাঁধতে থাকে। দম দেওয়া কলের গানের মত পাদ্রী সাহেব তখনও সমানে বকে চলেছেন :

'আমরা যদি আমাদের নিজ অপরাধ স্বীকার না করি তিনি আমাদের কখনও ক্ষমা করবেন না। আর তিনি ক্ষমা না করলে অনন্ত নরক ভোগ

আমাদের করতে হবে। বাছা, আমার কাছে তুমি নিজ দোষ সব স্বীকার করে ফেল। আমি তখন তোমায় আমাদের খ্রীষ্টান ধর্মে দীক্ষা দেব।'

'কিন্তু হুজুর, যেশু বাবাকে আমার তো এখনও জানা হল না। ঠাকুর রামচন্দ্রের কথা শুনেছি। কিন্তু যেশু বাবার কথাতো কিছুই জানি না।'

'তোমাদের রামচন্দ্র হোল পৌত্তলিকদের দেবতা।' পাদ্রী সাহেব একটু থেমে জবাব দিলেন। 'এস বাছা, আমার সঙ্গে এসে নিজ দোষ সব স্বীকার ক'রে ফেল। তা'হলে তোমার মৃত্যুর পর যীশু তোমায় উদ্ধার করবেন।'

সাহেব হোক আর যেই হোক, বখার মোটেই ভাল লাগছিল না এসব প্রসঙ্গ। দীক্ষার নাম শুনে সে রীতিমত আঁৎকে উঠল। পাদ্রী সাহেবের মতলবখানা কি? তাকে কেউ পাপী বলুক সে তা বরদাস্ত করতে পারে না। এমন কি পাপই বা করেছে সে? ঘটা ক'রে তা আবার স্বীকার করবার কি আছে? যতসব বাজে বুজরুকী! পাপ স্বীকার ক'রে তার অমন কি ফয়দা হবে? সাহেবটা তার কাছ থেকে গোপন কিছু একটা জেনে নিতে চাইছে নাকি? স্বর্গে গিয়ে তার কাজ নেই বাপু! আর হিন্দুরা সে সব বিশ্বাসও করে না। সে ত শুনেছিল মানুষ মরে কিছু না কিছু একটা হ'য়ে আবার পর-জন্ম গ্রহণ করে। পর-জন্মে সে কুকুর কিংবা গাধা না হলেই হ'ল।...

যেশু বাবাটি কিন্তু খুবই ভাল লোক। বখা আবার ভেবে নিল: 'তাঁর কাছে বামুন আর ভাঙ্গির কোন তফাৎ নেই। কিন্তু যেশু বাবাটিই বা কে? এলেনই বা কোথা থেকে? কই পাদ্রী সাহেব ত কিছু বলল না সে সব? টুটা-ফুটা এক জোড়া প্যাণ্টলুন হয়ত এবার দিয়ে দেবেন বখাকে। নেহাৎ অনিচ্ছা সত্ত্বেও বখা চলল পাদ্রী সাহেবের পিছু পিছু হেঁটে।

এক সার নিম গাছের মাঝখানে বাংলো ধরনের একখানা কোঠা ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে কর্ণেল সাহেব সহসা বলে উঠলেন:

'এই যে আমার বাড়ী!'

এ বাড়ীর সামনে দিয়ে বথা বহুবার যাতায়াত করেছে।

'হ্যাঁ সাহেব, আমি জানি।'

'বছর পাঁচেক আগে ওটা ছিল একটা হিন্দুর আবগারির ডিপো। আফিং তৈরী হতো ওখানটায়।' জায়গাটা দখল করতে গিয়ে তাঁকে কম বেগ পেতে হয় নি। পাদ্রী সাহেব সগর্বে বাড়ীখানা দখল করার ইতিহাস বললেন। যীশু খ্রীষ্টের অপার করুণায় মুখর হয়ে তিনি তারপর গদগদ কণ্ঠে বলে উঠলেন: 'হে প্রভু, তুমি কী মহান, কী বিচিত্র তোমার লীলা। প্রভু, তুমি সত্যি জগতে আলোর বন্যা বহন ক'রে এনেছ!'

তিনি তারপর বথার দিকে তাকালেন। বললেন: 'তাঁরই অপার করুণায় আমি পৌত্তলিক বিধর্মীদের উৎখাত্ করতে সক্ষম হয়েছি।'

উঠানের মাঝখানে লম্বা ঘাড় উঁচু গীর্জা ঘরটা থেকে চাপা অস্পষ্ট একটা ভজনের সুর ভেসে আসছিল। কর্ণেল সাহেব তার সঙ্গে সুর মিলিয়ে সহসা আবৃত্তি ক'রে উঠলেন।

'জর্জ—জর্জ, চা হয়ে গেছে।' কর্ণেল সাহেবের ক্ষীণ কণ্ঠ ছাপিয়ে ভিতর বাড়ি থেকে হঠাৎ ভেসে এল মোটা বাজখাঁই গলা।

'আসছি গো আসছি!' কর্ণেল সাহেব জবাব দিলেন। স্ত্রীকে তিনি রীতিমত ভয় করেন। বিপদে পড়লেন বথাকে নিয়ে। ভেবে উঠতে পারলেন না বথাকে নিয়ে এখন কি করবেন। ওকে সঙ্গে ক'রে বাংলোয় ঢুকবেন না গীর্জা ঘরে যাবেন? সত্যি, তিনি উভয়-সংকটেই পড়লেন।

'কোরছো কি শুনি? সারা বিকেল ছিলে কোথায়?' ভিতর বাড়ি থেকে ক্রুদ্ধ কণ্ঠস্বর আবার ভেসে এল এবং সঙ্গে সঙ্গে বারান্দায় এসে হাজির হলেন বিপুল ভুঁড়িওয়ালা বেঁটেখাটো আধবয়সী এক মেমসাহেব। একরাশ পাউডার ঘষা মুখখানা তার গোল; রুজ-মাখা ঠোঁটে লম্বা হোলডার সমেত এক জ্বলন্ত সিগারেট; কুদে কুদে দুটি চোখে একজোড়া পাঁসনে চশমা;

মাথার কালো চুলগুলি 'ইটন্-ছাঁটা,' আর বিচিত্র রঙচঙে একটা স্নুতির ছাপা ফ্রক বক্ষদেশ থেকে সুরু ক'রে হাঁটু পর্যন্ত এসে হঠাৎ বেহায়া ভাবে ফুরিয়ে গেছে নিঃশেষে।

'নোংরা কালা আদমীদের সঙ্গে আবার মাথা-মাখি ঢলাঢলি সুরু করেছ বুঝি? নাঃ তোমায় নিয়ে আর পারা গেল না!' মেমসাহেব সহসা ঝংকার দিয়ে উঠলো ওদের দু'জনকে দেখে।—'নাঃ, তোমাকে নিয়ে আর সত্যি পারা গেল না। গত হপ্তায় না তুমি কংগ্রেসওয়ালাদের হাতে অমন মারটা খেলে? তবুও বুঝি তোমার শিক্ষা হল না।'

'কি হোল? আসছি গো আসছি।' কর্ণেল সাহেব জবাব দিল বিপন্ন বোধ ক'রে নিজেকে।

ব্যাপারখানা সুবিধার নয় দেখে রথা[1] কেটে পড়ছিল নিঃশব্দে। কর্ণেল সাহেব তা দেখতে পেয়ে ওর একখানা হাত ধরে বলে উঠলেন:

'আরে দাঁড়াও, দাঁড়াও—তোমাকে আমি গীর্জা ঘরে নিয়ে যাচ্ছি।'

'হ্যাঁ, এখন তুমি ওকে গীর্জায় নিয়ে যাও আর এদিকে চা-টা জুড়িয়ে ঠাণ্ডা হয়ে যাক।' মেরী হাচ্চিনসন আবার ঝংকার দিয়ে উঠলেন।—'রাজ্যের যত সব নোংরা ছোটলোক ভাঙ্গি আর চামার নিয়ে তুমি ঢলাঢলি করতে থাক আর আমি তোমার চা-নিয়ে বসে থাকি। আমারটা আমি খেয়ে নিচ্ছি গে।' রাগে গজ-গজ করতে করতে মেম সাহেব ভিতর বাড়িতে ঢুকে পড়ল!

'সালাম সাহেব, সালাম।'

রথা মেম-সাহেবের তর্জন-গর্জনের মূল কারণটা কিছুই বুঝতে পারে নি। তবু তার মুখে ভাঙ্গি আর চামার কথা দুবার উচ্চারিত হতে দেখে ব্যাপারটা সে কিছুটা যেন আন্দাজ ক'রে নিলে। পাদ্রীর হাত থেকে নিজেকে মুক্ত ক'রে নিয়ে সটান সে দৌড় দিল।

'আরে দাঁড়াও বাছা, দাঁড়াও।' পাদ্রী সাহেব পেছন থেকে চীৎকার ক'রে উঠলেন।

ছাড়া পেয়ে রথা প্রাণপণে দৌড়াতে লাগল। ভয় হল, কি জানি মেম-সাহেব যদি তেড়ে এসে তার ঘাড়টা মটকে দেয় ডাইনীর মত সত্যি সত্যি!

দ্রুত অপসৃয়মান রথার দিকে তাকিয়ে পাদ্রী-সাহেব তখন আপন মনে গেয়ে উঠলেন:

'ধন্য টোমার প্রেম প্রভু,
ধন্য টোমার নাম।'

সবাই যেন তার পেছনে লেগেছে। খুঁতেখুঁতে কিছু একটা বার করা চাই! মন্থর হয়ে আসে এক সময় রথার চলার গতিটা; আপন মনে সে ভাবতে থাকে। পাদ্রী-সাহেবই ত তাকে ডেকে এনেছিল নিজে। বলেছিল সব দোষ স্বীকার ক'রে ফেলতে। বাপস্, মেম-সাহেব তো না, যেন কেউটে সাপ! ভাঙ্গি আর চামারদের উল্লেখ ক'রে কি যেন সব বলছিল কে জানে? বাপস্, সাহেবের উপর কী রাগ! তাকে দেখেই তো মেম-সাহেবের মেজাজ গেল বিগড়ে। পাদ্রী সাহেবকে কি সে সাধাসাধি করেছিল এখানে তাকে নিয়ে আসতে? উনি নিজে এসেই তো তার সঙ্গে গায়ে পড়ে কথা কইলেন। আহা, প্যাণ্টলুন জোড়াটি আর চেয়ে নেওয়া হোল না। মেম সাহেবটি অমন রাগ না করলে সে ঠিক চেয়ে বসতো।...

রথা ভাবতে থাকে যেতে যেতে। মনটা তার টন-টন ক'রে ওঠে এক সময়। সকালবেলাকার তিক্ত অভিজ্ঞতাগুলি আবার হানা দেয় তার মনের আনাচে-কানাচে। নিজেকে তার বড় ক্লান্ত অসহায় মনে হয়। আশ-পাশের ভিজা মাঠ থেকে একটা সোঁদালি গন্ধ উঠতে থাকে—নাকে এসে তার লাগে বুঝি। দূর-দিগন্তের কোন ঘেষে ঢলে পড়েছে বিকেলবেলাকার সূর্য। দেখে মনে হয় যেন স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে আছে পটে আঁকা ছবির মত। মাঠ-ঘাট, বন-বনান্তের সর্বত্র বুঝি বিরাট সাড়া পড়ে গেছে পাট গুছিয়ে নেবার। দীর্ঘ সারির পর সারি বেঁধে পাখীরা সব নিজ, নিজ কুলায়ে ফিরে চলেছে

বুলাশা শহরের সন্ধ্যার হিমেলি আকাশকে মুখরিত ক'রে কল-কাকলিতে ঃ ঝিঁঝি পোকারা খাবারের সন্ধানে বেরিয়ে পড়ে ঐক্যতান জুড়েছে সকলে মিলে। দূরে কোথাও বুঝি শাঁখ বেজে উঠল। পথের দুপাশের ঘাসের নরম ডগাগুলির উপর সূর্যের সোনালী আলো এসে পড়ে ঝলমল করছে।

চলতে চলতে বথার চোখ গিয়ে পড়ে এক সময় এক কুষ্ঠ রোগীর উপর। পরণে এক গাদা ছেঁড়া ন্যাকড়া ; সর্বাঙ্গে গলিত ঘা দগ-দগ করছে। রাস্তার এক পাশে বসে হাত তুলে সে ভিক্ষা চাইছে আর করুণস্বরে অনুনয় করছে :

'বাবা একটো পেসা দে।'

বথা সহসা আঁৎকে ওঠে। দুপা হটে এসে পাশ কেটে সে এগিয়ে গিয়ে গ্র্যাণ্ডট্রাঙ্ক রোড ধরে হাঁটতে থাকে। নিকটেই বুলাশা রেল ইষ্টিশান। আশপাশে বিস্তর পোঁটলা-পুঁটলি নিয়ে যাত্রীদের ভীড়। রাস্তার একপাশে খানকয়েক খাবারের দোকান। এক ভিখারী মেয়ে একটা দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খাবার চাইছে। কোলে তার একটি ছেলে, পিঠের ঝোলায় আর একটি বাঁধা। আর একটি পরণের নোংরা কাপড় আঁকড়ে ধরে দাঁড়িয়ে আছে। ছোট কয়েকটা ছেলে ট্রেনের আশেপাশে ছুটা-ছুটি ক'রে বেড়াচ্ছে। পয়সা চাইছে গাড়ির যাত্রীদের কাছে। কিন্তু কেউ একটা পয়সাও দিচ্ছে না। ভিখারীদের কাতর কাকুতি-মিনতিতে বথা মনে মনে একটা উৎকট আনন্দ লাভ করে। আবার সঙ্গে বিশ্রী বিরক্তও লাগে একটা পয়সা ভিক্ষার জন্য ওদের কান্নাকাটি সঙ্গে চিৎকার আর আশীর্বাদের বহর দেখে।

রেলওয়ে পুল ধরে সে নামছিল, এমন সময় হুসহুস ক'রে একখানা ট্রেন নীচ দিয়ে অতিক্রম ক'রে গিয়ে স্বশব্দে একটু দূরে টিনের ছাওনিওয়ালা প্লাট-ফরমটার সামনে দাঁড়াল। ঝিমিয়ে পড়া গোলবাগ্-এর আকাশ বাতাস বিদীর্ণ ক'রে সঙ্গে সঙ্গেই জনতার এক উল্লসিত চিৎকার ওঠল। প্লাটফরমে সবাই ভীড় ক'রে এগিয়ে গেল ট্রেণের দিকে। মুখে তাদের এক আওয়াজ :

'মহাত্মা-গান্ধী কি জয়!'

'মহাত্মা-গান্ধী কি জয়!'

রথা রেলওয়ে পুল পার হয়ে প্লাটফরমের উপর এসে দাঁড়াল, ইঞ্জিনের একরাশ ধোঁয়া নাকে-মুখে তার ঢুকে পড়েছিল। চোখ দুটি একবার কচলে নিয়ে সে দেখল গোলবাগ-এর ক্রীকেট খেলার মাঠের দিকে ধোপ-দুরস্ত জামা-কাপড়-পরা হাজারে হাজারে লোক চলেছে ছুটে। বিপুল জন সমুদ্রের দিকে রথা তাকাল চোখ তুলে। ধুপধাপ ক'রে সশব্দে সিঁড়ি বেয়ে একদল লোক ছুটে গেল ওদিকে। রথা শুনতে পেল ওরা বলছে:

'মহাত্মা এসে গেছেন রে—এসে গেছেন!'

কে যেন চিৎকার ক'রে বলে উঠল:

'গোলবাগের ক্রীকেট মাঠে আজ এক সভা হবে। মহাত্মা গান্ধী বক্তৃতা দেবেন সেখানে।'...

তাই শুনে দলে দলে পথচারীরা অমনি ছুটতে লাগল গোলবাগ-এর দিকে। রথাও ভীড়ের মধ্যে মিশে গেল। কোথায় চলেছে সে নিজেও জানে না। 'মহাত্মা'র নাম শুনেই বুঝি সবাই ছুটেছে অন্ধের মত। ঐ নামটা তার কাছে কেমন যেন রহস্যময় বলে মনে হয়। ইন্দ্রজালের মত ভীড়ের মধ্যে মিশে গিয়ে সে এগিয়ে চলে তার পায়ের ভারী বুটের শব্দ করতে করতে। সে যে ধাঙড় এবং সত্যি সত্যি সে যে আশপাশের অনেক জনকে ছুঁয়ে দিয়েছে একবার তার খেয়ালও হল না। হাতে তার কোন ঝাড়ু কিংবা ঝুড়ি নেই। সে যে একজন অচ্ছুত-ধাঙড় দেখে বুঝবার জো নেই। আশপাশের ব্যস্ত মুখর জনতাও তা লক্ষ্য করল না। সবাই ছুটে চলেছে গোলবাগ-এর দিকে।

রেলওয়ে পুলের নীচে মোটর বাসের স্ট্যাণ্ড। ওখান থেকে গোলবাগ-এর মুখ পর্যন্ত কাতারে কাতারে হাজারে হাজারে জনতার ভীড় দেখে মনে হয় ও যেন রীতিমত ঘোড়-দৌড়ের মাঠ। জাতিবর্ণ নির্বিশেষে নর-নারী ছেলে-

পিলের দল সবাই ছুটেছে মাঠের দিকে। তার মধ্যে আছে বুলাশা শহরের ব্যবসাদার হিন্দু লালারা, সুশ্রী সুবেশ চটকদার পোষাক পরা শিখরা, স্থানীয় গালিচা কারখানার কাশ্মীরী মুসলমানরা; আশপাশের গাঁয়ের শিখ চাষা-ভুসারাও ছুটে চলেছে। ওদের কারো হাতে লোহার পাটী; কারো পিঠে বাজারের পুঁটলি, সীমান্ত প্রদেশের কংগ্রেসী নেতা আব্দুল গফ্ফর খাঁর চেলা সেই বিরাট পাঠানরাও এসেছে। এসেছে 'স্যালভেশন আর্মী'র বস্তির কালো কালো সেই ভারতীয় খ্রীষ্টান মেয়েরা—পরণে তাদের রঙচঙে খাটো খাটো স্কার্ট ব্লাউজ আর ওড়না। তাদের অচ্ছুৎ পল্লী থেকেও অনেকে এসেছে। বখা দেকে দেখে চিনতে পারল অনেককে। অপর সকলের মত একজন ইংরেজও এসেছে মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর প্রতি নিজের শ্রদ্ধা নিবেদন করতে। জন-সমুদ্রের কেউ কাউকে কোন প্রশ্ন করছে না, কেউ জিজ্ঞেস করছে না তুমি চললে কোথায়। সবাই পরস্পর পাল্লা দিয়ে ছুটে চলেছে আপন লক্ষ্য পথে।

কেল্লা-সড়কটার যেন আর শেষ নেই। লোক ঘিস ঘিস করছে, পা ফেলবার জো নেই। গোলবাগ-এর এক কোণের দিকে মিউনিসিপ্যালিটির নর্দমার জল চুঁয়ে পড়ে খানিক জলা ভূমির মত হয়েছিল। বখা তাড়া-খাওয়া দামড়া বাছুরের মত এক লাফে ওই ডোবাটুকু পেরিয়ে পড়ল পাশের বাগানটির মধ্যে। দুপায়ে মাড়িয়ে একাকার ক'রে দিল মিষ্টি মটর আর ফুলের কচি কচি চারাগুলোকে। বখার দেখা দেখি পেছনের অতগুলি লোকও একে একে লাফিয়ে পড়তে লাগল বাগানের মধ্যে। দেখতে না দেখতে অমন সুন্দর বাগানটা যে একেবারে নষ্ট হয়ে গেল তা কিন্তু কেউ একবার ভ্রুক্ষেপও করল না।

বাগানের পেছন দিকটায় ক্রিকেট মাঠের মধ্যখানে তখন হাজারে হাজারে লোক এসে জমায়েৎ হয়েছে। সেই বিপুল জন সমুদ্র থেকে চাপা এক উত্তেজনা, অস্ফুট গুঞ্জন ধ্বনি থেকে থেকে উদ্বেলিত হয়ে উঠছে,

আর মাঝে মাঝে তা ফেটে পড়ছে গান্ধীজীর জয়ধ্বনিতে। ক্রিকেট মাঠের কাছাকাছি এসে সে পাশের একটা গাছে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে। বথার অদম্য আগ্রহ ও উদ্দপনায় ভাঁটা না পড়লেও মনে মনে তবু সে কেমন যেন দমে যায়। কেমন যেন খাপছাড়া, বিচ্ছিন্ন স্বতন্ত্র বলে মনে হয় নিজেকে। সুশ্রী সুবেশ জনতার পাশে গু-মুৎ-ঘাটা তার খাকী পোষাকটা অত্যন্ত বিশ্রী, বেমানান ঠেকে। তার সঙ্গে এ জনতার কি অতলান্তিক তফাৎ, জাতি আর বর্ণের কি দুস্তর দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান! ব্যাপারটা সে বুঝেও যেন ঠিক বুঝতে পারে না। অনেকটা হেঁয়ালীর মত তার মনে হয়, গান্ধীই বুঝি ঘুচাবে দুস্তর এই ব্যবধানের বেড়াজাল—হাত ধরে তাকে নিয়ে যাবে ওদের কাছে। উন্মুখ হয়ে বথা অপেক্ষা করতে থাকে গান্ধীজীর।

সত্যি গান্ধীজী সম্বন্ধে তার আগ্রহ কিম্বা ঔৎসুক্যের অভাব ঘটে নি কোনদিন। কত কথাই না সে শুনেছে গান্ধীজী সম্পর্কে। লোকে ব'লে বেড়ায়, তিনি হলেন এক মহাপুরুষ—স্বয়ং ভগবান বিষ্ণু আর কৃষ্ণের অবতার! সে দিন সে বাবুদের পাড়ায় শুনেছিল, এক মাকড়সা নাকি দিল্লীর লাটসাহেবের খাস কুঠিরে ঢুকে পড়ে দেয়ালে এই মহাপুরুষের একমূর্তি আঁকছিল জাল বুনে বুনে! পরিষ্কার ইংরেজী হরফে নামও তাঁর লিখে দেয় নীচে। মাকড়সার জাল বোনাটার তাৎপর্য নাকি অনেক। সাহেবদের হুঁশিয়ার ক'রে নাকি তাতে বলা হয়েছে, আর কেন, হিন্দুস্থান থেকে এবার তোমরা পাততাড়ি গুটাও। স্বয়ং ভগবানই নাকি মাকড়সার বাহন হয়ে জানিয়ে দিয়েছেন: 'গান্ধীজীই এবার থেকে সমগ্র হিন্দুস্থানের মহারাজ হবেন।' লাটসাহেবের কুঠিরে মাকড়সার জাল হল তারই জ্বলন্ত প্রতীক। শুধু তাই নয়, বাবুরা আরো সব বলছিল দুনিয়ায় এমন কোন তরোয়ার নেই গান্ধীজীর গায়ে খোঁচা দেয়, এমন কোন গুলী গোলা নেই যা তাঁর গায়ে বিঁধে, এমন কোন আগুনও নেই নাকি যা তাঁকে দগ্ধ করতে পারে!

বথাব পাশে এক লালা দাঁড়িযে ছিল। সে এক এক সময় বলে উঠল :

'সবকাব গান্ধীজীকে বীতিমত ভয ক'রে চলেন! বুলাশা শহবে আসা সম্পর্কে তাঁব উপব যে নিষেধাজ্ঞা ছিল ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব তা বাতিল কবতে বাধ্য হযেছেন।'

'ও সব বাজে কথা। সবকাব তাঁকে বিনা সর্তেই মুক্তি দিয়েছেন জেল থেকে।' পাশেব এক বাবু ফস্ ক'বে ফোড়ন দিযে বলে ওঠে নিজেব কাগজী বিদ্যাব বিজ্ঞাপ্তি দিয়ে।

'হ্যাঁ, বাবু, সবকাবকে উনি উৎখাত কবতে চান নাকি?' এক চাষী প্রশ্ন কবল অবাক হযে।

'সে শক্তিও তাঁব আছে হে, আছে। ইচ্ছে কবলে গোটা দুনিযাটা শুদ্ধু তিনি পালটে দিতে পাবেন।' এই বলে সেই বাবুটি তখন গান্ধীজী সম্পর্কে সেদিনকাব "ট্রিবিউন' পত্রিকাব গোটা সম্পাদকীয প্রবন্ধটা বক বক কবে আউড়ে গেল :

'বৃটিশ সবকাব তো কোন্ ছাড! বাজনৈতিক, অর্থনৈতিক কিংবা শিল্প জগতে ইযোবোপ আব আমেবিকাব প্রত্যেকটি দেশে আজ প্রচণ্ড অন্দোলন সুরু হযে গেছে। বিলাতেব 'অঙ্গবেজ লোকেবা' স্বভাবত বক্ষণশীল। তবু এই সংকটেব হাত থেকে তাবা নিষ্কৃতি পাবে না যদি না পাশ্চাত্য দেশগুলি তাদেব মূল নৈতিক কিংবা মানসিক দৃষ্টিকোণ বদলায। আমূল পবিবর্তন সাধিত না হলে পাশ্চাত্য সভ্যতাব কিছুতেই নিস্তাব নেই।... কিন্তু ভাবতীয কৃষ্টি নবনাবী নির্বিশেষে সকলকে এই শিক্ষা দিযে আসছে, মিথ্যা মবীচিকাব মত ইন্দ্রিয় তৃপ্তিব পিছু পিছু ঘুবো না; স্বধর্ম অনুশীলন কবতে থাকো। সিগাবেট কিংবা সিনেমা প্রভৃতি ইন্দ্রিয তৃপ্তিব পথে মোক্ষম কোন আনন্দ নেই।...আধুনিক জগতেব সম্মুখে গান্ধীজীই ভাবতেব এই আধ্যাত্মিক মতবাদ তুলে ধববেন। জগতকে তিনি শিক্ষা দেবেন, ভগবৎ প্রেমেব সঠিক ধর্ম। তাই হবে শ্রেষ্ঠ 'স্ববাজ'।...'

'বাপরে কি বুদ্ধি, কতখানি পণ্ডিত বাবুটি!' চাষাটি ফ্যাল ফ্যাল ক'রে তাকিয়ে থাকে বাবুটির দিকে। কথা বলছে না যেন তুবড়ীর খৈ ছুটছে! বক্তৃতা শুনতে শুনতে তার কেমন যেন ধাঁধাঁ লাগে। গান্ধীজীর নামই তার কাছে সত্যি এক কিংবদন্তী, অলৌকিক রহস্যময় বলে মনে হয়। গত চৌদ্দ বছর থেকে সে শুনে আসছে কৃষ্ণজী মহারাজের অবতার গুরু নানকের মত মহাত্মাও এক সিদ্ধ মহাপুরুষ!···সে তার গিন্নীর মুখে আরো শুনেছিল, কত অদ্ভুদ অদ্ভুদ কাজ, অলৌকিক কত কীর্তিকলাপ তিনি করতে পারেন! তিলকে তাল বানাতে পারেন! দেবতার এক মন্দিরে গান্ধীজীকে একবার রাত্রি যাপন করতে হয়েছিল। বিগ্রহের দিকে পা দিয়ে গান্ধীজী নাকি শুয়ে ছিলেন। মন্দিরের পুরোহিত তা দেখতে পেয়ে তাঁকে নাকি তখন ভর্ৎসনা করতে থাকে। বলে: ইচ্ছে করেই গান্ধীজী ঠাকুরের দিকে পা দিয়ে শুয়েছে। তিনি তখন জবাব দেন: আচ্ছা ঠাকুর মশাই, বলতে পারেন দেবতা কোন দিকে নেই? মন্দিরের পুরোহিত তখন করলে কি, গান্ধীজীর পা দুটোকে বিপরীত দিকে সরিয়ে দিল। কিন্তু কি তাজ্জব ব্যাপার, দেখতে না দেখতে মন্দিরের বিগ্রহটাও পূর্বস্থান থেকে সরে গিয়ে গান্ধীজী যে দিকে পা দিয়ে শুয়েছেন সে দিকে চলে আসেন! কাহিনীটা শোনার পর থেকেই না গান্ধীজীকে একবার দেখবার জন্য সে ঘুরে বেড়াচ্ছে পঁই-পঁই ক'রে। আর তার গিন্নী তো গান্ধী মহাপুরুষের একবার পদধূলি নেবার জন্য রীতিমত পাগল হয়ে গেছে। যাক, গিন্নী সঙ্গে না এসে ভালোই হয়েছে। এলে ছেলে-পিলেরাও আসতো। এই ভীড়ের মধ্যে ওদের নিয়ে মহা বিপদে পড়তে হত। ভাগ্যিস, আজকেই সে গাঁ থেকে সওদা করতে এসেছিল শহরে···চাষাটি ভাবতে থাকে আপন মনে।

বখা বাবুটির কথাগুলি শুনছিল মন দিয়ে। সবটা বুঝে উঠতে না পারলেও মোটামুটি কিছুটা সে আন্দাজ ক'রে নিল।

'আচ্ছা বাবু, বলেন তো ফিরিঙ্গীরা সব দেশ ছেড়ে চলে গেলে উনি কি

আমাদের গাঁয়ের খালগুলোর তদারক করবেন ?'—গাঁয়ের চাষীটিকে হঠাৎ প্রশ্ন করতে শুনল বখা। গান্ধীজী সম্পর্কে তার কৌতুহল বেড়ে ওঠে ক্রমশঃ।

'ভাই জী, আবে, জান না বুঝি,' খালের নাম শুনে বাবু লোকটি অমনি ফস্ ক'রে বলে উঠল: 'বাবু রাধাকুমুদ মুখার্জি বলেন, যীশুখ্রীষ্ট জন্মাবার চার হাজার বছর পূর্বেও প্রাচীন ভারতে প্রঃপ্রণালীর অভাব ছিল না। ওই যে গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডটা দেখছো, ওটাই বা কে তৈয়ারী করল, ইংরেজরা বুঝি ?'

'কিন্তু আমাদের মামলা-মোকর্দমা গুলো নিয়ে কি করা যাবে ?' জাট্ চাষীটি আবার প্রশ্ন করে: 'গাঁয়ের মাতব্বর ব্যক্তিরা পঞ্চায়েতে গেলে পর আমাদের মত গরীব লোকদের কোন সুবিচার পাবার আশা নেই। ওঁরা যাদের দেখতে পান না সে সব শত্রুদের উপর একহাত নিতে ছাড়েন না। এদিকে গান্ধীজী নাকি বলছেন, সরকারী আদালতে না গিয়ে পঞ্চায়েতের সালিশী মেনে নিতে।'

'ভালো পঞ্চায়েত হলে তো কথাই নেই! গাঁয়ের কত উন্নতিই না করা যায়।' বিদ্যা দিগ্‌গজ বাবুটি জবাব দিল সঙ্গে সঙ্গে: 'এখন অবশ্য ভালো একটি পঞ্চায়েতের সাক্ষাৎ মেলা ভার। কিন্তু অতীতে এমন ছিল না। প্রাচীর নির্মান বলো, সড়ক প্রস্তুত করা বলো, জন-হিতকর কত কাজ—জন সাধারণের কত মঙ্গল না সাধিত হয়েছে ঐ গ্রাম্য পঞ্চায়েতগুলো দিয়ে।'

জাট চাষী কিংবা বখা কেউ বাবু লোকটির অত সব বড় বড় কথা ঠিক বুঝতে পারল না। জাট চাষীটির মুখে গাঁয়ের গরীব লোকদের কথা শুনে বখার নিজেদের ছোটলোক অচ্ছুৎদের কথা মনে পড়ে যায়। ভাঙ্গি আর চামারদের জন্য গান্ধীজী অনশন সুরু করবেন এ খবরটা সে যেন কোথায় কার মুখে শুনেছিল। আচ্ছা খালি উপোস করলে তাদের মত গরীব লোকদের কি ফয়দাটা হবে ? বখা প্রশ্ন করে নিজেকে।—তারা যে খেতে পায় না এবং ভালো খেতে না পেয়েও তারা যে বেঁচে আছে, গান্ধীজী কি নিজে তাই প্রমান করছেন ?...

বথাব চিন্তা সূত্রে ছেদ পড়ে সহসা। বাবু লোকটিব কথা বার্তা শুনে এক লালা কোথা থেকে এগিযে এসে বলে ওঠে :

'আমাদের সাধ্যে যা কুলায তা আমবা কবব। ম্যানচেষ্টাবেব বিলীতি কাপড আমবা এখনই বযকট কবতে বাজী আছি কিন্তু প্রতিশ্রুতি চাই স্বদেশী মিলগুলো আমাদেব একচেটিযা হবে। শুনছি গান্ধীজী নাকি জাপানের সঙ্গে কাপড চালান নিযে এক চুক্তি করছেন।'

এমন সময এক কংগ্রেসী ভলানৃটিযাব পাশ কেটে যাচ্ছিল। শুনতে পেযে বলে উঠল : 'কোন স্বদেশী বা আইন অমান্য আন্দোলন নিযে গান্ধীজী কিছু বলবেন না। হবিজনদেব জন্য খালি প্রচাব কার্য কববেন এই শর্তে তিনি জেল থেকে ছাড়া পেযেছেন।'

'হবিজন!' কথাটা সে যে ইতিপূর্বে শোনেনি এমন নয। তবু তাব কেমন যেন খটকা লাগে। বহস্যময বলে মনে হয।...তাব মনে পড়ে মাস খানেক আগে জন কয়েক কংগ্রেস কর্মী তাদেব বস্তিতে একবাব এসেছিল। তাদেব উদ্দেশ্য ক'বে বলেছিল : হিন্দুদেব থেকে তাবা আলাদা নয। তাদেব ছুঁলে পব কারো জাত যায না, অপবিত্র হয না কিছুই। কংগ্রেস ভলানৃটিযাবেব কথা কযটি মনে তাব তুমুল ঝড তোলে। সভায এসে সে ভালোই কবেছে। গান্ধীজী নিশ্চয ছোটা, বামচবণ, তাব বাবা কিংবা তাব মত ভাঙ্গি চামাব অচ্ছুতদেব সম্বন্ধে অনেক কিছু হয়ত বলবেন। কে জানে, কি বলবেন নতুন কথা। 'স্যালভেশান আর্মী'ব পাদ্রীটি তো বলছিল, ধনী আব দবিদ্র, ব্রাহ্মণ আব ভাঙ্গিব মধ্যে কোন তফাৎ নেই—একই সমান সকলে। মহাত্মা গান্ধী এমন কি আব বলবেন? তবু এসে তার ভালোই হলো। বথা ভাবতে থাকে আপন মনে। হাজাব প্রশ্ন মনে তাব ভীড ক'বে আসে।...চিন্তা সূত্র তাব ছিন্ন ক'বে হঠাৎ সহস্র কণ্ঠেব সমবেত জযধ্বনি ওঠে :

'মহাত্মা-গান্ধী কি জয।

চমকে উঠে সে গোলবাগ-এব ফটকেব দিকে তাকায, দেখে একখানা

মোটর এসে থেমেছে তার সামনে, আর হাজারে হাজারে লোক ছুটে গিয়ে ঘিরে ধরেছে গাড়ীখানা। সেও ছুটে যাবে, না দাঁড়িয়ে থাকবে বুঝে উঠতে পারল না। না, না-যাওয়াটাই ভাল। ঠেলাঠেলি ক'রে ভীড়ের মধ্যে যাবার সময় কাউকে হয়ত ছুঁয়ে দেবে, তারপর বিশ্রী একটা কাণ্ড হয়ত ঘটে বসবে। অত লোকের মধ্যে গান্ধীজী ছুটে এসে তাকে রক্ষা করতেও পারবেন না। একটু ইতস্ততঃ ক'রে রথা তারপর তাকাল মাথার উপরকার গাছটার দিকে। বানরের মত অনেকগুলো লোক গাছটায় চড়ে নিজেদের আসন ক'রে নিয়েছে তার ঘন ডাল-পালার মধ্যে। পায়ের বুট জুতোটার জন্য একটু বেগ পেতে হলেও গাছটায় সে চড়ে বসল কোন রকমে।

'মহাত্মা গান্ধীজী কি জয়', 'হিন্দু-মুসলমান-শিখ কি জয়,' 'হরিজন কি জয়,' ইত্যাদি নানান আওয়াজ তুলে বিপুল জনতা তখন গান্ধীজীকে নিয়ে চলল মঞ্চের দিকে। শাদা ধবধবে একখানা মোটা চাদর গান্ধীজীর গায়ে। মুণ্ডিত মস্তক, প্রশস্ত ললাট, কানদুটি চেপ্টা—একটু বড়, নাকটিও দীর্ঘ। তার উপর একজোড়া চশমা। পাতলা ঠোঁট দুটিতে একটা প্রশান্ত হাসি লেগে আছে, আর দন্তহীন লম্বা মুখখানির নীচে চেরা ছোট চিবুকটা জীবনের অটুট প্রতি-শ্রুতির সাক্ষ্য বহন ক'রে চলেছে। সব কিছু মিলে ঈষৎ খর্বাকার এই লোকটির মুখখানা থেকে কেমন এক প্রশান্ত সৌন্দর্য দীপ্তি বিচ্ছুরিত হতে থাকে। রথার মাথাটা আপনা থেকে নত হয়ে আসে শ্রদ্ধাভরে।

গান্ধীজীর পাশে দুইজন মহিলা বসেছিলেন। একজন ভারতীয় আর একজন ইংরেজ। রথার পাশে গাছের ডাল ধরে স্কুলের যে ছেলেটি বসেছিল সে তার বন্ধুকে শুনিয়ে বলল:

'জানিস্, উনি হলেন শ্রীমতি কস্তুরবাঈ গান্ধী—মহাত্মা গান্ধীর স্ত্রী।'

'আর ওপাশের ওই ইংরেজ মহিলাটি কে?' বন্ধুটি প্রশ্ন করল।

'গান্ধীজীর ইংরেজ শিষ্যা মিস্ স্ল্যাডি মীরাবেন। উনি একজন ইংরেজ নৌসেনাপতির মেয়ে।'

তাঁর চোখ গিয়ে পড়ে এক সময় রাস্তার কিছু দূরে খাকী-পোষাক পড়া ইংরেজ পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের উপর। চকচকে সুন্দর টুপি-পরা খাস বিলেতী সাহেবের দিকে চোখ তুলে তাকাতে রথার আজ আর ইচ্ছা হোল না। ভাবতে বৃটিশ শাসনের প্রতীক ইংরেজ পুলিস কর্মচারির উপর থেকে রথার দৃষ্টি গিয়ে পড়ে গান্ধীজীর উপর। গান্ধীজির উপরই চোখ-দুটি তার পড়ে থাকে।

কংগ্রেস ভলান্টিয়ারদের সকল বাধা উপেক্ষা ক'রে নর-নারী নির্বিশেষে সবাই গান্ধীজীর পদধূলি নিতে কাড়াকাড়ি শুরু ক'রে দেয়। তাই দেখে সে বিড়বিড় করে আপন মনে।...'আরে, গান্ধীজীও দেখছি আমার মত কালা আদমী। তবে হ্যাঁ লেখা-পড়া নিশ্চয় করেছেন অনেকখানি।...'

গুলবাগের সন্ধ্যার স্তব্ধ হিমেল আকাশ বিদীর্ণ ক'রে এবার সমবেত সহস্র কণ্ঠের জয়ধ্বনি ওঠে: 'মহাত্মা গান্ধীকি জয়।' মহাত্মা তখন সুসজ্জিত কংগ্রেস মঞ্চের উপর উঠে উপাসনা রত ভংগিতে চোখ বুঁজে দাঁড়িয়েছেন করযোড়ে। মুখে তাঁর শিশুর মত প্রশান্ত হাসি। একটু পরেই উদ্বোধন সংগীত শুরু হোল। সমগ্র দিনের তিক্ত অভিজ্ঞতা, বিসদৃশ সব ঘটনা, শহরের রাস্তার সেই ক্রুদ্ধ লোকটা, নাট-মন্দিরের পুরুৎ ঠাকুর, স্যাকরা পাড়ার সেই দজ্জাল গিন্নী, ছোটা, রামচরণ, তার বাপ, পাদ্রী সাহেব আর তার মেম-সাহেব সব কিছুর স্মৃতি মুছে যায় রথার মন থেকে নিঃশেষে। সভার উদ্বোধন সংগীতটি তখনও তার কানে অনুরণিত হতে থাকে:

...রাত হোল শেষ ওঠ জাগো—
ওরে যাত্রী' আর কতকাল ঘুমিয়ে রইবি বল...

সমবেত বিরাট জন সমুদ্রের কোথাও কোন সাড়া শব্দ নাই, মন্ত্র-মুগ্ধের মত সবাই নিশ্চুপ হয়ে শুনছে। গান্ধীজী তখনও করজোড়ে দাঁড়িয়ে আছেন। মুখের সেই হাসিটি লেগে আছে তখনও। উদ্বোধন সংগীত সমাপ্ত হবার সঙ্গে সঙ্গে লাউড স্পীকারের মারফৎ গান্ধীজীর কণ্ঠ ভেসে এল:

'প্রায়শ্চিত্তের এক কঠোর অগ্নিপরীক্ষা সেরে আমি বাইরে এসেছি। যাদের জন্য আমার এই প্রায়শ্চিত্ত তারা আমার এই জীবনের চাইতেও প্রিয়।' গান্ধীজী প্রত্যেকটি কথা মেপে মেপে যেন নিজেকে নির্জে বলে চললেন :—'যাদের জন্য আমার এই প্রায়শ্চিত্ত তারা আমার প্রাণের চাইতেও প্রিয়। বৃটিশ সরকার এখনও তাদের পৃথক ক'রে শাসন করার নীতি অনুসরণ ক'রে চলেছে। তাই দেশের নতুন শাসন-তন্ত্রে আমাদের অনুন্নত সম্প্রদায়ের ভাইদের জন্য পৃথক নির্বাচন আসনের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। নতুন শাসনতন্ত্র গঠনে আমলাতন্ত্র যুক্তিসঙ্গত ব্যবস্থা করছেন কিনা আমার জানা নেই। এ সম্পর্কে আমি কিছু বলতেও চাই না। সরকারের বিরুদ্ধে কোন প্রচার কার্য করা হবে না এই শর্তে আমি কারাগার থেকে মুক্তি লাভ করেছি। সুতরাং ওই নিয়ে আমি আপনাদের কিছু বলব না। তথা-কথিত অচ্ছুৎ সম্প্রদায়ের কথাই আমি আজ বিশেষ ক'রে বলব। আইন ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সরকার সম্প্রতি এঁদের স্বতন্ত্র অধিকার দান করছেন। হিন্দু-ধর্ম থেকে এঁদের সকলকে পৃথক ক'রে রাখবার ক্রুর ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে।...

'আপনারা সকলে জানেন, বৈদেশিক শাসকদের কবল থেকে আমরা সবাই আজ স্বাধীনতা পেতে চাই। কিন্তু আমরা নিজেরাই শত শত বৎসর ধ'রে এতদিন আমাদের অনুন্নত কোটী কোটী ভাই-বোনদের উপেক্ষিত, পদদলিত, বঞ্চিত ক'রে রেখেছি। এই অন্যায় অবিচারের জন্য এতটুকুও আমাদের গ্লানি কিংবা অনুতাপ হয়নি। প্রশ্নটা আমার কাছে কেবল নৈতিক নয়, ধর্মগতও। আপনার বিবেকের তাড়নায় আমি সম্প্রতি এঁদের হয়ে আমরণ অনশন ব্রত সুরু ক'রে ছিলাম।'

বধা বক্তৃতার অনেকগুলি কথা বুঝে উঠতে পারল না। সে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে উঠল। যে ভাষা ওরা বুঝতে পারে না এমন ভাষায় মহাত্মা বক্তৃতা দিচ্ছেন কেন?—শুধায় সে নিজেকে। গান্ধীজী বুঝি তার মনের কথা বুঝতে পেরে এবার বলে উঠলেন :

'অস্পৃশ্যতাকে আমি সনাতন হিন্দুধর্মের সর্বাপেক্ষা কলংক বলে মনে করি। আমি যখন খুব ছোট ছিলাম তখনই আমার মনে এই ধারণার উদয় হয়।'

বধার কান দুটো খাড়া হয়ে উঠে। একান্ত ভাবে সে জমে যায় বক্তৃতায়। গান্ধীজী তখন বলে চলেছেন :

'এই ধারণা আমার মনে যখন উদয় হয় আমার বয়স তখন বছর বার মাত্র। একজন অস্পৃশ্য মেথর ঝাড়ুদার আমাদের বাড়ী এসে রোজ পায়খানা পরিষ্কার করতো, তার নাম ছিল উকা। ওকে ছুঁতে আমার মা বারণ করতেন। ওকে ছুঁতে নেই কেন, আমি বার বার শুধাতাম মাকে। দৈবাৎ ওকে কোনদিন ছুঁয়ে বসলে আমায় স্নান ক'রে গঙ্গাজল ছিঁটিয়ে শুদ্ধ হ'তে হতো। যদিও এইসব নিয়ম কানুন আমায় মেনে চলতে হতো তবু প্রতিবাদ না ক'রে আমি ছাড়তাম না। বলতাম হিন্দুশাস্ত্রের কোথাও অস্পৃশ্যতার উল্লেখ নেই। ছেলে হিসেবে আমি অত্যন্ত বাধ্য ও কর্তব্য-পরায়ণ ছিলাম। পিতা-মাতার প্রতি উপযুক্ত সম্মান আর শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে পরাঙ্মুখ ছিলাম না। তবু তাঁদের সঙ্গে আমি অনেক সময় এ নিয়ে কথা কাটাকাটি তর্ক করতাম। উকাকে ছুঁলে পাপ হয় বলে মা যখন বলতেন, আমি রীতিমত তার প্রতিবাদ করতাম। বলতাম কাউকে ছুঁলে পাপ নেই।..

'স্কুলে যাবার সময় আমি অনেক সময় অচ্ছুৎদের ছুঁয়ে দিতাম। বাবা আর মার কাছে কাজটা গোপন রাখতাম না বলে শুদ্ধি হওয়ার নতুন একটা সোজা পথ তাঁরা আমায় বাতলে দিলেন। বললেন, অচ্ছুৎদের কাউকে ছুঁয়ে কোন মুসলমানকে ছুঁয়ে ফেললে ছোঁয়াছুঁয়ি পাট-টা নাকি কাটাকাটি হয়ে যায়। ঘটা ক'রে আর শুদ্ধির আয়োজন করতে হয় না। মাকে আমি অসীম ভক্তি শ্রদ্ধা করতাম। তাঁর নির্দেশ অমান্য না করলেও অস্পৃশ্যতাকে ধর্মের অমোঘ বিধান বলে কোনদিন মেনে নিতাম না।...'

গান্ধীজীর বক্তৃতা শুনতে শুনতে নিজেকে ঝাড়ুদার উকা বলে মনে হয় বধার। আত্ম-কেন্দ্রিক হয়ে ওঠে সে। বক্তৃতার খেই যেন হারিয়ে ফেলে।

তারপর হঠাৎ চমকে উঠে সে কান খাড়া ক'রে আবার বক্তৃতা শুনতে থাকে।

'সেবার জাতীয়তা দিবসেব দিন আমি তখন নাজোবে ছিলাম, হবিজনদেব সঙ্গে সেখানেই আমাব প্রথম সাক্ষাৎ। সেদিনও আমি আজকের মত প্রার্থনা করছিলাম। প্রার্থনা কবছিলাম, পর জন্মে আমি যেন অস্পৃশ্য অচ্ছুৎ হয়েই জন্মাতে পাবি। যেন অংশ গ্রহণ কবতে পাবি অচ্ছুতদেব সকল দুঃখ-দুর্দশা আব অপমানেব গুরুভাবেব। তাদেব মতই একজন হযে সকল দুঃখ দুর্দশাব হাত থেকে যেন দিতে পাবি মুক্তিব সন্ধান। তাই আমি প্রার্থনা কবছিলাম, আমাকে যদি পবজন্ম গ্রহণ কবতে হয, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয, বৈশ্য কিংবা শূদ্রেব ঘবে আমি যেন জন্ম গ্রহণ না কবি। অস্পৃশ্য অচ্ছুৎ হয়েই যেন জন্মি।

'মেথবেব কাজ কবতে আমিও ভালবাসি। আমাদেব আশ্রমে বছব আঠাব বযসেব এক ব্রাহ্মণ সন্তান নিজেই মেথবেব কাজ ক'বে থাকে। ছেলেটিকে আপনাবা কোন সংস্কাববাদী বলে মনে কববেন না। গোঁড়া হিন্দুধর্মেব জাবকবসে জাবিত সে, নিযমিত সে গীতাপাঠ ক'বে থাকে। পূজা আর্চাও কবে ভক্তিভবে। কিন্তু সে মনে কবে, আশ্রমেব ধাঙড আব মেথবদেব কোন মঙ্গল কবতে হলে মেথবেব কাজ তাকেও কবতে হবে। নিজে আচরণ না ক'বে অপব কাবো মঙ্গল বিধান সম্ভব নয।'

শুনতে শুনতে বথাব সর্বাঙ্গ শিউড়ে ওঠে। মহাত্মা নিজে ধাঙড় হয়ে জন্মাতে চান। বলেন কি, নিজেও তিনি ধাঙড়-মেথবেব কাজ ক'রে থাকেন! তাঁকে তাব ভাল লাগে। নিজেকে সে তাঁব হাতে সঁপে দিতে পাবলে এবং তাঁব কোন কাজে এলে যেন স্বস্তি বোধ কবে। অসাধ্য এমন কিছু নেই যা মহাত্মাব জন্য সে কবতে প্রস্তুত নয়। মহাত্মাব আশ্রমে সে চলে যাবে। ঝাড়ুদাব হবে ওখানে গিযে। চব্বিশ ঘণ্টা তাহলে সাক্ষাৎ মিলবে তাঁব সঙ্গে। কথা বলতে পাববে। আরে, সে ভাবছে কি সব।

বখা শুধায় নিজেকে। বক্তৃতা যে এদিকে কিছুই শোনা হচ্ছে না। সে আবার সজাগ হয়ে উঠে।

'এখানে যদি কোন অচ্ছুৎ থাকে, তারা জেনে রাখুক, তারাই ঝেঁটিয়ে হিন্দু সমাজের জঞ্জাল সব পরিষ্কার করে থাকে।

সে যে একজন অচ্ছুৎ হাঁক ছেড়ে তার বলে উঠতে ইচ্ছা করে। কিন্তু হিন্দু-সমাজের জঞ্জাল ঝেঁটিয়ে পরিষ্কার করাটা কি ঠিক বুঝে উঠতে পারে না সে। বুকের মধ্যে তার যেন ঢেঁকির পাড় পড়তে থাকে। কান দুটো খাড়া ক'রে সে আবার শুনতে থাকে। গান্ধীজী বলে চলেছেন: 'সুতরাং তাঁদের নিজেদেরও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে থাকা উচিত। এমন ভাবে থাকতে হবে কেউ যেন তাদের খুঁত্ বার করতে না পারে। আমি বলছি তাদের মধ্যে এমন অনেকে আছেন যাঁরা গাঁজা কিংবা সুরা পান ক'রে থাকেন। ওই সব অভ্যাস আজ থেকে বর্জন করতে হবে।...

'অচ্ছুৎরা তো নিজেদের হিন্দু বলে দাবী করেন; শাস্ত্র মতে পূজা-আর্চাও ক'রে থাকেন। কিন্তু হিন্দুদের এই সব অত্যাচারের কথা হিন্দুশাস্ত্রের কোথাও কি লেখা আছে? হিন্দুধর্মের যারা ধারক আর বাহক তারাই শুধু এর জন্যে দায়ী। নিজেদের মুক্তির সন্ধান পেতে হলে অচ্ছুৎদের নিজেদের বদ অভ্যাস-গুলি ছাড়তে হবে।'

আরে গান্ধীজী তাদের গাল দিচ্ছেন নাকি? লক্ষণটা তো ভাল নয়। বক্তৃতার শেষ কথাগুলি ভুলে যাবার চেষ্টা করে বখা। মহাত্মার কাছে ছুটে গিয়ে বলতে ইচ্ছা করে, কি অভিশপ্ত জীবনই না তাদের প্রতিদিন যাপন করতে হয়। এই শহরে তার মত ধাঙড়দের খাবারের রুটি নিতে হয় কুড়িয়ে নোংরা নর্দমার মুখ থেকে। এখানকার শহরেই তার ভাইকে সিপাইলোকদের এঁটো বাসন থেকে ঝুঁটা খাবার চেয়ে নিতে হয় খাবারের জন্য যা কুকুরেও খায় না। সে মহাত্মার দিকে ফিরে তাকায়। তিনি বলে চলেছেন:

'আমি নিজেও একজন গোঁড়া হিন্দু। আমি জানি হিন্দুরা কেউ

স্বভাবত পাপাত্মা নয়। গভীর পংকেই এখনো তারা ডুবে আছে। পাতকুয়া, মন্দির, সড়ক, স্কুল কিংবা স্বাস্থ্যনিবাস প্রভৃতি সমুদয় বারোয়ারী প্রতিষ্ঠানের দ্বার অচ্ছুৎদের জন্য আজ উন্মুক্ত ক'রে দিতে হবে। এবং আপনারা যদি আমাকে ভালবাসেন তাহলে আজ থেকে এই শপথ নিন্, ঘৃণ্য অস্পৃশ্যতা দূব করবার জন্য আপনারা শান্ত অহিংস নীতিতে প্রচার কার্য চালিয়ে যাবেন। অস্পৃশ্যদেব মুক্তি আর গো-রক্ষাই আমার জীবনের একমাত্র ব্রত। এই ব্রত পূর্ণ হলে তবে আমাদের 'স্বরাজ' আসবে। আমার জীবন সার্থক হবে। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি আপনাদের ব্রত যেন পূর্ণ হয়।'

'মহাত্মা গান্ধী কি জয়,' 'হিন্দু-মুসলমান কি জয়,' 'হরিজন কি জয়!' প্রভৃতি বিপুল জয়ধ্বনির মধ্যে গান্ধীজী তাঁর বক্তৃতা শেষ করলেন। বথা স্তব্ধ বিমূঢ় হযে গাছের উপব-ডালে স্থির হয়ে বসে রইল। তার নীচ দিয়ে অসংখ্য জনতার ভীড় ঠেলে মহাত্মা কখন বেরিয়ে গেলেন সে টেরও পেল না।

কিছু দূরে কাঠের এক মঞ্চের উপব দাঁড়িয়ে একজন পাঁড়ে হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সকলকে জল বিতরণ করছিল। ভীড থেকে একজন সেদিকে তাকিযে সহসা বলে উঠল :

'মহাত্মাজী হিন্দু-মুসলমান সবাইকে এক ক'রে গেছেন ভাই।'

এক কংগ্রেস ভলান্টিযার ওদিকে চীৎকার ক'রে বলছে :

'বিলেতী পোষাক ত্যাগ কর ভাই সব, পুড়িয়ে ফেল ওই সব!'

বথা অবাক হয়ে দেখল, কিছুক্ষণেব মধ্যেই এক বাশ বিলেতী কাপড়, জামা, টুপি, সার্ট স্তূপাকাব হযে গেল। জনতা পরম আনন্দে তাতে আগুন ধরিয়ে দিল।

বিপুল ভীড়ের মধ্যে এক ঘেসরু বৌ দামাল তাব দুটি ছোট ছোট ছেলেকে সামলে উঠতে পারছিল না। ভীড় থেকে একজন এগিয়ে এল তাব কাছে, বলল : 'দিদি তোমার এক ছেলেকে আমার কোলে দাও। আমি পৌঁছে দিচ্ছি।'

'দূর দূর, গান্ধীজী হল পয়লা নম্বরের বুজরুক।' ভীড়ের ভেতর থেকে কে যেন সহসা বলে উঠল। 'আস্ত একটা গাধা, বকধার্মিক কোথাকার! এদিকে তো খুব উপদেশ দিয়ে গেলেন অস্পৃশ্যতা বর্জন করতে হবে, অপর দিকে নিজেই নিজ মুখে স্বীকার ক'রে গেলেন: তিনি হলেন গোঁড়া হিন্দু। আমাদের এই গণতন্ত্রের যুগে তাঁর সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলা মুস্কিল। তিনি তাঁর স্বদেশী আর চরকা নিয়ে খ্রীষ্ট পূর্ব সেই চতুর্থ শতাব্দীতেই বাস করছেন এখনও। এটা যেন বিংশ শতাব্দী নয়। আমি রুশো, হবস্, বেন্তাম আর জন ষ্টুয়ার্ট মিল প্রভৃতি মনিষীদের কত লেখাই—'

কাল ভাল্লুকের মত বখা গাছ থেকে এবার নেমে পড়ল ঝপাং ক'রে। নিঃশব্দে সে কেটে পড়ছিল কিন্তু গাছ থেকে তার নেমে পড়ার ধরণ দেখে গণতন্ত্রের ধ্বজাধারী সেই লোকটা বলে উঠল:

'এ—এ, কালা আদমী, আরে, এদিকে আয়তো। সাহেবের জন্য গিয়ে একটা সোডা ওয়াটারেব বোতল নিয়ে আসতে পারবি?'

ডাক শুনে ফিরে তাকাল। দেখল, সুশ্রী-সুবেশ বিলেতী স্যুট পরা এক ভদ্রলোক; বাঁ চোখে তাঁর এক ফ্রেমহীন চশমা। অমন চশমা বখা আগে কোনদিন দেখে নি। হাঁ ক'রে সে তাকিয়ে রইল। হাবভাব আর কাপড়-চোপড় সব কিছু ভদ্রলোকের এমনই যে উনি খাঁটি সাহেব না ভারতীয় বখা চিনে ঠিক ঠাহর ক'রে উঠতে পারল না। অবাক হয়ে সে তাঁর দিকে তাকিয়ে রইল।

'আরে অমন হাঁ ক'রে তাকিয়ে আছিস কি?' সাহেব ভদ্রলোকটি খেঁকিয়ে উঠল। তারপর সাহেবদের ঢঙে ইচ্ছা ক'রে ভুল হিন্দুস্থানীতে বলে উঠল: 'হাম দেশী সাহেব, বিলাত থেকে সবে ফিরেছি। সোডা বোতলেব দোকান আশে-পাশে কোথাও আছে বলতে পারিস?'

বখা দেশী সাহেবটির প্রশ্ন শুনে রীতিমত ঘাবড়ে গিয়েছিল। কোন জবাব না দিয়ে নীরবে সে মাথা নাড়ল। তার হয়ে পাশের এক যুবক জবাব দিল:

'মহাত্মাকে ও ভাবে গাল দেওয়া আপনার অত্যন্ত অন্যায় হচ্ছে—'। যুবকটি এগিয়ে এলেন। মাথায় তাব লম্বা একবাশ চুল, মুখখানা মেয়েলী ধাঁচের, বুদ্ধিদীপ্ত দুটি চোখ, গাযে ঢিলে পাঞ্জাবী। অনেকটা কবি-কবি ভাব।

দেখতে না দেখতে কবি আব দেশী সাহেব দুজনকে ঘিবে ছোটখাট একটা ভীড় জমে গেল। দেশী সাহেবটি বাধা দিযে বলে উঠল :

'ঠিক কথা, আমিও ঠিক তাই বলতে যাচ্ছিলাম। আমাব মূল বক্তব্য হলো—'

'শুনুন, আমায আগে বলতে দিন। আমাব কথা এখনও শেষ হয নি।' কবি বলে চলল : 'গান্ধীজীব গণ্ডী অবশ্য সীমাবদ্ধ। কিন্তু মূলে তাঁব কোথাও একচুল গলদ নেই। এই যুগে চবকাকে চালু কবতে যাওযা হযত তাঁব ভুল। ভাবতবর্ষকে তাহোলে গোটা দুনিযা থেকে একঘবে বিচ্ছিন্ন হযে থাকতে হবে। কিন্তু তা নিশ্চয হবে না। তবু তিনি তাঁব মতে ঠিকই কবছেন। ভারতবর্ষ যে আজ গবীব দেশ এবং গোটা দুনিযাটাই যে ধনী এই দোষ কি বেচাবী ভারতবর্ষেব ?'...

'আবে মশাই, শ' পড়েছিলেন নাকি ? তাঁবই মত যে খুব চোখা চোখা আপাত বিরুদ্ধ কথা বলছেন ?' এক চক্ষু চশমা পবা ভদ্রলোকটি টিপ্পনী কাটল।

'আবে রেখেদিন মশাই আপনাব শ'। আমি আপনাব মত ঘুণে-ধবা ভাবতীয যুবক নই যে ঐ সব যুবোপীয চিত্র তাবকাদেব নিযে ফোপব দালালী কবব।' ছোকবা কবি জবাবটা ছুঁড়ে মাবল। আবাব বলল—'আপনি নিশ্চয় জানেন, অর্থনৈতিক দৃষ্টি কোণ থেকে যাচাই কবলে ভাবতবর্ষ পৃথিবীব অন্য দেশেব তুলনায পিছিযে পড়ে নি। অফুবন্ত তাব প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য সম্পদ। বাস্তবিক, এদিক থেকে ভাবতবর্ষ পৃথিবীব অন্য ধনী দেশগুলিব মত হলেও কল কাবখানা যন্ত্রপাতি তাব নেই। কৃষি-ভাবত কৃষিই বযে গেছে। তাই তো ভারতেব আজ এই দুর্দশা। এই গলদ আমাদেব দূব কবতে হবে।

যন্ত্রপাতিকে আমি মনে মনে রীতিমত ঘৃণা করি। বরদাস্ত করতে পারি না কিছুতেই। তবু বর্তমান ক্ষেত্রে আমি গান্ধীজীর অনুসৃত নীতির সম্পূর্ণ বিরোধী। যন্ত্রকেই আমিও নেব বরণ ক'রে। আজ আমাদের গলায় যাবা দাসত্বের জিঞ্জির পরিয়ে দিয়েছে তাদের সকল অভিসন্ধি বেফাঁস ক'রে আমরা তখন—'

'আরে, ওসব বলছ কি ভাই, মিছিমিছি শ্রীঘ'রের দিকে পা বাড়াতে চাও নাকি?' ভীড়ের মধ্য থেকে কে যেন ফোড়ন দিয়ে উঠল।

'আর শ্রীঘর! গেল বছর যখন গ্রেফ্তারের হিড়িক পড়ে গিয়েছিল—হাজারে হাজারে দেশের লোককে যখন নিয়ে গিয়ে জেলে পুরছিল আমি তখনও ভাই বেশ কিছুদিনেব জন্য অতিথি সেজে ছিলাম আপনাব ঐ শ্রীঘরেই!' কবি জবাব দিল।

'আপনি আছেন কোথায় মশাই, আপনার ঐ চাষাভুষারা যারা এই পৃথিবীটাকে নিছক মায়াময় বলে মনে করে, তারা কি আপনার আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করবে বলে ভাবছেন?' আত্মম্ভবী সেই দেশী সাহেবটি চোখে চশমা আঁটতে আঁটতে জবাব দিল কবির কথার।

'প্রত্যেকটি সামগ্রীকে সাদরে বরণ ক'রে নেওয়াই ভারতের মজ্জাগত আদর্শ। বিমুখ সে কাউকে করে না।' যুবক কবি উদ্দীপ্ত কণ্ঠে বলে চলল। '—সম্পূর্ণ বাস্তব দৃষ্টি কোণ থেকে যুগ যুগ ধরে বিপুল এই বিশ্বে প্রত্যেকটি বস্তুকে প্রত্যেকটি উপাদানকে খাঁটি ধ্রুব সত্য বলে সে গ্রহণ ক'রে আসছে। আমাদের উপনিষদেব মতে মানুষ জন্মগ্রহণ করে, পুনর্জন্ম হয় তার—অমরত্ব লাভ করেও জন্ম-জন্মান্তরের ধাঁধাঁব হাত থেকে নিষ্কৃতি পায় না সে। বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের কোন না কোন উপাদান হয়ে আবার তাকে জন্ম নিতে হয়। অন্য কোন জগৎকে আমরা বিশ্বাস করি না। একমাত্র শংকরাচার্য ছাড়া এই বিশ্বকে আর কোন ভারতীয়ই মায়া প্রপঞ্চ বলে মনে করে না। কিন্তু তিনি ছিলেন অর্ধ-উন্মাদ—নিউরোটিক। রোগে ভুগে ভুগে চিন্তা ছিল তার অসুস্থ।

প্রাচীন য়ুরোপীয় পণ্ডিতরা মূল উপনিষদ সংগ্রহ করতে পারেন নি। তাই শংকরাচার্যের ভাষ্য থেকে ভারতীয় চিন্তাধারার তাঁরা ব্যাখ্যা ক'রে গেছেন।.. ...'মায়া' শব্দের মূল তাৎপর্য হলো যাদু—মিথ্যা প্রপঞ্চ অলীক নয়। বেদান্ত দর্শনের সর্বশেষ ভারতীয় অনুবাদক ডক্টর কুমারস্বামী তাই ব্যাখ্যা করেছেন। সুতরাং এদিক থেকে দেখতে গেলে আপনাদের প্রিয় বৈজ্ঞানিক এডিংটন কিংবা জিনস্-এর প্রাকৃতিক জগতের সমগোত্রীয় বলে মনে হয় তাঁকে। ভিক্টোরিয় যুগের পণ্ডিতরা আমাদের আগাগোড়া ভুল ব্যাখ্যা করেই গেছেন। ...ভারতবর্ষের সম্রাজ-শাহী শাসন ও শোষণের আধ্যাত্মিক পটভূমি প্রস্তুত ক'রে তারপর চাতুরির সঙ্গে ছোট্ট একটা উপকথা দিল তার সঙ্গে জুড়ে। বলল: মায়াময় এই পৃথিবীর সব কিছুই অলীক মিথ্যা। তোমরা তোমাদের দেশের রক্ষণা-বেক্ষণের ভার আমাদের হাতে নির্বিঘ্নে সঁপে দিয়ে নির্বাণ প্রাপ্তির জন্য চোখ বুঁজে জপতপ করতে থাক।...কিন্তু সেদিন আর নেই। বিপুল এই বিশ্ব-জগৎকে একদা আমরা সহজ সরলভাবে বরণ ক'রে নিয়েছিলাম। আমাদের সেই ঐতিহ্যের ধারা অক্ষুণ্ণ রেখে এবং ভারতীয় শিল্প আর স্থাপত্যের অমর কীর্তিকে পুরোধা ক'রে আমরা আজ যন্ত্র-যুগকেও সাদর সম্ভাষণ জানাব। কিন্তু তাই বলে বেসামাল হয়ে আমাদের নিজেদের সত্ত্বা হারালে চলবে না। অর্থগৃধ্নু পাশ্চাত্য জগত আজ অর্থের সন্ধানে নিজেরাই বেসামাল হয়ে পড়েছে। ফিরে গেছে অসভ্য বর্বর যুগে। তাদের নির্বুদ্ধিতার কথা আমাদের ভুললে চলবে না। ছয় হাজার বছরের পুরাতন আমাদের 'জাতি'-সচেতন সভ্যতা। জীবনকে আমরা জানি। জীবনের জল-তরঙ্গের সঙ্গে চলতে হবে আমাদের খাপ খাইয়ে। ভুল করলে আমাদের চলবে না। আমরা জানতে চাই, শিখতে চাই আরো। কল-কারখানা যন্ত্র-পাতির পাটও ক'রে যাব সুচারুরূপে। যন্ত্রের কাছে নিজেদের বিকিয়ে দেবো না কিছুতেই। এই আস্থা আমাদের আছে এখনও।...'

বক্তৃতাটি বেশ জমে উঠছিল। আশপাশের লোকজন সবাই চুপ হয়ে শুনছিল। বধা তখনও গান্ধীজীর বক্তৃতার কথা ভাবছিল। কবির বক্তৃতার প্রতি বিশেষ কান দেয় নি সে এতক্ষণ। সবটা সে বুঝতেও পারছিল না। ভিড়ের মধ্য থেকে কে একজন জিজ্ঞাসা করল :

'লোকটি কে বে ?'

'জানিস না, উনি হলেন কবি কুবলনাথ সারচার, "নওয়ান যুগ" পত্রিকার সম্পাদক। আর উনি যাব সঙ্গে কথা বলছিলেন তিনি হলেন ব্যাবিস্টাব মিষ্টাব আব. এন. বসির. বি.এ (অক্সন)।' কে আর একজন জবাব দিল ভিড়েব মধ্য থেকে।

ভিড়ের মধ্য থেকে একটা চাপা ফিসফাস ধ্বনি বুঝি ভেসে এল। মিষ্টাব বসিব তাকে ছাপিযে হা-হা ক'বে হেসে উঠল :

'কিন্তু আপনাব লম্বা চওড়া ঐ বক্তৃতার সঙ্গে অস্পৃশ্যতাব সম্পর্ক কতটুকু বলুন তো ? গান্ধীজীব সমস্ত ওজবটাই কি তাঁব "ইন্‌ফিবিযব কমপ্লেক্সটি"-এব প্রতীক নয ? আমার মনে হয—'

'হ্যাঁ, আমি জানি আপনাব কি মনে হয', কবি চাপা একটু হেসে বলল : '—আমি জানি আপনাব কি মনে হয। কিন্তু জেনে বাখবেন গান্ধীজী তাঁব অস্পৃশ্যতা ব্যাপাবে রাজনৈতিক কি অর্থনৈতিক মতবাদের থেকে অধিক সচেতন। অক্সফোর্ড ইউনিভাবসিটিতে দু-পাতা পড়ে এসে 'ইন্‌ফিরিযরিটি আর সুপিবিয়বিটি কমপ্লেক্স' প্রভৃতি সস্তা বুলিগুলোই খালি শিখে এসেছেন। মানেটা কবুল কবতে শেখেন নি। সব কিছুতেই ইংরেজদের অন্ধেব মত নকল করতে আপনার লজ্জা—।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক বাত !' একজন কংগ্রেস ভলানটিয়াব সহসা ফোড়ন কেটে উঠল।—'গলায সিল্কের টাই আব বিলিতী স্যুট পরে আছে, সত্যি কি লজ্জাব কথা !'

'মানুষের বংশানুক্রমিক পদকৌলিন্য আর পরিবেশ এক নয়—বিভিন্ন

রকমের।' কংগ্রেসওয়ালাকে নৃশংস ভাবে থামিয়ে দিয়ে কবি বলে চলল :—'এই যেমন ধরুণ আমাদের কারো মাথা হয় প্রকাণ্ড, কারো বা ছোট ; কারো বা গায়ে অসুরের মত জোর, কেউ বা দুর্বল। লক্ষ লক্ষ লোকের মধ্যে হয়ত কশ্চিৎ একজন সাধু মহাপুরুষের সাক্ষাৎ মিলবে, হাজার লোকের মধ্যে হয়ত একজন প্রতিভাশালী মনীষীর হয় জন্ম। কিন্তু তাই বলে মানবতার দিক থেকে সব মানুষই সমান নয় কেন! আমাদের দেশের এক চলতি কথায় কি বলে জানেন? চাষীর হাত থেকে লাঙ্গলটা কেড়ে নিয়ে ধুয়ে মুছে কাপড় চোপড় পরিয়ে ওকে যদি রাজ সিংহাসনে বসিয়ে দেওয়া যায় তাহোলে সে রাজ্য ঠিক চালিয়ে যেতে পারবে! আমাদের গাঁয়ের চাষীদের সেই শক্তি আর সামর্থ এখনও রয়েছে। গাঁয়ের এক চাষীর কাছে যান না, দেখবেন সে কেমন বিনয় আর নম্র ভাবে কথা বার্তা বলবে আপনার সঙ্গে। সব মানুষই সমান এই বোধ নতুন নয় ওর কাছে। সুচতুর ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা তাদের বর্ণ-কৌলীন্যের গর্বে ফেঁপে উঠে হিন্দুশাস্ত্রের নতুন আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা দিল! দ্রাবিডদের শাস্ত্রমতের ভুল ব্যাখ্যা ক'রে বলল : মানুষের সুখদুঃখ সব কিছুই পূর্ব জন্মের কর্মফল! ধূর্ত ব্রাহ্মণেরা শাস্ত্রের এই অপ-ব্যাখ্যা না করলে ভারতবর্ষেই পৃথিবীর সেরা আদর্শ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হত। গণতন্ত্রের কোন বালাই নেই আপনি এই কথাই বা কি ক'রে বলেন? ব্রাহ্মণদের সৃষ্ট এই জাতি-ভেদ কি বৈদগ্ধ আভিজাত্য নয়? এই যেমন ধরুণ, হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি একই পোংক্তিতে বসে তাঁর স্বজাতি পথের ভিখারী কি কুলির সঙ্গে ভুঁড়ি ভোজনে পরাঙ্মুখ হন না। সুতরাং ইচ্ছে করলে অতি সহজে আমরা আমাদের এই জাতি বৈষম্য ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দিতে পারি। মান্ধাতা আমলের সেই সব পুরানো শাস্ত্রের বিধি-বিধান আজ ভেঙ্গে আমাদের গুঁড়িয়ে দিতেই হবে। তার জায়গায় আজ গ্রহণ করতে হবে নূতনকে। আমরা সব ভারতবাসী জীবনের প্রাণস্পন্দনে ভরপুর। সহজ ভাবেই গ্রহণ করতে পারব।'

'কি যে বলছেন আপনি কিছু বুঝতে পাচ্ছি না।' বসিব বিবক্ত হ'যে বলে উঠল।

'বলছি আমাদেব জাতিভেদ প্রথাব সব বাধা ব্যবধান চূর্ণ ক'বে দিযে মানুষ আব মানুষকে এক কবতে হবে।···

'বলছি জাতিভেদ প্রথা আমবা ভাঙ্গবো : জন্ম জন্মান্তব ধবে একঘেঁযে পৈত্রিক পেশাব সংকীর্ণ গণ্ডী যাব ডিঙ্গিযে। প্রত্যেক মানুষেবই সুখ সুবিধা সমান অধিকাব নেব স্বীকাব ক'বে। মহাত্মা অবশ্য তা বলেন না। কিন্তু ভাবতে বৃটিশ পিনাল কোডেব দৌলতে জাতিভেদ প্রথাব সামাজিক কৌলীন্য আব অটুট বইল কোথায ? সকলেই আজ সমান আইন-আদালতেব চোখে। জাতিভেদেব গণ্ডী-বেখা আজ কেবল পৈত্রিক পেশাতেই সীমাবদ্ধ। ধাঙডবা যদি তাদেব জাত-পেশা ছেড়ে অপব কোন ব্যবসা গ্রহণ কবে, কেউ তখন তাদের আব অচ্ছুৎ বলে ডাকবে না। এবং শিগগীব সে-দিনই আসছে। বিদেশী কল-কব্জা আব যন্ত্র-পাতি আমদানী কবতে গিযে প্রথমেই আমবা নজব দেব, যাতে কাউকে আব নিজ হাতে গু-মুত ঘাটতে না হয। টাট্টি-খানাগুলোতে প্রথম আমবা 'ফ্লাশ'-ব্যবস্থা চালু কবব। ধাঙড়বা তখন অস্পৃশ্যতাব কলঙ্ক-কালিমা থেকে মুক্তি পাবে। মর্যাদা লাভ কববে শ্রেণী হীন সমাজেব একান্ত প্রযোজনীয নাগবিক হিসাবে।'

'আব ধাঙডদেব একনাযকত্ব—মার্কসীয বস্তুবাদ এবং আবো কত কি প্রতিষ্ঠিত হবে।' ব্যঙ্গ ক'বে হেসে উঠল মিঃ বসিব।

'হ্যাঁ হ্যাঁ, ধীবে ধীবে সব কিছুই হবে—হবে বিজ্ঞান-সম্মত উপায়ে, যান্ত্রিক ভাবে নয। সস্তা বুলি কপচিযে আব লাভ কি ?'

'অল্‌বাইট, বেশ সেই ভাল। কিন্তু এখানে আব নয। দম যেন আটকে এল। চলুন, এখন যাওয়া যাক্।' মিষ্টাব বসিব পকেট থেকে সিল্কেব রুমাল বাব ক'বে মুখ মুছতে লাগল।

আশপাশেব জনতা এতক্ষণ ধবে ওদেব দুজনেব কথা-বার্তা শুনছিল অবাক

বিস্ময়ে আর বুঝি পরস্পর পরস্পরের দিকে আড়চোখে তাকাচ্ছিল। ওরা এবার বিদায় নিতে কিছুদুর পিছু পিছু গেল ওদের সঙ্গে সঙ্গে। তারপর গোলবাগ থেকে নিজেরাও বেরিয়ে এসে যে যার গন্তব্য পথ ধরল।

বথা ছোঁয়া-ছুঁয়ির হাত বাঁচিয়ে তফাতে গিয়ে এতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিল আর ছোকরা কবির কথাগুলি ভাবছিল। ছোকরা কবিটি যেন তার মনের গোপন কথাটি বেফাঁস ক'রে দিয়েছে। নিজ হাতে তাকে আর তা হলে অপরের গু-মুত সব ঘাটতে হবে না! কিন্তু 'ফ্লাশ'-ব্যবস্থাই বা কেমন ধরণের? 'ভদ্দর লোক'টা ওঁকে জোর ক'রে টেনে না নিলেই ভাল হ'ত। ব্যাপারটা কি সে তা হলে ওঁর কাছ থেকে জেনে নিতে পারত।—বথা ভাবতে থাকে আপন মনে।

অস্তগামী সূর্য তখন পশ্চিম দিগন্ত রাঙিয়ে তুলেছে রঙে রঙে। গৌরিক-বসনা আকাশটির দিকে বথা তাকায় চোখ তুলে। বাহির বিশ্বে রঙের কি বিপুল বিচিত্র সমারোহ! বুকটা তার কেমন যেন মুচড়ে ওঠে। অপূর্ব এক স্পন্দন সর্বাঙ্গে তার খেলে যায়। কি করবে, কোথায় যাবে সে—কিছুই ভেবে উঠতে পারে না। সকাল বেলাকার তিক্ত স্মৃতিগুলি আবার চিতিয়ে উঠে মনের আনাচে কানাচে হানা দেয়। গাছ তলায় সে স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে থাকে কিছুক্ষণ ক্লান্ত অবসন্নের মত। মাথাটা তার ঝুলে পড়ে বুকের উপর। মহাত্মাজীর বক্তৃতার শেষ কথাগুলি কানের কাছে তার প্রতিধ্বনি তুলতে থাকে: 'প্রার্থনা করি, ভগবান যেন তোমাদের মনে শক্তি দেন, তোমরা যেন তোমাদের আত্মার অন্তিম মুক্তির কাজ সম্পূর্ণ ক'রে যেতে পার!'...আত্মার অন্তিম মুক্তি? তার কাজ? বথার কেমন যেন ধাঁধাঁ লাগে। সে শুধাতে থাকে বার বার। কিন্তু জবাব কোন খুঁজে পায় না। গান্ধীজীর মুখখানা অস্পষ্ট ঝাপসা হয়ে যায় তার চোখের উপর। দুর্বোধ্য ঠেকে কেমন যেন। তবু সে দমে যায় না। কে যেন তার মনে শক্তি দেয়, তাকে এগিয়ে নিয়ে যায় হাত ধরে। মহাত্মার

বক্তৃতাটি আগাগোড়া সে একবার তলিয়ে নেয়। উকার কথাটা তার মনে পড়ে। আশ্রমে এক ব্রাহ্মণ যুবক মেথরের কাজ করে থাকে, বলছিলেন মহাত্মাজী। তার মানেই বা কি? উনি কি বলতে চান মেথরের কাজ আমি করে যাই জীবন ভর?—রথা আবার শুধায় নিজেকে।…হ্যাঁ, গান্ধীজী নিজে যা বল্লেন, আমি ঠিক তাই ক'রে যাব। তাঁর কথা অমান্য করা চলবে না। টাট্টি সাফার কাজ আমার ক'রে যেতেই হবে।…রথা নিজে প্রশ্ন করে, নিজেই জবাব দেয় জোরের সঙ্গে।…তা আমি করছি, কিন্তু ছোক্‌রা ঐ কবিটি 'ফ্লাশ' না কি যেন একটা বললো, যা হলে মানুষকে আর হাতে-নাতে কাজ-কর্ম কিছু করতে হয় না? তা বলুক—সে নিজেকে প্রবোধ দেয়—তা বলুক, গান্ধীজীর কথা কিন্তু অমান্য করা চলবে না।

সে হাঁটতে সুরু করে। মনের মধ্যে তার তখন তুমুল ঝড় বইতে থাকে। অনুরণিত হতে থাকে শোনা বক্তৃতার কথাগুলি, যদিও বেশীর ভাগই সে ঠিক বুঝে উঠতে পারে নি।

অস্তগামী সূর্যের ক্ষীণ স্তিমিত রশ্মিটুকু দূর দিক-চক্রবালের কোলে মিলিয়ে যেতে না যেতে রাত্রির অন্ধকার তার কালো উত্তরীয়খানা বিশ্ব চরাচরের উপর মেলে দিল ধীরে ধীরে। কয়েকটি তারা নীল আকাশের বুকে বুঝি হেসে উঠল।

গোলবাগের মাঠ পেরিয়ে রথা নেমে আসে ধূলি-ধূসরিত রাজপথে।

গোধূলি সন্ধ্যার মেদুর মুহূর্ত অতিক্রান্ত হওয়ায় সঙ্গে সঙ্গেই সহসা সে অপূর্ব এক প্রাণ-বন্যায় উদ্বেলিত হয়ে ওঠে। সে উদ্দীপ্ত কণ্ঠে ব'লে ওঠে: 'বাবার কাছে গিয়ে গান্ধীজীর কথা আমি সব বলব। ছোকরা কবির কথাও জানাব। ওঁর সঙ্গে আমার একদিন নিশ্চয় দেখা হবে। আশ্চর্য সেই কলের কথাটি তখন জেনে নেব তাঁর কাছ থেকে।

বাড়ীর দিকে সে পা বাড়ায়।

সিমলা—'ভায়সরয় অব্ ইণ্ডিয়া' জাহাজ—রুমস্‌বারী।
সেপ্টেম্বর—অক্টোবর, ১৯৩৩ সাল।